বেতার কথা

কাজী মাহমুদুর রহমান

ঢাকা বেতারের কথা
(১৯৩৯-২০০৫)

বেতারে নারী

একাত্তরের বধ্যভূমি ঃ গল্পামারির
খুলনা বেতার
সুকণ্ঠ
বেতারে লেখা ও বলা
উপস্থাপনা কৌশল
সাক্ষাৎকার
বেতার নাটক প্রযোজনা
ও নির্দেশনা

একটি বেতার নাটক

শেষ বিকেলের গান

বেতার কথা

কাজী মাহমুদুর রহমান

মল্লিক ব্রাদার্স : ঢাকা

প্রকাশক
সহিদুল হাসান মল্লিক
মল্লিক ব্রাদার্স
৪২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর
২০০৫
প্রথম সংস্করণ
অক্টোবর
২০০৭

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
বীরেন সোম

মূল্য :
একশত পঞ্চাশ টাকা

গ্রন্থস্বত্ব
দিলরুবা রহমান
৩০২ ডাউন টাউন অ্যাপার্টমেন্ট
৩১ মীরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫

মুদ্রণ
এম. বি. প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিকেশন্স
৫৭ সুকলাল দাস লেন
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

BETAR KATHA
(All about Radio)
Written by Quazi Mahmudur Rahman,
Published by Mullick Brothers, 3/1 Bangla Bazar, Dhaka-1100
Price : Tk : 150.00 US $ 5.00

ISBN : 984-8164-98-7

উৎসর্গ

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ
আমার ছোটো ভাই মাহফুজ
এবং
বেতারের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের
অমর স্মৃতির প্রতি
শ্রদ্ধা জানিয়ে

"একদা জীবিত ছিলে, বস্তুত এখন মৃত; তবু
কখনো কখনো মনে হয়, তোমার পাথুরে বুক
ঘন ঘন স্পন্দিত নিশ্বাসে। হে অজ্ঞাত বীর, শোনো,
তোমার সংগ্রামী স্মৃতি মাছের কাঁটার মতো লেগে
আছে আমাদের বিবেকের শীর্ণগলায় নিয়ত।"

—শামসুর রাহমান

আশরাফ-উজ-জামান খানের কথা

১৯৪০ সাল থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিও, কলকাতায় আমার বেতার জীবনের শুরু, আর তার পঁচিশ বছর পর শুরু হয়েছিল কাজী মাহমুদুর রহমানের বেতার জীবন। আজ ২০০৫ সালের শেষপ্রান্তে আমরা দু'জনেই দাঁড়িয়ে। আমরা কেউ আর এখন বেতারে নেই। আছে শুধু কিছু স্মৃতি, কিছু কথা যা এখনও অম্লান। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—

"পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়
ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়।"

ভোলা যায় না বলেই বেতার ভুবনের পুরোনো কালের মানুষদের দু'চার জন নিজস্ব দু'একটা স্মৃতি কথা লিখেছেন। বিভিন্ন সময়ে আমিও লিখেছি। সেই ১৯৩৯ সাল থেকে ঢাকা বেতারের কিছু রোমাঞ্চকর স্মৃতি আর ইতিহাস ছাড়াও পাকিস্তান আমলের ঢাকা বেতার, ৭১'-এর স্বাধীন বাংলা বেতার, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বেতারের নানা ঘটনা আর তথ্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচনার এই বোধ হয় প্রথম প্রয়াস কাজী মাহমুদুর রহমানের 'বেতার কথা।'

১৯৬৫ সালে আমি যখন চট্টগ্রাম বেতারের পরিচালক তখন আমার কাছেই এলেন অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত তরুণ কাজী মাহমুদুর রহমান। এর পর থেকে তিনি বেতারে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন অতিবাহিত করেছেন, নিত্যনূতন অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও প্রযোজনা করেছেন, নাটক, গান লিখেছেন, অনুষ্ঠান প্রযোজনায় আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন। শুধু বেতারে নয়, টিভি নাটকেও তার সমান পদচারণা ও পারদর্শীতা। বিশিষ্ট নাট্যকার হিসাবে তার পরিচিতি সুবিদিত। বেতারে অনেক ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, অনেক ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। তিনি যা দেখেছেন, যা শুনেছেন, যা সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন তা সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন এই বেতার কথায়। ঢাকা বেতারের শুরু থেকে সেকাল আর একালের নানা ঘটনা, বেতার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী-কলাকুশলীদের বিস্মৃতপ্রায় নাম আর তাদের অবদানকে তিনি সাধ্যমতো তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন 'বেতার কথায়'। তার শ্রম ও নিষ্ঠার ফসল 'বেতার কথা' আমার স্মৃতিকেও জাগরুক করেছে, আনন্দে উদ্বেলিত করেছে। যারা বেতার অনুষ্ঠান নিয়মিত শোনেন তাদের কাছে এই 'বেতার কথা' শুধু সুখপাঠ্য নয়, এটি ভবিষ্যতে বেতার গবেষণা কর্মে মূল্যবান সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। লেখকের বেতার ইতিহাস রচনার এই দুরূহ প্রয়াসকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং 'বেতার কথা'র বহুল প্রচার কামনা করছি।

আশরাফ-উজ-জামান খান

আমার কথা

স্বাধীন বাংলা বেতারের উত্তরসুরি বাংলাদেশ বেতার এখন চৌত্রিশে। একটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ বেতারের এই দীর্ঘ পরিণত সময় তার শ্রেষ্ঠসময় অথবা আনন্দের সময় কিনা তা বলা শক্ত। তবে তার যন্ত্রণা তার ব্যর্থতা অনেক।

বাংলাদেশ বেতারের চৌত্রিশ বছরের ইতিহাস পরিক্রমায় আমাদের আরও একটু পিছনের পটভূমিতে ফিরে যাওয়া দরকার। কেননা সব ইতিহাসের পিছনে থাকে অন্য ইতিহাস, তার উৎপত্তি ও উৎস। অসকার ওয়াইল্ডের ভাষায় "এনি বডি ক্যান মেক হিস্ট্রি, অনলি এ গ্রেট ম্যান ক্যান রাইট ইট।" অর্থাৎ ইতিহাস যে কেউ সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজন বিখ্যাত মানুষের। আমি বিখ্যাত মানুষ নই, ইতিহাস বেত্তাও নই। আমার এই গ্রন্থ ইতিহাস রচনার প্রয়াসও নয়। বেতারের একজন অনুষ্ঠান কর্মী হিসেবে আমার চৌত্রিশ বছরের কর্মজীবনে যা দেখেছি, যা শিখেছি, যা সত্য বলে জেনেছি সেই সকল সত্যাসত্য, স্মৃতিকথা ও শ্রুতিকথা নিবেদনের জন্যেই আমার এই ক্ষুদ্র রচনার অবতারনা।

এই নিবন্ধটি লেখার ব্যাপারে ১৯৯৬ সালে প্রেস ইনস্টিটিউট থেকে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছিল। স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে গত ২৫ বছরে আমাদের গণমাধ্যমের বিভিন্ন দিকের সাফল্য ও বৈফল্য, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি নিয়ে তারা নিরীক্ষা পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশনার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। বেতারে আমার সহকর্মী আশফাকুর রহমান খানও আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেছিলেন। তখন হাতে সময় ছিল কম, তথ্যও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তবুও নিজের স্মৃতি, শামসুল হুদা চৌধুরীর 'একাত্তরের রণাঙ্গন', বেলাল মোহাম্মদের 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' আশফাকুর রহমানের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, শ্রদ্ধেয় আশরাফ-উজ-জামান খান, নাজমুল আলম, লায়লা আর্জুমান্দ বানুর পুরোনো দিনের বেতার বিষয়ক স্মৃতিকথাগুলো 'বেতার বাংলা' পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে "বাংলাদেশ বেতারের পঁচিশ বছর" শিরোনামে একটি লেখা প্রেস ইনস্টিটিউটকে দিয়েছিলাম এবং সেটা নভেম্বর '৯৬-ফেব্রুয়ারি '৯৭ সময়ে নিরীক্ষার ৭৮ তম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি প্রকাশিত হবার পর বাংলাদেশ বেতার সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা কাজে এটির চাহিদা লক্ষ করে আমি লেখাটি আরও তথ্যসমৃদ্ধ এবং যতদূর সম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই। মল্লিক ব্রাদার্সের ভ্রাতৃপ্রতীম সহিদুল হাসান মল্লিক সানন্দে এই প্রকাশনার দায়িত্ব নেন। যেহেতু নাম 'বেতার কথা' তাই এতে শুধু বেতারের ইতিহাস নয়, গ্রন্থটিতে বৈচিত্র আনার জন্যে বেতার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কিছু তথ্য ও শিক্ষামূলক বিষয়ও সংযোজন করা হয়েছে। যেমন- বেতারে লেখা ও বলা, উপস্থাপনা কৌশল, সাক্ষাৎকার, নাটক রচনা ও প্রযোজনা ইত্যাদি। নাটকের প্রতি আমার অসম্ভব দূর্বলতার কারণেই গ্রন্থটির শেষ অধ্যায়ে আমার একটি পুরনো বেতার নাটক সংযোজন করার লোভ সংবরণ করতে পারিনি।

'বেতার কথায়' বাংলাদেশ বেতারের ইতিহাস প্রসঙ্গে আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি আমার এই গ্রন্থটি বাংলাদেশ বেতারের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়, পূর্ণাঙ্গ চিত্রও নয়। ভবিষ্যতে কেউ যদি আরও তথ্য, তত্ত্ব ও ঘটনার সমন্বয়ে বাংলাদেশ বেতারের ইতিহাস রচনার উদ্যোগ নেন তবে তার ইতিহাসের সৌধ নির্মাণে আমার এই বেতার কথা হতে পারে একটি সহায়ক প্রস্তর খণ্ড মাত্র।

বেতারের ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি আমি স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছু চিত্র, কিছু কলংকময় ঘটনা তুলে ধরেছি। কারণ, বাংলাদেশ বেতার এই সকল ঘটনাপ্রবাহের প্রত্যক্ষদর্শী এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও শিকার। এ প্রসঙ্গে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে আমি কোনও রাজনৈতিক দল বা মতের অনুসারী নই। কারও কাছে আমার প্রাপ্তি বা প্রত্যাশাও নেই। তাই আমি সত্যকে বিকৃত করিনি, কোথাও কোনও অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিইনি। বেতারের একজন অনুষ্ঠান কর্মী এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমি যা দেখেছি, যা শুনেছি এবং যা সত্য বলে জেনেছি আমি শুধু সেইটুকু উল্লেখ করেছি।

বেতারের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে আমি বেশ কিছু সংগীত শিল্পী ও নাট্যশিল্পীর নাম উল্লেখ করেছি। স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে যাদের নাম উল্লেখ করতে পারিনি তাদের সবার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

বেতারে বোধি বৃক্ষের মত যিনি আমাদের সকলকে ছায়া দিয়েছেন, উত্তাল ঝড়ে যিনি দিয়েছেন নির্ভয় আশ্রয় আর সাহস তিনি বেতারের জীবন্ত কিংবদন্তী আশরাফ-উজ-জামান খান—আমার কর্মজীবনের প্রথম শিক্ষাগুরু। শতবর্ষের কাছাকাছি বেতারের এই মহানায়ক তাঁর তারুণ্য আর প্রাণ প্রাচুর্য নিয়ে এখনও কর্মমুখর। আমার দুর্লভ সৌভাগ্য যে তিনি আমার এই বেতার কথার জন্যে একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন যা আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই।

এই গ্রন্থ প্রকাশনা পরিকল্পনায় আমার সহকর্মীদের অনেকেই নানাবিধ তথ্য ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা দান করেছেন। সবচাইতে বেশি তথ্য সাহায্য দিয়েছেন শুভানুধ্যায়ী সহকর্মী আশফাকুর রহমান খান, প্রকৌশলী সহকর্মী ও সম্প্রচার গবেষক মনোরঞ্জন দাস, নাট্যকার কাজী জাকির হাসান, বেতারের কিছু কনিষ্ঠ সহকর্মী এবং আমার কন্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সামিয়া রহমান। প্রচ্ছদ ও রেখাচিত্রে গ্রন্থটি সুশোভিত করেছেন বিশিষ্ট শিল্পী বীরেন সোম। সকলকে আমার অশেষ ধন্যবাদ।

'বেতার কথা' নিয়ে আমার একটা স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নটা এখন দিনের আলোয় সবার হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত।

কাজী মাহমুদুর রহমান

ডিসেম্বর ২০০৫

বিষয় সূচি

প্রথম অধ্যায়

- ঢাকা বেতারের কথা/১১
  ১৯৩৯-২০০৫
- বেতারে নারী/১১২
- একাত্তরের বধ্যভূমি : গল্লামারীর খুলনা বেতার/১২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

- সুকণ্ঠ/১৪১
- বেতারে লেখা ও বলা/১৪৭
- উপস্থাপনা কৌশল/১৫২
- সাক্ষাৎকার/১৫৬
- বেতার নাটক রচনা, প্রযোজনা ও নির্দেশনা/১৬৯

তৃতীয় অধ্যায়

- বেতার নাটক : শেষ বিকেলের গান/১১৭

বেতার কথা

প্রথম অধ্যায়

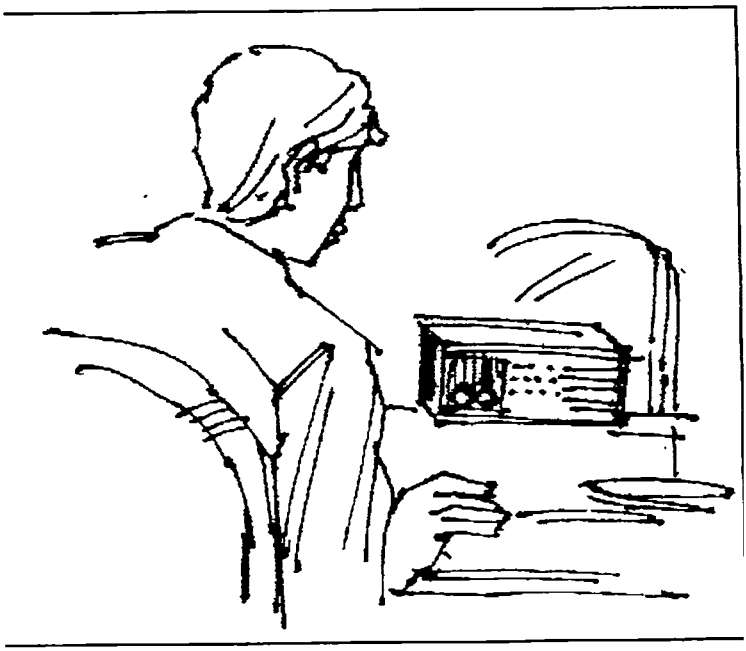

"খুলে দাও দ্বার
নীলাকাশ করো অবারিত
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়"
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

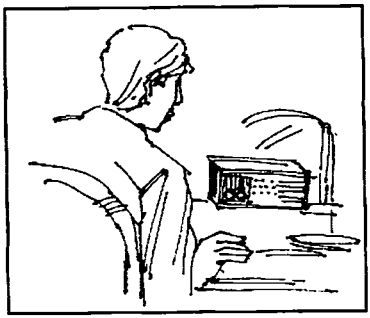

ঢাকা বেতারের কথা

১৯৩৯-২০০৫

একসময় রেডিও বা বেতার নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ছিল বিপুল বিস্ময়। সামান্য একটি যন্ত্রের বাক্সের মধ্যে কত কী রহস্য। কথা হচ্ছে, খবর হচ্ছে, গান, নাটক, হাসি-কান্না কত কী হচ্ছে। সব কিছুই সজীব, প্রাণবন্ত। অথচ কোনও মানুষের দেখা নেই। শব্দ আর কণ্ঠেই তাদের সরব উপস্থিতি, তাদের পরিচয়। মনে হয় বেতার বাক্সের মানুষটি এইতো আমার সামনেই। চোখ বুজলেই আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। এ কী করে সম্ভব! আমি তো রেডিও সেটের সামনে বসে শুনছি। কিন্তু যে কথা বলছে এই মুহূর্তে সে কোথায়? কে তার কথা কিভাবে কোথা হতে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে? আর কীভাবে বিনা তারে তার কথা এই রেডিওতে শোনা যাচ্ছে?

এই সব প্রশ্নের উত্তর এখন কম বেশি সবারই জানা। এই রহস্য আর কিছু নয়- এই বিস্ময় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এর কলাকৌশল বা তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের খেলা। খুব সহজ করে বলতে গেলে স্টুডিওতে মাইক্রোফোনের সামনে বলা কথা মাইক্রোফোনই সেটা শব্দতরঙ্গের প্রতিরূপ বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করে। এই তরঙ্গ স্টুডিও ভবন এবং ট্রান্সমিটার ভবনের নানা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ট্রান্সমিটারে প্রবেশ করানো হয়। ট্রান্সমিটার এই বৈদ্যুতিক শব্দ তরঙ্গকে একটি বাহক তরঙ্গের মাধ্যমে শূন্যে প্রবাহিত করে এবং তা তৎক্ষণাৎ প্রতি সেকেন্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে অপর প্রান্তের গ্রহণযন্ত্রে (রেডিও বা রিসিভিং সেটে) গ্রহণ করে পুনরায় আগের মতো পূর্ণ শব্দ শক্তিতে প্রকাশিত হয়।

আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে ট্রান্সজিস্টর রেডিও এখন সহজ লভ্য। রেডিও এখন শুধু মানুষের ড্রইংরুমের শোভা নয়। তা এখন মানুষের হাতের মুঠোয়, পকেটে, গাড়িতে, নৌকায়, হাটে, মাঠে, ঘাটে। রেডিও এখন গণসংযোগের সবচাইতে সহজ অথচ শক্তিশালী মাধ্যম, মানুষের তথ্য ও বিনোদনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। এক হিসাব মতে সারা বিশ্বের শ্রোতারা পঞ্চাশ কোটিরও বেশি রেডিও সেট ব্যবহার করছেন আর বাংলাদেশের শ্রোতাদেরই রেডিও সেটের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষেরও উপরে।

বেতার যোগাযোগ গবেষণা ও বেতার যন্ত্র আবিষ্কার

রেডিও বা বেতার সম্প্রচার ব্যবস্থার এই যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, এত সহজ কার্যকর ব্যবস্থা রাতারাতি সম্ভব হয়নি। বর্তমান পর্যায়ে পৌছাতে একে পেরিয়ে আসতে হয়েছে অনেক গবেষণা আর নাটকীয় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। দূরের মানুষের সঙ্গে সরাসরি তাৎক্ষণিক যোগাযোগের অদম্য বাসনা, বিজ্ঞানীদের সৃষ্টিশীল কল্পনাশক্তি আর তাদের নিরলস সাধনার ফসল হচ্ছে আজকের এই সম্প্রচার ব্যবস্থা।

আমরা সবাই জানি যে ইটার্লির তরুণ বিজ্ঞানী গুগ্লিয়েলমো মার্কোনি হচ্ছেন বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক। কিন্তু তাঁর আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই বেতার তরঙ্গ যোগাযোগের সম্ভাবনা নিয়ে অনেক দেশেই গবেষণা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই গবেষণায় মার্কোনি ছাড়াও আর যাদের অনন্য অবদান তাঁরা হলেন জার্মানির কার্ল ব্রাউন ও এডোলফ স্লেবি, রাশিয়ার আলেকজান্ডার পপভ, বৃটেনের অলিভার লজ ও অ্যালেক্স মুরহেড, আমেরিকার ফেসেন্ডেন ও টেসলা, এবং আমাদের বাংলাদেশের বিক্রমপুরের স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু ১৮৯৪ সালে গবেষণা পর্যায়ে প্রথম বেতার সংকেত প্রেরণের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। এরপর ১৮৯৫ সালে কলকাতায় তিনি তদানীন্তন গভর্ণরসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে একঘর থেকে অন্য একটি ঘরে বেতার সঙ্কেত পাঠিয়ে তরঙ্গ যোগাযোগে তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রদর্শন করেন। বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করলেও পদার্থ বিজ্ঞানের এই কৃতি বিজ্ঞানী ছিলেন গভীরভাবে উদ্ভিদ প্রেমিক ও সাহিত্যিক। উদ্ভিদের জীবন ও সংবেদনশীলতা নিয়ে গবেষণাই ছিল তাঁর মূল আগ্রহের বিষয়। তাই পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ও অবহেলার কারণেই তাঁর বেতার যন্ত্রের পেটেন্ট করা হয়নি এবং বেতার যন্ত্রের প্রথম আবিষ্কারক হিসাবেও তিনি স্বীকৃতি পাননি। অন্যদিকে ইটালির মার্কোনি নিজ দেশ ত্যাগ করে বৃটেনে চলে যান এবং বেতার তরঙ্গ যোগাযোগের গবেষণা কর্মে বৃটেনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সেখানেই ১৮৯৫ সালে বেতার যোগাযোগে সবচাইতে সফল পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং প্রদর্শন করে বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসাবে সম্মানজনক স্বীকৃতি ও খ্যাতি লাভ করেন।

এরপর থেকে বেতার যোগাযোগ প্রযুক্তি এগিয়ে চলে নানা গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। ১৮৯৯ সালের ১২ ডিসেম্বর বৃটেন থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে ভেসে যায় বেতার সঙ্কেত, প্রতিষ্ঠিত হয় বৃটেন-আমেরিকা বেতার সংযোগ। সমুদ্রগামী জাহাজগুলোতে বেতার বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণযন্ত্র সংস্থাপন করা হয় যাতে করে দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজের যাত্রীদের জীবন রক্ষার জন্য আবেদন (এস ও এস) প্রেরণ করা যায়।

বেতার সম্প্রচার কাহিনী

এরপর বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেন কী করে বেতার প্রেরণ যন্ত্র শুধু একটি নির্দিষ্ট গ্রহণ প্রান্তে একজন গ্রাহকের জন্য ব্যবহার না করে সার্বজনীন গ্রাহকের জন্য

ব্যবহার করা যায়। ডা. ডি ফরেস্ট নামে এক বিজ্ঞানী ১৯০৮ সালে প্যারিসের আইফেল টাওয়ার থেকে এবং ১৯১০ সালে নিউইয়র্কের অপেরা হাউজ থেকে অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করেন বলে জানা যায়। জার্মানিতেও বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার বেশ উন্নতি সাধিত হয় এবং ১৯১৭ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান সেনাবাহিনী বেতার সম্প্রচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে। তবে এসব ব্যবস্থা ছিল খুবই সীমিত পর্যায়ের।

সম্প্রচারের নবযাত্রা

বেতার সম্প্রচারের নবযাত্রা অনেক বৈজ্ঞানিক বিজয়ের মতোই কিছুটা আকস্মিক। ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিটস্‌বার্গ শহরে ওয়েষ্টিং হাউজ কোম্পানির এক প্রকৌশলী আপন খেয়াল বশে কিছু একটা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য একটা প্রেরক যন্ত্রের মাধ্যমে কিছু সংগীতানুষ্ঠান প্রচার করতে থাকেন। তিনি নিজেই অবাক হয়ে যান যখন জানতে পারেন যে বহু সৌখিন ব্যক্তি তাদের গ্রাহক যন্ত্রে সেসব সংগীত ধরেছেন এবং এই সম্প্রচার দারুণ পছন্দ করেছেন। বিষয়টা তিনি কোম্পানির সহ-সভাপতি হেনরি ডেভিসকে জানান এবং নিয়মিত সম্প্রচারের ব্যাপারে তার পৃষ্ঠপোষকতা কামনা করেন। সহসভাপতি তাকে উৎসাহ সমর্থন জানান এবং বিষয়টা আরও জনপ্রিয় করার ব্যাপারে সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। সবচাইতে মজার ব্যাপার হল কোম্পানির গুদাম ঘরে বহু বেতার গ্রাহক যন্ত্র ক্রেতার অভাবে পড়েছিল অনেকদিন থেকে। প্রকৌশলী কোনার্ডের অনুষ্ঠানমালার আকর্ষণে বেতার যন্ত্র কেনার হিড়িক পড়ে যায় এবং গুদামের সব সেট অতি দ্রুত বিক্রি হয়ে যায়। কোম্পানি KDKA নাম দিয়ে বিশ্বের প্রথম নিয়মিত সম্প্রচারের এ কেন্দ্রটি নিবন্ধকৃত করেন। এর মাঝে সম্প্রচার কেন্দ্রটির জনপ্রিয়তা বাড়ানোর এক সুযোগ এসে পড়ে। সে বছর ২ নভেম্বরে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। সে নির্বাচনের সংবাদ বিবরণ KDKA তাৎক্ষণিকভাবে প্রচার করে। সেটাই ছিল বিশ্বের সর্ব প্রথম বেতার সম্প্রচারিত নির্বাচন। এরপর আমেরিকায় আরও অনেক সম্প্রচার কেন্দ্র চালু হতে থাকে-বিচিত্র তাদের নাম WJZ, KYW, WBZ। আমেরিকায় বেতার সম্প্রচারের উন্নয়নে সেখানকার দু'টো বড় কোম্পানি আর, সি, এ এবং ওয়েষ্টিং হাউজের প্রতিযোগিতাও বেশ কাজ করেছিল। তখন থেকে বেতার সম্প্রচার যেন সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার মতোই দিকে দিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যুক্তরাজ্য, হল্যান্ড, জার্মানি, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড-এ গড়ে ওঠে পেশাদার সম্প্রচার কেন্দ্র। কারিগরী ও পরিচালনা মানের উন্নয়নের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। অবশ্য বি. বি. সি দাবি করে ১৯২৪ সালে তাদের প্রচারিত অনুষ্ঠানই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক পেশাদার মানের অনুষ্ঠান।

ভারতীয় উপমহাদেশে বেতার সম্প্রচার

ভারতীয় উপমহাদেশে বেতার সম্প্রচার চালু করার প্রথম প্রচেষ্টা নেয় একটি অপেশাদার সৌখিন প্রতিষ্ঠান-মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি অ্যামেচার রেডিও ক্লাব, ১৯২৪ সালে। ১৯২৬ সালে ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক কার্যক্রমসহ বেতার অনুষ্ঠান সম্প্রচারের অনুমতি লাভ করে। পরবর্তী বৎসর ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠানটি ১.৫ কিলোওয়াট শক্তিবিশিষ্ট একটি ট্রান্সমিটার কলকাতায় এবং একই শক্তির আরেকটি ট্র্যান্সমিটার বোম্বাই শহরে স্থাপন করে। সেই সম্প্রচার কেন্দ্রদ্বয়ের অনুষ্ঠান গ্রহণযোগ্য এলাকা বা আওতা (Coverage area) ছিল খুব ছোট এবং সে সময় সারা দেশে লাইসেন্স করা বেতার গ্রাহক যন্ত্র বা রেডিও সেটের সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান আই. বি. সি (IBC) মূলতঃ রেডিও সেটের মালিকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সামান্য অংকের লাইসেন্স ফিএর উপর নির্ভরশীল ছিল। ঐ অল্প সংখ্যক রেডিও সেটের লাইসেন্স ফিতে আশাপ্রদ কোনও আয় উন্নতি করতে না পারায় ১৯৩০ সালের মার্চ মাসেই কোম্পানিটি তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নেয়।

উপমহাদেশে বেতার সম্প্রচারে সরকারি উদ্যোগ

এরপর বৃটিশ শাসিত ভারত সরকার পরীক্ষামূলক বেতার কেন্দ্র চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারের শিল্প ও শ্রম বিভাগ (Department of Industry & Labour) এর অধীনে ইন্ডিয়ান ষ্টেট ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস Indian State Broadcasting Service) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দুই বছর প্রতিষ্ঠানটি (ISBS)-কে টিকে থাকার প্রয়াসে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়। কিন্তু ১৯৩২ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি লাভ করতে আরম্ভ করে; এর সাথে বিবিসি কর্তৃক বৃহত্তর কার্যক্রম (Empire Service) প্রচারের ফলে এই বেতার প্রতিষ্ঠানের শ্রোতা সংখ্যা, দেশের রেডিও সেটের সংখ্যা বেড়ে যায়। রাজস্ব আয়ের এই বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয়ে এবং একই সাথে রাজনৈতিক বিবেচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৩৪ সালে সরকার দিল্লীতে সম্প্রচার কেন্দ্র স্থাপন এবং বেতার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারনের মাধ্যমে সম্প্রচার প্রক্রিয়াকে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৩৫ সালে বিবিসি'র লায়োনেথ হেলডেন সম্প্রচার নিয়ন্ত্রক (Controller of Broadcasting) হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি বিবিসি'র একজন প্রকৌশলীর প্রকৌশলগত সহায়তা নিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পুর্নাঙ্গ সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের রূপ দেন। ১৯৩৬ সালের ৮ই জুন তারিখে আই এস বি এস'কে অল ইন্ডিয়া রেডিও (AIR) নামে নতুনভাবে নামকরণের কৃতিত্বও মিঃ হেলডেনেরই।

'অল ইন্ডিয়া রেডিও' সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবিসি'র আদলে সংগঠিত ও সংস্থাপিত হবার পর ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে দিল্লি কেন্দ্র ছাড়াও কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এ বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র খোলা হয়। দিল্লি, কলকাতা ও বোম্বাই এই

তিনটি প্রধান বেতার কেন্দ্রে মধ্যম তরঙ্গ (Medium wave) ট্রান্সমিটারের পাশাপাশি দূরবর্তীস্থানে বেতার অনুষ্ঠান প্রেরণের জন্য ক্ষুদ্রতরঙ্গ (short wave) ট্রান্সমিটারও স্থাপন করা হয়।

অল ইন্ডিয়া রেডিও'র ঢাকা বেতার বা 'ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ইউরোপ জুড়ে নাৎসি বাহিনীর তাণ্ডবে বৃটিশ সাম্রাজ্য চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। জার্মান বেতার থেকে জার্মান সৈন্যদের হাতে ইংরেজ সৈন্যদের বিপর্যয় ও পরাজয়ের খবর অত্যন্ত ফলাও করে প্রচার করা হতে থাকে। সে অবস্থায় ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ আর প্রয়োজনে এবং নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচারের উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার করাচি, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, পেশোয়ার, তিরুচি এবং ঢাকা সহ ছয়টি স্থানে ছয়টি মিডিয়াম ওয়েভ বেতার কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে একটি ভাড়া করা বাড়িতে (বর্তমানে এটি বোরহানউদ্দিন কলেজ) দু'টি স্টুডিও নিয়ে বেতার সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে। প্রথম নামকরণ করা হয়, "ঢাকা ধ্বনি

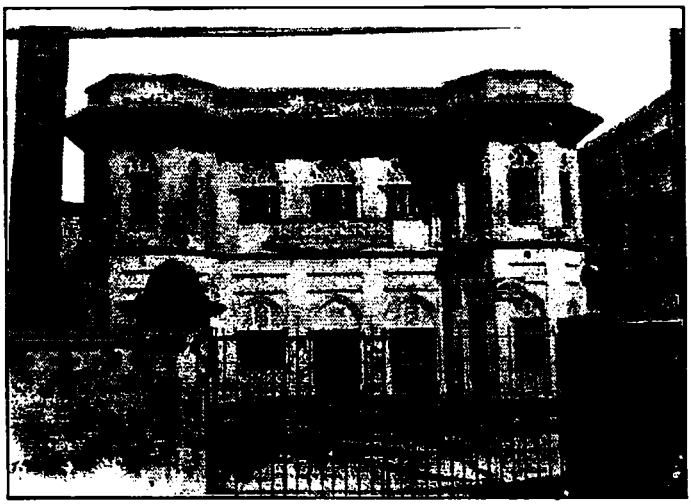

নাজিমুদ্দিন রোডের প্রথম বেতার ভবন—যা ১৯৩৯ সাল থেকে ব্যবহৃত হত। ১৯৬০ সালে এটি পরিত্যক্ত হয়।

বিস্তার কেন্দ্র"। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেয়া ইংরেজিতে একটি বাণী সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়। ঢাকা বেতারের সম্প্রচার যন্ত্র অর্থাৎ ট্রান্সমিটারটি বসানো হয়েছিল বর্তমান কল্যাণপুরে। এটি ছিল রেডিও কর্পোরেশন অব আমেরিকার তৈরি মাত্র ৫ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন। এই ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ৪০-৫০ মাইল পর্যন্ত অনুষ্ঠান শোনা যেত। পুরনো স্মৃতি হিসেবে এটি এখনও সযত্নে রক্ষিত।

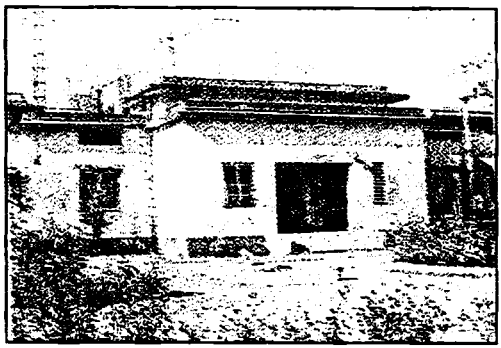

কল্যাণপুর ট্রান্সমিটার ভবন, ১৯৩৯

সেই সময় ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্রের প্রথম পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন অধ্যাপক ড. অমূল্য চন্দ্র সেন। তিনি ছিলেন পন্ডিত, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ডক্টরেট। অনুষ্ঠান প্রযোজনার জন্য কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে চারজন প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্টকে বদলি করে আনা হয়েছিল। এরা হলেন স্বনামখ্যাত শিল্পী প্রভাত মুখার্জি, শামসুর রহমান, সুনীল বোস ও সুদেব বসু। ঢাকায় এসে তাঁরা শূন্য অবস্থা থেকে কাজ শুরু করেন। শিল্পী সংগ্রহ এবং অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য ঢাকার সংগীত ও নাটকের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ শুরু করেন এবং সবার সাহায্য সহযোগিতায় বেশ কিছু গুণী শিল্পীকে খুঁজে বের করেন।

স্টুডিওর সীমাবদ্ধতা, অনুষ্ঠান প্রচারের সীমাবদ্ধতা এবং শিল্পীর অভাব সত্ত্বেও ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ঢাকা বেতারের অভিযাত্রার কালটি নানাকারণেই স্মরণীয়। সময়ের স্বল্প পরিসরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশুভ প্রতিক্রিয়া, ভারতব্যাপী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস ও সহিংস আন্দোলন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও ঢাকা বেতার এ অঞ্চলের শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নিজের অস্তিত্ব সযত্নে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে এবং শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। পুরনো ঢাকা বেতার সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সেকালের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী লায়লা আর্জুমান্দ বানু ১৯৮৯ এর নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যার 'বেতার বাংলা'য় তাঁর এক স্মৃতিচারণমূলক লেখায় বলেছেন,– "১৯৩৯ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবেমাত্র ধ্বংসের নিশান উড়িয়ে ইউরোপে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে। সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায়, রাস্তাঘাটে, ঘরে-বাইরে শুধু লড়াইয়ের খবর। ঠিক এই সময় ঢাকায় রাস্তাঘাটে, বাইরে আর এক জোর খবর, ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হবে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৬ ডিসেম্বর থেকে। আমি তখন ইডেন হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী।"

"এক বছর আগে ১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি ঘোড়াগাড়ি করে বাবা আমাদের একবার মীরপুরের দিকে বেড়াতে নিয়ে যান। ঢাকা থেকে মীরপুর যাওয়ার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তার দু'ধারে তখন মানুষের বসতি সহজে চোখে পড়ত না। মীরপুর মাজার শরীফের চারপাশের জঙ্গলে চিতাবাঘ হানা দিত। ঢাকা থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে মীরপুর রাস্তার পাশে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে উঠেছিল ঢাকা বেতার কেন্দ্রের পাঁচ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার। ট্রান্সমিটার তৈরির কাজ তখন চলছিল পুরোদমে। বাবা আমাকে ট্রান্সমিটারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ওই দেখ উঁচু লোহার থামের মতো ওটাই হচ্ছে 'রেডিও ট্রান্সমিটার মাস্ট'। এখান থেকে গান বাজনা প্রচারিত হবে। তোমাকে যত্ন করে গান শেখাচ্ছি, তোমার গান হয়তো একদিন এখান থেকে প্রচারিত হবে। আর কত দূরদেশের লোক সে গান ঘরে বসেই শুনতে পাবে।' তখন বাবার কথাগুলো রূপকথার মতো মনকে কতই না দোলা দিয়েছিল।

"তারপর এলো ১৬ ডিসেম্বর। প্রথমবারের মতো ঘোষক ত্রিলোচন বাবু মাইক্রোফোনের সামনে বললেন "ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র।" পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা হলো ও গোড়াপত্তন হলো এক নতুন শিল্পী আন্দোলনের। তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রতিধ্বনিত হলো তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হকের ভাষণ। ঢাকা শহরে সেদিন এক নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের বন্যা বয়ে গেল। যাদের বাড়িতে বেতার যন্ত্র ছিল তাদের বাড়িতে এবং পাশের রাস্তায় লোকে ভিড় জমালো।

"প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে যারা অংশ নেন তাঁদের সকলের নাম আমার মনে নেই, তবে মনে আছে সংগীতে অংশ নেন ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খান, উৎপলা ঘোষ (বর্তমানে বিখ্যাত সংগীত শিল্পী উৎপলা সেন, সম্প্রতি প্রয়াত-লেখক), কল্যাণী দাস (বর্তমানে বিখ্যাত বাংলার জনপ্রিয় লঘু সংগীত শিল্পী কল্যাণী মজুমদার)। তখনকার দিনে উৎপলা ঘোষ ও কল্যাণী দাস দু'জনেই বেশ ভাল খেয়াল, ঠুমরী ও দাদরা গাইতেন।"

"আরও মনে পড়ে প্রথম দিন সুধীর সরকার (পরে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের 'পল্লী মঙ্গল' আসরের পরিচালক) রচিত একাংকিকা 'দুয়ে দুয়ে পাঁচ' অভিনীত হয়েছিল। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন আমোদ দাস গুপ্ত, বিপুল দত্ত গুপ্ত, নির্মল সেন, সুধীর রায় এবং সংযুক্তা সেন।

"ঢাকা বেতারের প্রথম দিনে 'খেলাঘর' আসরে গান গাইবার আমন্ত্রণ পেলাম আমি, অঞ্জলি ও রেবা নামের একটি মেয়ে। অঞ্জলি এখনও ঢাকা বেতারের শিল্পী। ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর, ঢাকা বেতারের সেই ঐতিহাসিক সন্ধ্যায় আমরা তিনটি ছোট মেয়ে এক সঙ্গে বিখ্যাত সংগীত রচয়িতা অনিল ভট্টাচার্যের লেখা যে দু'টো গান গেয়েছিলাম সে গান দু'টি এখনও আমার মনে পড়ে। গান দু'টির সুর দেন অনিল ভট্টাচার্যের ছোট ভাই নির্মল ভট্টাচার্য।

প্রথম গানটির কয়েকটি লাইন হলো ঃ

খেলার সাথী এসো এসো
আমার খেলা ঘরে
খেলার ডালি সাজিয়ে আছি
বসে তোমার তরে।
খেলার ফুলে মালা গেঁথে
খেলার আসন দেব পেতে
খেলার প্রদীপ জ্বেলেছি আজ
অনেক আশা ভরে।"

এ গান ছাড়াও সমবেত কণ্ঠে আমরা গেয়েছিলাম 'বাংলাদেশের মেয়ে মোরা ঝর্ণা গানে চলি'। প্রথম দিনে অনুষ্ঠান পরিচালকের হাতে রয়ে গেল প্রায় মিনিট দশেক সময়। তখনকার দিনে ছোটদের লেখা গান এবং সুর দু'টোরই অভাব। তাই যখন আমাকে একা একটি গান গাইতে বলা হলো, তখন আমার সংকীর্ণ গানের খাতায় একটি গানের ওপর নজর্ পড়লো, তাই গেয়ে ফেললাম। এটিই রেডিও থেকে আমার প্রথম একা গাওয়া গান। গানটি নজরুল ইসলামের লেখা তখনকার দিনে জনপ্রিয় ঃ

নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি জল
মলিন হয়েছে ঘুমে
চোখের কাজল।

"তখন কি জানতাম যে, এটি খেলাঘরের উপযুক্ত গান না? এখনও আমার মনে পড়ে 'নতুনদা' (প্রভাত মুখার্জির) পরিচালনায় এবং ফোকলা দাঁত 'বুড়ো মামা'র (বেচু বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় অল ইন্ডিয়া রেডিওর বাংলা নিউজরিডার) হাস্য রসিকতায় আর আমাদের মতো ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের কলকাকলিতে সেদিনের সেই 'খেলাঘর' কতখানি জীবন্ত ও আনন্দমুখর হয়ে উঠতো।"

ঢাকা বেতারের জন্মলগ্নের অন্যতম অগ্রনায়ক, সে সময়ের প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট শামসুর রহমান (পরবর্তী কালে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেক্টর) এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তাঁর এক স্মৃতি কথায়।

"১৯৩৯-এর ১৬ই ডিসেম্বর, রেডিও বাংলাদেশ, তখনকার অল ইন্ডিয়া রেডিও ঢাকার উদ্বোধন হয়েছিল এক আকস্মিক, এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে। সেজন্য সেই উদ্বোধনকে "অকালবোধন" বলে আখ্যায়িত করাই সঙ্গত।

কিন্তু সেদিনকার সেই উদ্বোধনী বা অকালবোধনের আগে এই কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠার এক কষ্টসাধ্য, এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস রয়েছে। আর সেই ইতিহাস রচনায় আমি অগ্রপথিক, অগ্রনায়ক ছিলাম, সেজন্য আমি গর্ববোধ করি।

সেদিন রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রটিকে আমি আমার তিন সহকর্মী প্রভাত মুখার্জী, সুদেব বোস, সুনীল বোসের সঙ্গে, আমার মনের সমস্ত কল্পনা ঢেলে, সবটুকু ঐশ্বর্য্য নিংড়ে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলাম। সেদিন ঢাকা বেতার ছিল আমার মানসলোকের স্বপ্নের ছবি। সেই দিনগুলোর সুখ-স্মৃতি আমার মনের পর্দায় রৌদ্র মেঘের খেলার মত মূর্ত হয়ে ওঠে, আমাকে এক নিবিড় সুখের আবেশে আপ্লুত করে, আমাকে পুলকিত করে।

রেডিও বাংলাদেশ, ঢাকার প্রতিষ্ঠা আর তার উদ্বোধন সম্পর্কে কথা বলবার আগে তখনকার বেতারের পটভূমিকার কথা একটু বলতে হয়।

সে সময়, এই উপমহাদেশে, বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারতে, কেবলমাত্র কোলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ ও বম্বেতে চারটি বেতার স্টেশন ছিলো। এই চারটি স্টেশনই ছিলো স্বল্পশক্তিসম্পন্ন। তখন কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রম ছিলো না। বেতার বিভাগের সেটের সংখ্যা ছিল নগন্য। তাই এই বিভাগের আয় ছিল যৎসামান্য। অন্য পক্ষে, বেতার বিভাগ ছিল ব্যয়বহুল বিলাসিতার সামিল। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে আর প্রয়োজনে ভারত সরকারকে এই ব্যয়বহুলতা এই বিলাসিতা ব্যয়ভার বহন করতে হোত। উদ্দেশ্য, আনন্দ বিতরণের মিষ্টি মোড়কে করে এই উপমহাদেশের লোকদের বৃটিশ শাসনের গুণগানের পিল গেলানো। এই উদ্দেশ্যেই এই সময় ঢাকা, করাচী, পেশোয়ার ইত্যাদি জায়গায় আরও পাঁচটি মিডিয়াম ওয়েভ স্টেশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঢাকা স্টেশনের জন্যে ১৯৩৯-এর মাঝামাঝির কিছু আগে ২১ নং স্যার নাজিমুদ্দিন রোডে, খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন সাহেবের দোতালা বাড়ীটা স্টুডিওর জন্য ভাড়া নেয়া হোল। রিসিভিং সেন্টার আর ট্রান্সমিটার-এর জন্যও মনিপুর আর মীরপুরে জমি বরাদ্দ নেয়া হোল। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি আর সাজ সরঞ্জাম আমদানীর অর্ডারও দেয়া হোল। ধীরে সুস্থে যখন হোক, কাজ শেষ হলে, বেতার স্টেশনটি চালু করা হবে। এমন সময় হঠাৎ ৩রা সেপ্টেম্বর জার্মানীর সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেল। যুদ্ধের গোড়া থেকে জার্মানীর হাতে বৃটিশ বেদম মার খেতে লাগলো। বৃটিশের এই মার খাওয়ার কথা জার্মান বেতারে রং চড়িয়ে ফলাও করে প্রচার হতে লাগলো। বৃটিশের কাহিল অবস্থার কথা ধামাচাপা দিয়ে, না সেরকম কিছু নয়, একথা বৃটিশ উপনিবেশের লোকদের বোঝানো দরকার। তার সর্বোত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে বেতার প্রচার। বৃটিশের তখন তিলার্ধ বিলম্ব করবার মত অবস্থা নয়। অতএব, তাড়াতাড়ি ঢাকা বেতার স্টেশনটি গড়ে তুলে সেটিকে ১৬ই ডিসেম্বর চালু করবার ডেটলাইন দেয়া হোল। কিন্তু স্টুডিও গড়লে তার ট্রান্সমিটার খাড়া করলেই তো হোল না। অনুষ্ঠান ছাড়া সব বে-কায়দা। আবার অনুষ্ঠানের জন্য শিল্পী চাই। সেইসব শিল্পী খুঁজে বের করা চাই, অনুষ্ঠান রচনা করা চাই, অনুষ্ঠানকে সুন্দর করে পরিবেশন করা চাই। সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু চাই। বিশেষ করে তখনকার দিনের ঢাকার মতো একটা জেলা শহরে এতো সব কাজের জন্য কঠোর পরিশ্রমী, কৃশলী কর্মীর দরকার। বেতার দফতর অনেক ভেবে চিন্তে, অনেক বাছাবাছি করে,

শেষকালে ঠিক করলেন, ষাঁড়ের মতো খাটুইয়ে, তাগড়া, উঠতি বয়সের চার নওজোয়ান, প্রভাত, সুদেব, সুনীল আর আমাকে তড়িঘড়ি ঢাকায় চালান করা হোক। অতএব, ঢাকায় আসতেই হোল আমাদের চারজনকে।

যতদূর মনে পড়ে ১৯৩৯ এর ১৪ সেপ্টেম্বরে সুনীল, প্রভাত আর আমি, এই তিনজন কলকাতা থেকে ঢাকায় রওয়ানা হই। কলকাতা বেতার থেকে "তোমাদের ঢাকার নির্বাসন যাত্রা শুরু হোক" বলে আমাদের বিদায় অভিনন্দন দেয়া হোল। ট্রেন ছাড়ার অনেক আগেই আমরা শেয়ালদা রেল স্টেশনে এসে একটা ইন্টার ক্লাশ কামরায় চড়ে বসলাম। অনেক শিল্পী বন্ধু অনেকগুলো ফুলের মালা আর তোড়া নিয়ে স্টেশনে আমাদের বিদায় জানাতে এলো। এতে একটা বেশ মজার ব্যাপার ঘটলো। অন্য যাত্রীরা যেই আমাদের কামরায় উঠবার উদ্যোগ করে, অমনি আমাদের শিল্পী বন্ধুদের কেউ হাত জোড় করে বলে, দেখুন দাদা, আমরা বিয়ের বরকে নিয়ে বরযাত্রী যাচ্ছি। আমাদের হৈ হুল্লোড়ে আপনারা তিষ্টোতে পারবেন না। আপনারা বরং দয়া করে অন্য কামরা দেখুন। সুন্দর পোষাকে সজ্জিত আমাদের আর ফুলের মালাটালা দেখে অন্য যাত্রীরা সব একে একে সরে পড়লো। এতে আমাদের ট্রেনযাত্রা হয়েছিল সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব-আরামের। প্রভাত, সুনীল, আমি—আমরা ঢাকায় কোন দিনই যাইনি। ঢাকার কিছুই আমাদের চেনা জানা নেই। সুদেব একমাত্র ঢাকার ছেলে। সে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেনি। তাই আমরা নারায়নগঞ্জ থেকে সোজা দেওয়ানবাজার স্টুডিওতে গেলাম এক অদম্য কৌতুহল নিয়ে। সেখানে গিয়ে তো আমাদের তিন মূর্তির চক্ষু স্থির। ওমা, একি, স্টুডিও, অফিস এসব কোথায়? চেয়ার টেবিল নেই। বিল্ডিংটার উপর নীচে, ঘরে বাইরে সব খানে যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ভর্তি। পেকিং কেসের স্তূপ। ইন্সটলেশন ইঞ্জিনীয়ার জনাব সুরি আর জনাব কে, পি, ব্যানার্জী আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে সব কাজ সম্পন্ন হবার আশা করা যায়। চমৎকার। এবার মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা পাওয়া দরকার। জনাব ব্যানার্জী কিছুদিন থেকে ঢাকায় আছেন। তিনি ঠাটারী বাজারে তিন কামরার একটা বাড়ী ১৫ টাকা মাসিক ভাড়ায় ঠিক করে দিলেন। সেখানে গিয়ে আমরা ঘর সংসার পাতলাম।

আমাদের কাজে নামতে হবে। বসে থাকলে চলবে না। কিন্তু আমাদের পথ বাতলে দেবার কেউ নেই। ঢাকা ষ্টেশনের পরিচালক পদে যাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে ডঃ এ সি সেন, তিনি বেতার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তিনি তালিম নেবার জন্য দিল্লীতে রয়েছেন। আসবেন সেই নভেম্বরের প্রথম দিকে। কলকাতা থেকে ঝানু হোমরা-চোমরা কেউ এসে আমাদের সাহায্য করবেন তেমন ভরসা নেই। তখনকার অবস্থা আমাদের হোল এই রকম, তোমাদের চার-মূর্তিকে যা যা করা দরকার তা করতে পাঠানো হয়েছে ঢাকায়। তোমরা দেখে শুনে বুদ্ধিশুদ্ধি খাঁটিয়ে যা করবার তা করো। তোমরা নেহাতই অপদার্থ, তোমরা জাহান্নামে যাও— আমাদের তখন এই গোছের অবস্থা।

অতএব, আমরা কালক্ষেপণ না করে নিজেদের উদ্যোগে খোঁজ খবর নিয়ে স্থানীয় সংগীত ও নাট্য-রসিক নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে দেখাশুনা করলাম। তাদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা হোল। এদের মধ্যে মুরাপাড়ার জমিদার রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র ব্যানার্জী প্রশংসনীয়ভাবে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তিনি ঢাকার প্রসিদ্ধ কয়েকজন কণ্ঠশিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রীদের তাঁর বাড়ীতে ডাকিয়ে কয়েকটা জলসার ব্যবস্থা করলেন। ফলে আমরা বেশ কয়েকজন শিল্পী পেয়ে গেলাম। তার মধ্যে ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খান, নারায়ণ রাওযোশী, মোহাম্মদ হোসেন, রমানাথ দাস, গৌরচন্দ্র দাস, আরও অনেকে। খান সাহেব এস, এম, তৈফুরও আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য ও আপ্যায়ন করলেন। তিনি তাঁর মেয়ে, তখনকার শিশু শিল্পী লায়লা আরজুমান্দ বানুকে বেতারে অংশগ্রহণের সম্মতি দিলেন। বলদা গার্ডেন খ্যাত বলদা জমিদার পুত্র নৃপেন রায় চৌধুরী শুধু সহযোগিতা করলেন তাই নয়, তিনি আমাদের সাথে করে অনেক সম্ভাব্য শিল্পী, বিশেষ করে মেয়ে শিল্পীদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে লাগলেন। ফলে এদের এবং আরও কয়েকজনের সহযোগিতায় আর আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ উচ্চাঙ্গ, রাগ প্রধান, আধুনিক গীত, গজল, পল্লীগীতি, যন্ত্রসংগীত, নাটক, পল্লী অনুষ্ঠানের জন্য শিল্পী সংগ্রহ করা গেল। এমনকি শরাফত হোসেনের ভালো কাওয়ালী দলও পাওয়া গেল। এইসব শিল্পীদের মধ্যে গৌরচন্দ্র বসাক, গণেন চক্রবর্তী, গুণেণ চক্রবর্তী, সাদেকুর রহমান, আবদুল মজিদ, দেবেন দাসের নাম করা যেতে পারে। নাটকের জন্য উচ্চমানের নাট্যশিল্পী রমাকৃষ্ণ রায়, খগেশ চক্রবর্তী, বিপুল দত্তগুপ্ত, শুভেন্দু লাল সেন গুপ্ত, ভুপাল দাস ঘোষ, বীরেশ্বর বোস আরও অনেককে পাওয়া গেল। পল্লী অনুষ্ঠানের টাইপ চরিত্রের জন্য রবীন গাঙ্গুলী, সুধীর সরকার, নাজির আহমদ, কাজী আব্দুল খালেক, পবিত্র মিত্র, নীরোদ মুখোপাধ্যায়। যন্ত্রবাদকদের মধ্যে মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সতীশ বসাক, ফটিক সাহা, ফটিক দত্ত, রবি দাস ইত্যাদি।

কথিকার জন্য চিন্তা ছিলো না। বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল-কলেজগুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাদের সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন।

কিন্তু দু'চারজন মহিলা ছাড়া অন্যান্য সম্ভাব্য ভদ্র শ্রেণীর মহিলা শিল্পীদের নিয়ে সমস্যা দেখা দিলো। এদের অভিভাবকেরা বেতারে তাদের মেয়ে পাঠাতে নারাজ। শুধু নারাজ নয়, তারা বেতারের উপর সম্পূর্ণ বিরূপ। তার কারণ, ঢাকা কলকাতা নয়। তখনকার ঢাকা অন্যান্য জেলা সমূহের মতো একটা জেলা শহরই ছিলো। তাই দেখা গেল, ঢাকার অধিবাসীরা অতি রক্ষণশীল, সমাজের অসংখ্য বিধিনিষেধের গন্ডিতে বাঁধা। তারা নানা রকম সংস্কারে আচ্ছন্ন। বেতার সম্পর্কে তাদের মন ভ্রান্ত ধারণায় বিভ্রান্ত। বেতারকে তারা মনে করে ফিল্ম লাইনের মতো উশৃঙ্খলতার আর নৈতিক অধঃপতনের এক সর্বনাশা সোপান। তাই বেতারের উপর তাদের বদ্ধমূল

বিরূপতা, বৈরীতা। অতএব, তারা তাদের মেয়েকে বেতারে পাঠাবে না, কদাচ নৈব, নৈবচ।

তাহলে উপায়? ইতিমধ্যে এই সমস্যা-সঙ্কুল অবস্থায় আমাদের কয়েকজন উৎসাহী স্থানীয় বন্ধু নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়ে শিল্পীদের নিয়ে এক গানের জলসার বন্দোবস্ত করলেন। জনসন রোডের মিউজিক্যাল মার্টের উপরে দোতলার একটা ঘরে, যেখানে এইচ, এম, ভি, রেকর্ডিং-এর জন্য রিহার্সেল করতো, সেই ঘরে গানের জলসা হোল। সেই জলসা থেকে পাওয়া গেল খুব উঁচুমানের গানের শিল্পী গীতা দেবী, প্রমোদ বালা, ঝরণা রাণী ইতাদিকে।

এদিকে ঢাকার ভদ্র শ্রেণীর সম্ভাব্য মহিলা শিল্পীদের অভিভাবকদের বুঝানোর জন্য আমরা নিজের এবং আমাদের স্থানীয় বন্ধুবান্ধবরা সবরকম কৌশল ও চেষ্টা করতে লাগলাম। অবশেষে, আমরা প্রস্তাব দিলাম, আপনারা আপনাদের মেয়ে না পাঠান, না পাঠাবেন। আপনারা, নিজেরা আপনাদের জন্য যে স্টুডিও গড়া হচ্ছে, সেটা অন্ততঃ দেখে যান। তারা আমাদের নির্মীয়মান স্টুডিও দেখতে এলেন একে একে। মনে হোল বরফ একটু একটু গলছে। তারপর, তারা পাল্টা প্রস্তাব দিলেন, মেয়ের সঙ্গে গান নাটকের সময়ও আমাদেরও ওই স্টুডিও ঘরে থাকতে দিতে হবে। আমরা বললাম, বেশতো থাকবেন আপনারা। এতে অভিভাবকদের সব সংশয়, সব দ্বিধা দূর হোল। ফলে, আমরা পেয়ে গেলাম ভদ্র শ্রেণীর সব রকম অনুষ্ঠানের জন্য পর্যাপ্ত শিল্পী যেমন সুপ্রভা ব্যানার্জী, হাসনু হেনা, সাবিত্রী ঘোষ, প্রতিমা ঘোষ, নীলিমা ঘোষ, শেফালী দাস, সুরমা দাস, স্বর্ণময়ী পাল, নীলিমা দত্ত, তপতী দাস, মায়া বোস, মায়া দে, মায়া আচার্য, মায়া ভট্টাচার্য, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, শোভন গাঙ্গুলী, সবিতা বসু, সংযুক্তা সেন, পারুল দেবী, সুজাতা বোস, অঞ্জলী বোস, রীনা দে, মনিকা চ্যাটার্জী, অরুণ প্রভা চ্যাটার্জী, অনিমা বোস, ইত্যাদি এবং আরও অনেকে যাদের নাম এখন আর মনে পড়ছে না। এইভাবে আমাদের শিল্পী সন্ধানের যে দীর্ঘ অভিযান চলেছিল আপাততঃ সেই পর্ব সাঙ্গ হোল।

এবার আর এক পর্ব—শিল্পীদের বিশেষ করে সম্ভাব্য মহিলা শিল্পীদের মাইকভীতি ভাঙ্গাবার মহড়া পর্ব। আমাদের মনে রাখতে হবে ৪০ বছর আগে শিল্পীরা বিশেষ করে মহিলারা এখনকার মতো মাইক-ফ্রি ছিলো না। মাইককে তখন তারা জুজুর মতো ভয় পেতো। তখনো কোন স্টুডিও তৈরী হয়নি। তাই বিল্ডিং-এর নীচ তলার দক্ষিণদিকের হল ঘরটা খালি করিয়ে নেয়া হোল। চেয়ার টেবিল নেই। চেয়ে চিন্তে সতরঞ্জি-পেতে বসবার ব্যবস্থা হোল। তারপর একটা মাইক্রোফোন কাঠের বাক্সের উপর ফিট করে কানেকশন তারটা একটা ফোকরের মধ্য দিয়ে চালিয়ে দেয়া হোল। যেন সত্যি মাইক সচল রয়েছে। এই বলে শিল্পীকে মাইকের সামনে বসিয়ে বলা হোত, হাত উচু করে ইশারা করলেই গান শুরু করবেন। বাদ্যযন্ত্র নেই। চেয়ে আনা একটা হারমোনিয়াম আর এক জোড়া বায়া তবলা রাখা হত। শিল্পীকে তারপর হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করবার জন্য ইশারা করা হোত। কিন্তু তাদের মুখ দিয়ে

স্বর, সুর কিছু বের হয় না—কেবল গলা পরিষ্কার করবার খুক খুক শব্দ। সেও অনেকক্ষণ ধরে। এদিকে হাসির দমকে আমাদের ঠোঁটে খিল লাগার অবস্থা। না পেরে মুখে রুমাল চেপে আমরা বাইরে এসে একচোট হেসে পেট খালি করে গম্ভীর হয়ে আবার ঘরে ফিরে যেতাম। এইভাবে আমরা দিনের পর দিন সমস্ত শিল্পীদের মাইকের সামনে এনে তাদের এইরকম মহড়া দিয়ে মাইকভীতি দূর করেছি।

এইসব করতে করতে অক্টোবরের শেষাশেষি এসে গেল। এই অবস্থায় কলকাতার প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর "বড় বাবু" নামে বেতারের খ্যাত, জনাব নীপেন মজুমদার আমাদের কাজের অগ্রগতি দেখতে এলেন। আমাদের কাজ দেখে খুব খুশী হলেন, বাহবাও দিলেন, সমস্ত সম্ভাব্য সঙ্গীত শিল্পীদের ডেকে আনা হোল। তিনি পরখ করে শ্রেণী বিভাগ করে দিলেন। এবার আসল কাজ শুরু হোল। ১৬ই ডিসেম্বর-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রচনা করলাম আমরা। সেই সঙ্গে ক'দিন রাতদিন খেটে ডিসেম্বরের বাকী পনের দিন আর ১৯৪০ সালের প্রথম তিন মাসের অনুষ্ঠান রচনা করা হোল। বড় বাবু সব ব্যাপারে পরামর্শ দিলেন—আমাদের সাথে পরিশ্রমও করলেন—সব বিষয়ে সাহায্য করলেন।

১৬ই ডিসেম্বর-এর যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আমরা রচনা করেছিলাম তার শুরু হয়েছিল ভগবত গীতা পাঠ, কোরান তেলাওয়াত, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠ দিয়ে। উদ্বোধনী সঙ্গীত নির্বাচন করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত "জন-গণ-মন-অধিনায়ক" গানটি। সঙ্গীত আলেখ্য কাজী নজরুল ইসলামের "পূর্বাণী" কেবলমাত্র ঢাকা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে রচিত হয়েছিল। নাটক বুদ্ধদেব বসুর "কাঠঠোকরা" (Woodpacker)। ছোটদের অনুষ্ঠান 'খেলাঘর'-এ সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য ছিলো তখনকার শিশু-শিল্পী লায়লা আর্জুমান্দ বানু। পল্লী অনুষ্ঠান "গ্রামের পথে" এর পরিকল্পনা করা হোল, যেন গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে পল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তার দূরবস্থা, তার উন্নয়নের ব্যবস্থা আলোচনা চলছে, তারপর গ্রামের এক "তরজা" ও কবি গানের আসরে হাজির হওয়া—এই ভাবে।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে এসে গেলেন স্টেশন ডাইরেক্টর ডঃ এ, সি সেন। তিনি ছিলেন অকৃতদার, পণ্ডিত, জ্ঞানতাপস। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ডক্টরেট।

তিনি এসেই সবকিছুরই নতুন নাম দিলেন। অনুরোধের রেকর্ডের গানের অনুষ্টানের নাম দিলেন "কল্পতরু"।

আমরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে অনেক আগে থেকেই ফুলের কেয়ারী তৈরী করে তাতে নানা রকম-মৌসুমী ফুলের গাছ তুলেছিলাম। যাতে উদ্বোধনের দিন সারা স্টুডিও ফুলের রং-এ ঝলমলিয়ে ওঠে—আর তা উঠে ছিলোও।

এরপরের ঘটনাগুলো স্বাভাবিক গতিতে ঘটে ছিল। ঢাকা বেতার কেন্দ্রের জন্য এসেছে সে যুগের সর্বাধুনিক সাজসরঞ্জাম, অপূর্ব চোখ জুড়ানো কার্পেট, সাদা

ঝকঝকে মসৃণ পলিশ করা চেয়ার-টেবিল, এমনকি সুন্দর "এয়ার" ছাপ মারা পাপোষ পর্যন্ত। তিনটে স্টুডিওকে আলাদা রং-এর আসবাব দিয়ে সাজানো হোল। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই স্টুডিও তৈরী শেষ হোল। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের জন্য আমরা আপ্রাণ খেটেছিলাম। মাইক্রোফোন মহড়া দিয়ে যাচাই না করে আমরা কোন অনুষ্ঠানেই প্রচার হতে দিইনি।

১৬ই ডিসেম্বর যতই এগিয়ে আসতে লাগলো, আমরা তিন মূর্তি এক ভীষণ উত্তেজনা, এক অনিশ্চিত আশঙ্কা, এক গভীর আগ্রহ নিয়ে সেই দিনটির জন্য সবকিছু তৈরী করতে লেগে গেলাম। তারপর এলো প্রতীক্ষিত উদ্বোধনের দিনটি, ১৬ই ডিসেম্বর। বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে কোন আড়ম্বর করা হয়নি। কোন মঞ্চসজ্জা করা হয়নি, কোন সামিয়ানাও পর্যন্ত টানানো হয়নি। কোন হোমরা চোমরা সেদিন এর উদ্বোধন করতে আসেননি। সম্পূর্ণ এক অনাড়ম্বর পরিবেশে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৯ ঢাকা বেতারের উদ্বোধন—অকালবোধন—আমরা নিজেরাই করেছিলাম। সংক্ষেপে এই হোল ঢাকা বেতারের জন্মলগ্নের, তার প্রতিষ্ঠার, তার উদ্বোধন, তার অকালবোধনের কথা।"

[১৯৭৯ সালে ঢাকা বেতারের চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত বেতার বাংলা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০ সংখ্যা। শিরোনাম, "চল্লিশ বছর, আগের স্মৃতিকথা।"]

ঢাকা কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শের-এ-বাংলা একে ফজলুল হকের ভাষণ প্রদান সম্পর্কে শিল্পী লায়লা আর্জুমান্দ বানু এবং প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট শামসুর রহমানের স্মৃতিচারণায় একটু ভিন্নচিত্র পাওয়া যায়। লায়লা আর্জুমান্দ বানু বলেছেন, "বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের বাণী দিয়ে। তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রতিধ্বনিত হল তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হকের ভাষণ।" কিন্তু শামসুর রহমান বলেছেন, ".... কোন হোমরা চোমরা সেদিন এর উদ্বোধন করতে আসেননি। সম্পূর্ণ এক অনাড়ম্বর পরিবেশে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৯ ঢাকা বেতারের উদ্বোধন—অকালবোধন—আমরা নিজেরাই করেছিলাম।" শামসুর রহমানের এই লেখায় উদ্বোধনী ভাষণ সম্পর্কে কোথাও শের-এ-বাংলার নাম উল্লেখিত হয়নি। অনুমিত হয় তৎকালীন বাংলার প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শের-এ-বাংলা ঢাকা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনী উপলক্ষে লিখিত শুভেচ্ছা বাণী দিয়েছিলেন এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রচার কালে অন্য কেউ তা পড়ে শুনিয়েছিলেন। শিশু শিল্পী লায়লা আর্জুমান্দ বানু সেটাই শের-এ-বাংলার ভাষণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

ঢাকা বেতারের পুরনো দিনের কথা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট বেতার ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ বেতারের প্রথম প্রাক্তন মহাপরিচালক আশরাফ-উজ-জামান তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

"সে যুগে ঢাকায় একটি বেতার স্টেশন গড়ে তোলার কাজ খুব সহজ ছিল না। বাদ্যযন্ত্রীদের অনেকে এসেছিলেন কলকাতা থেকে। সুধীর সরকার নাটক নিয়ে

বিপদে পড়লেন, মেয়ে শিল্পীরা কেউ নাকি কাজ করতে এগিয়ে আসছে না। নানা রকমের সামাজিক বাধা অনুশাসন ছিল ঢাকায়। ঢাকার স্টেজে তখনও ছেলেরা মেয়ে সেজে অভিনয় করত। মাধুরী চ্যাটার্জি এবং তার বোন অনুরাধা'কে নিয়ে ঢাকার প্রথম বেতার নাটক অভিনীত হয়েছিল। সংগীতে উৎপলা ঘোষ (উৎপলা সেন), গিরীন চক্রবর্তী, গোপাল দাস গুপ্ত, অঞ্জলী রায়, চামেলী দত্ত সকলে মিলে একটা নতুন সংগীত চক্র গড়ে তুলেছিলেন। ওই সময় ঢাকার জন্য নতুন যুগের পরিবর্তন বলা যেতে পারে। অবশ্য ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রচার ক্ষমতা ছিল মাত্র পাঁচ কিলোওয়াট, মানে ঢাকা থেকে পঞ্চাশ বর্গমাইল সীমানা পর্যন্ত। কলকাতারও তখনও একই ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার ছিল। কাজেই ঢাকায় বসে কলকাতা কিংবা কলকাতায় বসে ঢাকার অনুষ্ঠান শোনার কোনও উপায় ছিল না। ভারতে তখন মাত্র দিল্লীতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার স্থাপিত ছিল। সমস্ত খবর দিল্লী থেকে প্রচারিত হতো এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও'র সকল কেন্দ্র থেকে পুনঃসম্প্রচারিত হতো। বিবিসি'র ইংরেজি খবরও সম্প্রচারিত হতো অল ইন্ডিয়া রেডিও'র সকল কেন্দ্র থেকে। ঢাকা বেতারের সংগীত এবং নাটকের মানের চাইতে কথিকা প্রচারের মান ছিল অনেক উন্নত। বাংলা, ইংরেজি, উর্দু তিন ভাষাতেই কথিকা প্রচারিত হতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন অধ্যাপক ছিলেন ড. রমেশ মজুমদার, ড. মুহম্মদ হোসেন, ড. শহীদুল্লাহ, ড. এস এন বসু, নলিনী কান্ত ভট্টশালী, মোহিতলাল মজুমদার। তাঁরা কথিকা প্রচার করতেন। উর্দু কথিকা প্রচারে হাকিম হাবিবুর রহমান আখুনজাদা, ড. আন্দালিব শাদানী, ড. ফিদা আলী খান, সুবিখ্যাত উর্দু শায়ের রেজা আলী ওয়াশার্ত ঢাকা বেতারের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছেন সে সময়ে।"

"যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সাধারণ লোকজনের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান নতুনভাবে তৈরি করা হয়। কারণ ঢাকা তখন ছিল ভারতের সর্ব পূর্বপ্রান্তের বেতার স্টেশন। জাপানিরা বার্মা দখল করে ভারতের আসামের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। ঢাকায় আমেরিকান সৈন্য ঘাঁটি তৈরি হলো কুর্মিটোলায়, কাজেই ঢাকা বেতারের অধিকাংশ অনুষ্ঠানই সেই সময়ে প্রচারিত হতো যুদ্ধের নানা খবর ও ঘটনা নিয়ে। জার্মানি জাপানের বিজয় সম্পর্কে নানা প্রচারের প্রতিবাদেও অনুষ্ঠান তৈরি করা হতো ঢাকা থেকে।"

১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা বেতার চালু হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বেতার নাটক পরিবেশিত হয়েছিল। যতদূর জানা যায়, বুদ্ধদেব বসু'র লেখা "কাঠঠোকরা" নাটকই ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথম নাটক। এরপর সুদেব বোস, প্রভাব মুখোপাধ্যায়, সুধীর সরকার, শামসুর রহমান এঁরাও নিজেদের লেখা নাটক প্রচার করেছিলেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং সুধীর সরকার বেশির ভাগ নাটক প্রযোজনা করতেন। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া, অভিনেত্রী যমুনা দেবী এবং অন্যান্য নাট্যশিল্পীকে নিয়ে ঢাকা বেতারে "দেবদাস" নাটক অভিনয় করে গিয়েছিলেন।

নাজিমুদ্দিন রোডের বেতার ভবনের স্টুডিওর ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে সে কালের সংগীতানুষ্ঠানের আরও একটি চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায় লায়লা আর্জুমান্দ বানুর স্মৃতিচারণে—

"নাজিমুদ্দিন রোডের ভাড়া বাড়িতে আড়াইখানা স্টুডিওতে ঢাকা বেতারের জীবন কাটল সুদীর্ঘ ২১ বছর। একটি স্টুডিওতে ঘোষণা চালাতো দোতলায় এবং এখানেই হতো মেয়েদের আসর, আলোচনা ও কথিকা। এজন্যই একে বলা যেতে পারে বহুমুখী অনুষ্ঠান স্টুডিও। আর একটি স্টুডিও ছিল সংগীতের জন্য। একজন শিল্পী এই স্টুডিওতে গান গাইতেন এবং তারপরে যাঁর অনুষ্ঠান তিনি রিহার্সেল করতেন একদল যন্ত্রী নিয়ে কোণায় ছোট্ট একটা ঘরে। প্রথম শিল্পী গান গেয়ে বেরুচ্ছেন, ঘোষক পরের অনুষ্ঠানের ঘোষণা করছেন এরই মাঝখানে ঠেলাঠেলি করে ঢুকে পড়তে হতো দ্বিতীয় শিল্পীকে। একটি মাত্র সংগীত স্টুডিও-র লালবাতির সামনে সংগীত শিল্পীরা কিউ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন প্রতিদিন একুশ বছর ধরে। যাঁরা ঢাকা বেতারের নতুন ভবনে প্রথম থেকে গান গাইছেন তাঁরা হয়তো আমাদের সেদিনের অসুবিধার কথা কল্পনাও করতে পারবেন না।

এইতো গেল দোতালার দেড়খানা স্টুডিওর কথা। নিচের তলায় ছিল সবেধন নীলমণি '৩নং স্টুডিও'। এটি ছিল আয়তনে বড়, তাই নাটকের শিল্পীদের এখানে অনুষ্ঠান প্রচার করতে দেয়া হতো। এখানে অর্কেষ্ট্রাও বাজতো। পুরনো বেতার ভবনে এক ঘন্টা নাটক বা সঙ্গীত বিচিত্রা প্রচার করে বেরিয়ে আসলে মনে হতো একদল লোক নদীতে ডুবে গোসল করে উঠে এসেছেন। তিন নম্বর স্টুডিও ছিল 'অন্ধকূপের' এক সুসজ্জিত সংস্করণ। নাজিমুদ্দিন রোডের পুরনো বেতার ভবনে, 'এয়ার কণ্ডিশন'-এর বালাই ছিল না। তাই 'তিন নম্বর' স্টুডিওতে নাটক করা আর গোসল করে উঠে আসা ঠিক একই কথা ছিল। নাজিমুদ্দিন রোডের সেই ছোটো বাড়িতে একদিন পা দিয়েছিলেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা নাট্যশিল্পীরা। সেই রুদ্ধ তিন নম্বর স্টুডিওতে ১৯৪০ সালে 'দেবদাস' অভিনীত হলো বেতার শ্রোতাদের জন্য। দেবদাসের ভূমিকায় অংশ নিলেন অমর নাট্যশিল্পী প্রমথেশ বড়ুয়া এবং সঙ্গে ছিলেন পার্বতীর ভূমিকায় যমুনা দেবী।

ঢাকার সঙ্গীতের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বেতার কেন্দ্রে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের উপস্থিতি। ১৯৪০ সালের ১২ ডিসেম্বর নজরুল ইসলামের পরিচালনায় তাঁর লেখা সঙ্গীত বিচিত্রা 'পূর্বাণী' প্রচারিত হলো। সঙ্গীতে অংশ নিলেন চিত্ত রায় এবং শৈল দেবী, বর্ণনায় ঢাকা বেতারের নাট্যশিল্পী রণেন কুশারী।

১৯৪১ সালে খেলাঘর ছেড়ে আমি বড়দের আসরে সঙ্গীত শিল্পী হয়ে প্রবেশ করলাম। আসরে আমি প্রথমে খেয়াল, ঠুমরী ও দাদ্‌রা গাইতে শুরু করলাম। সে যুগের মুসলমান শিল্পী মাত্র দু'একজন-ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খান, শরাফত আলী কাওয়াল, ফকির মোহাম্মদ প্রমুখ। ঢাকা বেতাবের দ্বিতীয় মুসলিম মহিলা সঙ্গীত

শিল্পী হলেন মালেকা পারভীন বানু। ১৯৪৪-৪৫ সালে খাদেম হোসেন খান বেতারের শিল্পী হিসেবে যোগ দিলেন। সাদেক আলী, মমতাজ মিয়া ছিলেন সে যুগের স্টাফ আর্টিষ্ট যন্ত্রী। সে সময়ের অমুসলমান যন্ত্রী স্টাফ আর্টিষ্টদের মধ্যে ফটিক দত্ত ও রবী দাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সঙ্গীতে যাঁরা অংশ নিতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন উৎপলা ঘোষ (সেন), লিলি ঘোষ, লাবণ্য লেখা রায়, সুনীতি চক্রবর্তী, কল্যাণী দাস, সুমিত্রা সেন, শেফালী দাস, সরমা দাস, সবিতা সিংহ, করুণা গুপ্ত, তপতী দাস, অঞ্জলি মুখার্জী, দেবব্রত ঘোষ, বিমল চন্দ্র রায়, কল্যাণ মুখার্জী, সত্য গোপাল দেব, ব্রজ গোপাল দাস, গৌর চন্দ্র বসাক, নিখিল দেব, সুধীর দাস, নীলিমা কর (দাস), নিভারাণী রায়, তসের আলী মিয়া, আবদুল মজিদ তালুকদার, দারোগ আলী, আখতার আলী কাওয়াল এবং কালু মিয়া প্রমুখ। সে যুগের সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন নির্মল ভট্টাচার্য (ইনি ঢাকা বেতারের সর্বপ্রথম সঙ্গীত পরিচালক) গোপাল দাস গুপ্ত, চিন্ময় লাহিড়ী, সুরেশ চক্রবর্তী, গিরিণ চক্রবর্তী।

সে যুগে ঢাকা বেতারে দু'দল অর্কেষ্ট্রা ছিল। একটি ছিল 'সুর বিতান' এবং অপরটি 'তানচক্র'। এদু'টি পরিচালনা করতেন মনোরঞ্জন মুখার্জী এবং গঙ্গাপদ আচার্য। এরা একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন বহু বছর ধরে 'বিশ বছর আগে ও বিশ বছর পরে।' এই অনুষ্ঠানে সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে এরা সঙ্গীতের গতি ও ধারার পরিচয় দিতেন। আর কথক হিসেবে (৪১-৪২ সালে) অংশ নিতেন সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর ও সারা তৈফুর।

এ মাসের গান, 'রবিবারের গান' ছিল সে যুগের বিশেষ সঙ্গীত অনুষ্ঠান। অনুরোধের আসর 'কল্পতরু' রেকর্ড অনুষ্ঠান 'হারানো দিনের সুর' প্রভৃতি ছিল জনপ্রিয় অনুষ্ঠান।

সে যুগে ঢাকা ও কোলকাতা বেতার কেন্দ্রে এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রের সঙ্গীত শিল্পীরা অতিথি শিল্পী হিসেবে অংশ নিতেন। এই সূত্রে অনেকে ঢাকায় আসেন আর আমরাও অনেকে যাই কোলকাতায়। নাজিমুদ্দিন রোডের স্টুডিওতে আসেন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শচীন দেব বর্মণ, বেচু দত্ত, ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, সুপ্রভা ঘোষ (সরকার), অনিমা দাস গুপ্ত, দিপালী তালুকদার (নাগ), আব্বাসউদ্দিন আহম্মদ ও আবদুল আহাদ প্রমুখ।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও ঢাকার প্রথম ডাইরেক্টর ছিলেন অমূল্য সেন এবং মাঝে ছিলেন অশোক সেন, শেষ ডাইরেক্টর ছিলেন উমা শংকর। তারপর এল পাকিস্তান, ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট। পাকিস্তান ব্রডকাষ্টিং সার্ভিসের সূচনা হলো, ঘোষণা প্রতিধ্বনিত হলো প্রথম বারের মত রাত ১২টার সময় নাজির আহমেদের কণ্ঠে 'পাকিস্তান ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস-ঢাকা' শুরু হলো নতুন এক যুগের।"

সে কালের অনুষ্ঠান ঘোষক, ঘোষিকা

কণ্ঠসম্পদ ও উপস্থাপনা কৌশলে বেতারের অনুষ্ঠান ঘোষক, ঘোষিকারাও ছিলেন শ্রোতাদের অন্যতম আগ্রহ ও বিপুল কৌতূহলের বিষয়। ১৯৩৯ এর ১৬ ডিসেম্বর প্রথম অনুষ্ঠান ঘোষক ছিলেন ত্রিলোচন বাবু। এরপর যারা অনুষ্ঠান ঘোষণা করতেন তারা হচ্ছেন নিরোদরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পবিত্র মিত্র, লিলি ঘোষ, নিরঞ্জন বসু প্রমুখ। ঘোষক, ঘোষিকাদের কণ্ঠে প্রথম প্রথম 'ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র' বলা হলেও কিছুদিনের মধ্যে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও, ঢাকা' এই নামে ঢাকা বেতারের পরিচিতি বা স্টেশন কল দেওয়া শুরু হয় এবং তা ১৯৪৭ এর ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত চালু থাকে।

দেশ ভাগাভাগির পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাত ১২টায় বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী, অনুষ্ঠান ঘোষক নাজির আহমেদ ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম অনুষ্ঠান ঘোষণা দেন 'পাকিস্তান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস'। এরপর থেকে অবশ্য ঢাকা বেতার রেডিও পাকিস্তান ঢাকা নামে অভিহিত হয়। রেডিও পাকিস্তান ঢাকার সে কালের খ্যাতনামা অনুষ্ঠান ঘোষক, ঘোষিকা যাঁরা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ইসলাম আহমেদ, এনায়েত মওলা, সৈয়দ রশিদুন্নবী, আব্দুল মতিন, হাসিনা মওলা, সিদ্দিকা বেগম, দিলারা হাশেম প্রমুখ। সুরাইয়া বেগম (ডা. সুরাইয়া জাবীন), আমিনা মুসা ছিলেন ইংরেজি ঘোষিকা। অনুষ্ঠান ঘোষক হিসাবে সবচাইতে প্রবীণ ইসলাম আহমেদ ১৯৪২ সালে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সংগীত শিল্পী হিসাবে সংগীত পরিবেশন করেছিলেন। এরপর তিনি ১৯৪৪ সাল থেকে নাটক বিভাগের শিল্পী হন এবং বিভিন্ন নাটকে অংশ নিতে থাকেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে সে সময়ের 'ঢাকা বেতারের প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট খন্দকার মোহাম্মদ সাদেকুর রহমানের অনুপ্রেরণায় নাট্যশিল্পী ইসলাম আহমেদ ১৯৪৮ এর ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা বেতারে তাঁর অনুষ্ঠান ঘোষকের জীবন শুরু করেন এবং এরপর পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি প্রধান অনুষ্ঠান ঘোষক হিসাবে ঢাকা বেতারের উপস্থাপনা বিভাগকে সুসংগঠিত করেছেন। কালের স্বাক্ষী হিসাবে বর্ষীয়ান এই শিল্পী এখনও জীবিত।

রেডিও পাকিস্তান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটল। ১৯৪৭–এর আগস্টে ভারতবর্ষ দ্বিখন্ডিত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি হল। মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা একটি প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হল পাকিস্তান রাষ্ট্রে। পাকিস্তানের একটি আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা বেতারের প্রথম নামকরণ হল পাকিস্তান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস এবং ১৯৪৮ সালে পুনরায় নামকরণ হল রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা। দেশ বিভাগের আগে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে হিন্দু শিল্পীর সংখ্যাই ছিল বেশি। দেশ বিভাগের সময় হিন্দু শিল্পীদের, স্টাফ বাদ্যযন্ত্রীদের ব্যাপক দেশ ত্যাগের ফলে ঢাকা বেতারে একটি বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হল এবং অনুষ্ঠান

প্রচার দুরূহ হয়ে পড়ল। তখন মুসলমান শিল্পী ছিলেন হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন। মুসলমান সমাজের বেশির ভাগ পরিবারে গান-বাজনা, নাটক, শিল্পী-সংস্কৃতির চর্চা নাজায়েজ হিসেবে বিবেচিত হত। এই অবস্থার মধ্যে বেতারের কর্মকর্তারা বিপাকে পড়লেও হতোদ্যম হলেন না। শূন্যতা পূরণের জন্য তারা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করলেন। এ সময়ে রেডিও পাকিস্তান ঢাকার প্রথম ডাইরেক্টর ছিলেন জি. কে. ফরিদ। তারপর প্রথম দিকের কয়েকজন বাঙালি যাঁরা ডাইরেক্টর, তাঁরা হলেন জয়নুল আবেদিন, আহসানুল হক, এ এফ এম কলিমুল্লাহ। প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট শামসুর রহমান, সাদেকুর রহমান, সৈয়দ আলী আহ্সান, শামসুল হুদা চৌধুরী, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আমিরুজ্জামান খান, নাজির আহ্মেদ— এদের সবার সম্মিলিত চেষ্টা, উদ্যম আর উৎসাহে নতুন শিল্পীরা এগিয়ে এলেন। মুসলমান শিল্পীদের মধ্যে কলকাতায় যাঁরা গান গাইতেন, শিল্পী হিসেবে জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি ছিল– তাঁদের মধ্যে আব্বাস উদ্দিন, আবদুল হালিম চৌধুরী, আবদুল আহাদ এবং আরও কয়েকজন ফিরে এলেন ঢাকায়। বেতার সংগীতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র বংশধররা ঢাকায় চলে এলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে। জিন্দাবাহার লেনের ৪১ নম্বরের একটি পুরনো বাড়িতে নিয়মিতভাবে ঢাকা বেতারের পুরনো আর নতুন শিল্পীদের আড্ডা, আসর আর গানের মহড়া চলতে থাকল। অল ইন্ডিয়া রেডিও যুগের বাদ্যযন্ত্রী, স্টাফ আর্টিস্ট সাদেক আলী তাঁর আত্মীয় শিষ্য যন্ত্রীদের নিয়ে এলেন এবং অর্কেস্ট্রা তৈরি করতে শুরু করলেন তিনি আর ওস্তাদ খাদেম হোসেন খান মিলে। সংগীত পরিচালক হয়ে এলেন আবদুল আহাদ, আবদুল হালিম চৌধুরী, ইউসুফ খান কোরেশী, লতাফত হোসেন প্রমুখ। পরবর্তীকালে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন কাদের জামেরী, আবদুল লতিফ, সমর দাস এবং ধীর আলী মিয়া।

বেতারের জীবন্ত কিংবদন্তী, বর্ণাঢ্য জীবন ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আশরাফ-উজ-জামান খান কলকাতা বেতারে প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৪০ সালে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ হিসেবে সেখান থেকে তিনিও পরে চলে এলেন ঢাকা বেতারে। প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ঢাকা বেতারে অন্যান্য যারা চাকরি করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবি শামসুর রাহমান, সাদেকুর রহমান, জহিরুদ্দিন, সৈয়দ আলী আহসান, শামসুল হুদা চৌধুরী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সৈয়দ জিল্লুর রহমান, আমিরুজ্জামান খান, নাজমুল আলম প্রমুখ।

সবার উৎসাহ, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ঢাকা বেতারের শূন্যতা পূরণ ছাড়াও যেসব সংগীত শিল্পী প্রতিভা ও সাধনা বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু, মালেকা পারভীন বানু, শামসুননাহার করিম, আফসারী খানম, হোসনা বানু খানম, ফিরোজা বেগম, বেদার উদ্দিন আহ্মেদ, আবদুল লতিফ, আবদুল আলীম, মোহাম্মদ হোসেন খসরু, মুন্সী রইসউদ্দিন, সোহ্রাব হোসেন, শেখ লুৎফর রহমান, ওসমান খান, বারীন মজুমদার,

নিখিল দেব, সুধীন দাস, মোমতাজ আলী খান, সুখেন্দু চক্রবর্তী, আবু বকর খান, খালিদ হোসেন, কাজী শাহজাহান হাফিজ, ফজলে নিজামী, আনোয়ার উদ্দিন খান, মাসুদ আলী খান, মস্তান গামা, গোলাম মোস্তফা, শমসের আলী, সবদর আলী, হাসান আলী খান, মফিজুল ইসলাম, শেখ মোহিতুল হক, ফরিদা ইয়াসমীন, মাহবুবা রহমান, নীলিমা দাস, আঞ্জুমান আরা বেগম, সনজীদা খাতুন, ফেরদৌসী রহমান, রওশান আরা মাসুদ, নূরুন্নাহার, নীরু শামসুন্নাহার, ফৌজিয়া খান প্রমুখ।

রেডিও পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকে কবি রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল ইসলাম ছাড়াও যেসব কবিদের গানের বাণীতে সংগীত বিভাগ সমৃদ্ধ হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জসীম উদ্দীন, শাহাদাত হোসেন, গোলাম মোস্তফা, ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, বেনজির আহমেদ, সায়ীদ সিদ্দিকী, তালিম হোসেন, কাদের নেওয়াজ, রওশন ইজদানী, আজিজুর রহমান, আব্দুল হাই মাশরেকী, শমসের আলী, আল কামাল আব্দুল ওহাব, আবদুল লতিফ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

সংগীত ছাড়াও বেতারের অন্যতম জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল বেতার নাটক। রবীন্দ্রনাথ, তারাশংকর, শরৎচন্দ্র, বুদ্ধদেব বসু, মনোজ বসু, বনফুল এসব বিখ্যাত সাহিত্যিকদের গল্প, উপন্যাস বেতার নাটকে রূপান্তরিত করে প্রচার করা হত। সেকালে একালের মতো রেকর্ডিং ও সম্পাদনার সুযোগ ছিল না। বেতার নাটক তখন স্টুডিও থেকে সরাসরি প্রচারিত হত। পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যিকদের নাটক ছাড়াও ঢাকা বেতার থেকে যাঁদের লেখা নাটক প্রচারিত হত তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নূরুল মোমেন, মোহাম্মদ কাশেম, সিকান্দার আবু জাফর, মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, ফররুখ শিয়র, নাজির আহ্‌মেদ প্রমুখ। নাট্যশিল্পী হিসেবে যাঁরা বেতার নাটকে অভিনয় করতেন তাঁরা হচ্ছেন যোসেফাইন ঘোষ, আমোদ দাস গুপ্ত, বিপুল দত্ত গুপ্ত, বিশ্ব রঞ্জন ভাদুড়ী, সুধীর রায়, ফতেহ লোহানী, নাজির আহ্‌মেদ, নূরুল ইসলাম, রণেন কুশারী, কাজী আবদুল খালেক, মুজিবুর রহমান খান, আমিনুল হক, কাফি খান, আবদুল মতিন, সোনা মিয়া, মোঃ কাশেম, আফজালুর রহমান, ইসলাম আহ্‌মেদ, লতিফা রশিদ, লুলু বিলকিস বানু, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, হুসনে আরা, লিলি চৌধুরী, নাদিরা চৌধুরী, আমেনা খাতুন, ডলি সুরাইয়া ও খুরশেদী আলম। ঢাকা বেতারের প্রথম মুসলিম মহিলা নাট্য শিল্পী হলেন লতিফা রশিদ (১৯৪৫) যিনি পরবর্তী কালে সংগীত শিল্পী লতিফা হিলালী। দ্বিতীয় মুসলিম মহিলা নাট্য শিল্পী লুলু বিলকিস বানু (লায়লা আর্জুমান্দ বানুর বোন)। বেতার নাটক প্রসঙ্গে আশরাফ-উজ-জামান তাঁর পুরনো দিনের কথায় বলেছেন, "দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মানুষের মনে একটা নতুন জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়েছিল। বেশির ভাগ নাটকই তখন রচিত হতো সেই জাতীয়তাবোধ নিয়ে। হাসির নাটক বেশির ভাগই লিখতেন নূরুল মোমেন। ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন মোহাম্মদ কাশেম, সায়ীদ সিদ্দিকী, নাজির আহমেদ। নাজির আহ্‌মেদের "তৈমুর লঙ্গ" নাটক

শ্রোতাদের মধ্যে তখন বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। সিকান্দার আবু জাফর নতুন করে লিখেছিলেন "সিরাজুদ্দৌলা" নাটক। রবীন্দ্রনাথ আর তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকও মাঝে মাঝে অভিনীত হতো। রবীন্দ্রনাথের "যক্ষের ধন"-এ বালকের ভূমিকায় অভিনয় করে নাম করেছিলেন আমেনা খাতুন। তারাশংকরের "দুই পুরুষ" নাটকও সার্থকতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন আমাদের শিল্পীরা।"

ধারাবাহিক 'যারা কাঁদে' নাটকে (১৯৪১ সাল) বাঁ থেকে শুভেন্দুলাল সেন গুপ্ত (পরিচালক), মোহাম্মদ কাশেম (নাট্যকার), ইসলাম আহমেদ, লতিফা রশিদ, মায়া আচার্য, মোহিত মুখার্জী ও প্রযোজক সুধীর সরকার।

নাটক ছাড়াও ঢাকা কেন্দ্র থেকে বহুবছর ধরে প্রতিসপ্তাহে রাত দশটায় "যারা কাঁদে" নামে ধারাবাহিক নাটিকা প্রচারিত হত। বাংলা নাটক ছাড়া উর্দু নাটকও প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৯৪৪ সালের শেষদিকে প্রথম উর্দু নাটক প্রচারিত হয় "চাঁদিকে টুকরে"। নাটকটির রচয়িতা ও প্রযোজক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উর্দু ফার্সি বিভাগের হেড ড. আন্দালিব শাদানী। এতে অংশ নিয়েছিলেন ড. শাদানী, সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর, আনোয়ার উদ্দিন, খাজা মোহাম্মদ আজমল, কায়সারা বেগম এবং লুলু বিলকিস বানু। এর পর থেকে উর্দু নাটক নিয়মিতভাবে প্রচারিত হতে থাকে।

নাজিমুদ্দিন রোডের বেতার ভবন থেকে নাটক প্রযোজনা ও প্রচারের ঝকমারি নিয়ে সে সময়ের (১৯৫১) প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট নাজমুল আলম (বিশিষ্ট নাট্যকার

এবং পরে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক) তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে,

"…. প্রাথমিক অবস্থায় নাজিমুদ্দিন রোডের অপর্যাপ্ত স্টুডিও ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় এফেক্ট (শব্দ সংযোজন) ব্যাকগ্রাউন্ড ও ইন্টারলুড মিউজিক (আবহসঙ্গীত ও বিরতি সঙ্গীত) প্রয়োগের অভাব নাট্য প্রযোজনার প্রধান অন্তরায় ছিল। তখন এখনকার মতো পূর্বাহ্নে নাটক রেকর্ডের (প্রিরেকর্ডিংয়ের) কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। সব নাটকই সজীব (Live) প্রচার করতে হতো। অর্থাৎ স্টুডিও থেকে অভিনয় কালীন সরাসরি প্রচার করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। তাই নাটকের প্রচার কাল, শিল্পীদের তাৎক্ষণিক অভিনয়, সরাসরি সাউন্ড এফেক্ট ও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক প্রয়োগ নিয়ে প্রযোজক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের তটস্থ থাকতে হতো। এখনকার মতো পূর্বাহ্নে সম্পাদনা করে প্রচার কাল নির্ধারণের কোনও প্রশ্নই ছিল না। তাই সজীব প্রচার কালে প্যানেলে বসে প্রযোজককে দারুন মানসিক চাপে ভুগতে হতো। সরাসরি সাউন্ড এফেক্ট প্রয়োগেও অনেক বিপর্যয় ঘটতো। কারণ এখনকার মতো সাউন্ড এফেক্টের কোনও ডিস্ক রেকর্ড বা টেপ রেকর্ড ছিল না। ঝাঁটার বাড়ি মেরে ঝড়ের শব্দ—বালতির/গামলার পানিতে হাত নেড়ে নদী, সমুদ্র, জলোচ্ছ্বাসের শব্দ, দুটো নারকেল ঠুকে ঘোড়ার খুরের শব্দ, হরবোলাকে দিয়ে বা মুখের শব্দ দিয়ে শিয়াল, কুকুর, কাক, মোরগ, পশু পাখির ডাকের শব্দ তৈরি করতে হতো। স্টুডিওতে যন্ত্রীদলের সমাবেশ ঘটিয়ে—ইন্টারলুড মিউজিক বা বিরতি সঙ্গীতের সৃষ্টি করতে হতো। তাতে বিপত্তি ছিল অনেক। যন্ত্রী একবার বাজাতে শুরু করলে আর থামতে চাইতেন না। আবহসংগীত এত জোরে হতো যে অনেক সময় সংলাপের চাইতে বেহালার বা সেতারের সুর শুনেই শ্রোতাদের তৃপ্ত থাকতে হতো। প্রযোজক ও বিশিষ্ট যন্ত্র বাদকের মাঝেও অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝিও সৃষ্টি হতো। একটি ঘটনা বলি। সেটা ১৯৫২ সালের কথা। প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন তখন নাজিমুদ্দিন রোডে অনুষ্ঠান প্রযোজক আর ওস্তাদ খাদেম হোসেন খান তখন রেডিওর নিজস্ব শিল্পী সেতার বাদক। শামসুদ্দীন সাহেব তাঁর একটি নাটকে সেতারের বাজনা দিয়ে বিরতি সঙ্গীত দেবেন ঠিক করলেন। অনুরোধ জানালেন খাদেম হোসেন সাহেবকে। খাদেম হোসেন খান সাহেব স্টুডিওতে অন্যান্য যন্ত্রীর সঙ্গে সেতার হাতে নিয়ে জাঁকিয়ে বসলেন। কিন্তু শামসুদ্দীন সাহেব একটি ভুল করলেন, তিনি ওস্তাদ সাহেবকে আগে থেকেই বললেন না যে একটি নাটকে ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি বিরতি সংগীত দেয়া যায় না, দিলে সেটা নাটক না হয়ে যন্ত্র সঙ্গীতের আসর হয়ে যায়। যথারীতি নাটকের মাঝে শামসুদ্দীন সাহেব ইশারা করতেই খাদেম হোসেন খান সাহেব সেতার বাজাতে শুরু করলেন। প্যানেলে বসে শামসুদ্দীন সাহেব খাদেম হোসেন সাহেবকে ইশারা করতেও তিনি থামেন না—তিন মিনিট পার হয়ে গেলেও খাদেম হোসেন খান সাহেব থামেন না—যন্ত্রসঙ্গীত না থামলে তো অভিনয় শুরু করা যায় না। এক পর্যায়ে শামসুদ্দীন সাহেব উঠে ওস্তাদের

হাত ধরে থামিয়ে দিলেন। নাটক শেষ হলে ওস্তাদজি এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে শামসুদ্দীন সাহেবের সাথে তুমুল ঝগড়া বেধে যায়—সবাই মিলে মধ্যস্থতা করে ঝগড়া থামাতে হয়। ততক্ষণ নাটকের যা ক্ষতি হবার তাতো হয়েই গেছে।

আরেকটি নাটকের কথা, আমারই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। আমার লেখা একটি থ্রিলার নাটক 'খুন' প্রযোজনার সময় এনায়েত মওলা সাহেবের (অনুষ্ঠান ঘোষক-নিজস্ব শিল্পী) উপর দায়িত্ব দেয়া হয় নাটকের প্রধান চরিত্র মুজিবর রহমান খান সাহেবকে (তখন নাট্য প্রযোজক) গুলি করার অর্থাৎ সংলাপ অনুসারে গুলির শব্দ করা। খেলনা পিস্তল হাতে এনায়েত মওলা সাহেব স্টুডিওর ভিতর চরম মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলেন প্রয়োজনীয় নির্দেশের। চরমমুহূর্তে এদিকে খেলনা পিস্তল থেকে শব্দ বের হয়না—আর মুজিবর রহমান খান 'আহ' বলে মরতেও পারেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন মুজিবর রহমান খান 'আহ' বলে মরার সংলাপ আউড়ালেন, তখন পিস্তলের শব্দ হলো। ফলে নাটকের শ্রোতাদের মাঝে এ নিয়ে দারুন বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এর কিছুদিন পর রেগেমেগে এনায়েত মওলা সাহেব সত্যিকার একটা পিস্তল নিয়ে এলেন। পিস্তলের শব্দের ডিস্‌ক রেকর্ডিং করে রাখবেন বলে। তখন খুব সীমিত ব্যবস্থায় কন্ট্রোল রুমে ডিস্‌ক রেকডিং করানো যেত। এনায়েত মওলা তার টেনে স্টুডিওর বাইরে মাইক্রোফোন এনে পিস্তল ছুড়ঁবেন, কন্ট্রোল রুমে সেই শব্দের রেকর্ড হবে। এনায়েত মওলা যখন পিস্তল ছুঁড়লেন তখন পিস্তলের গুলি আর আকাশ মুখে গেল না—এনায়েত মওলার হাতের মধ্যে পিস্তলের গুলি বিস্ফোরিত হলো। তাঁর হাতের পাঁচ আংগুলের মাংস ঝলসে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়লো। সবাই মিলে ধরাধরি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলো।"

এতসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নাটক প্রতি সপ্তাহে প্রচারিত হত। অগণিত শ্রোতা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করত বেতারের নাটক শোনার জন্য। ঢাকা বেতারের নাট্যশিল্পী, নাট্যপরিচালক রণেন কুশারী নিজেই ছিলেন বেতারের একটি নাট্যপ্রতিষ্ঠান—সবার নাট্যগুরু। ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ঢাকা বেতারের নাট্যশিল্পী হিসাবে তাঁর শিল্পী জীবনের শুরু। ১৯৪০ সালে ডিসেম্বরে ঢাকা বেতারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত ও প্রযোজিত 'পূর্বানী' গীতিনক্‌শায় ধারা বর্ণনার জন্যে রণেন কুশারীকে নির্বাচিত করেছিলেন এবং অনুষ্ঠান প্রচার শেষে কবি তাকে কাছে টেনে নিয়ে বুকভরে আশির্বাদ করেছিলেন। সেই ১৯৪০ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত ঢাকা বেতারের সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই প্রধান নাট্যপ্রযোজক রণেন কুশারী অসংখ্য নাটক প্রযোজনা করেছিলেন, অসংখ্য শিল্পী সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর প্রযোজিত কবি জসীম উদ্‌দীনের লেখা "বেদের মেয়ে", "মধুমালা", "সোজনবাদিয়ার ঘাট" বেতার নাটকের এক উজ্জ্বল ইতিহাস। এই সব নাটকের স্মৃতি শ্রোতাদের মনে এখনও অম্লান। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে মুনীর চৌধুরী'র "কবর" নাটক জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকলেও পাকিস্তানি আমলে ঢাকা

বেতার থেকে প্রচার সম্ভব হয়নি। শাহবাগে নতুন বেতার ভবনে নানা ধরনের কারিগরি সুযোগ সুবিধার কারণে সংগীতানুষ্ঠান, বিশেষ করে বেতার নাটকের গুণগতমান বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুনীর চৌধুরী, শওকত ওসমান, নূরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, আশরাফ-উজ-জামান খান, নাজমুল আলম, আতিকুল হক চৌধুরী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উঁচুমানের বেতার নাটক উপহার দিয়েছিলেন শ্রোতাদের। নাজমুল আলম রচিত "সারেং" নাটক ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী এবং উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। প্রযোজনা করেছিলেন আতিকুল হক চৌধুরী। এই নাটকে শহীদ মুনির চৌধুরী বৃদ্ধ সারেং-এর ভূমিকায় কণ্ঠ দেন। আতিকুল হক চৌধুরীর প্রযোজনায় এই নাটকটি এতই সফল হয় যে তখনকার ইংরেজি দৈনিক 'OBSERVER' এর সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক আব্দুস সালাম সাহেব 'A memorable Radio play' নামে উপসম্পাদকীয় লেখেন। এই নাটকের সাউন্ড এফেক্ট,—ঝড়ের মধ্যে লঞ্চডুবির শব্দ সৃষ্টির জন্য আতিকুল হক চৌধুরী সাহেব প্রবীণ অনুষ্ঠান ঘোষক সৈয়দ রশীদুন্নবীর 'পানকৌড়ি' লঞ্চের সাথে অন্য লঞ্চকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে লঞ্চ ডুবির সাউন্ড এফেক্ট সৃষ্টি করেন।

পিটিভি ও বিটিভির বিখ্যাত প্রযোজক, নাট্যকার (পরবর্তীকালে বিটিভির উপমহাপরিচালক) আতিকুল হক চৌধুরী ষাটের দশকের শুরুতে ঢাকা বেতারের একজন কুশলী অনুষ্ঠান প্রযোজক ছিলেন। বেতার নাটক ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। নাট্য নির্মাণে, সংলাপ ব্যবহারে, শব্দ ও আবহ সংগীত প্রয়োগে আতিকুল হক চৌধুরীর চিন্তা-ভাবনা কলাকৌশল ছিল অন্যরকম। বলা যায় বেতার নাটকে তিনি একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। আধুনিকতা, বাস্তবতা ও সুরুচির ছোয়া পাওয়া যেত তাঁর প্রযোজিত সব নাটকেই। ষাটের দশকে ঢাকা বেতার থেকে বিভিন্ন নাট্যকার, কবি, সাহিত্যিকদের যতগুলি সাড়া জাগানো নাটক, উচুঁমানের নাটক প্রচারিত হয়েছে তার অধিকাংশ নাট্যরূপ ও প্রযোজনা ছিল আতিকুল হক চৌধুরীর। সারেং ছাড়াও, সূর্যদীঘল বাড়ী, শেষের কবিতা, দেবদাস, পথের দাবী, শ্রীকান্ত, প্রান্তরের পারে, মন ও মানুষ, রাভী থেকে রূপসা, ঢাকার আকাশে অনেক রাত, অরণ্য নিলীমা, তারার দেশে, মেক-আপ, অসমাপ্ত, শান্তি নীড়, রঙ মঞ্চের নায়িকা, নীড় ভাঙা ঝড়, ঝড় যখন উঠলো, এমনি অজস্র নাটক প্রচারিত হয়েছে আতিকুল হক চৌধুরী নাট্যরূপায়নে ও কুশলী প্রযোজনায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় নাজমুল আলমের লেখা নাটক 'আগুন'-এর জন্য সৈয়দ রশীদুন্নবী প্রায় এক মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার প্লেনের শব্দের ও 'বম্বিং' এর সাউন্ড এফেক্ট জোগাড় করেন এবং বিশেষ 'মিক্সিং' পদ্ধতিতে পার্ল হারবার বন্দরে জাপানি বোমা বর্ষণের শব্দ সংযোজন করেন। 'আগুন' ছাড়াও নাজমুল আলমের 'ফুলমতি, নায়ক, একটি অচল আনি, সুঅভিনীত ও সুপ্রযোজিত নাটকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পঞ্চাশ দশকে রেডিও পাকিস্তানের কোনও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার ছিল না। সে কারণে পাকিস্তানের সব স্টেশন থেকেই আলাদাভাবে খবর প্রচার করা হত। ঢাকা থেকে তখন বাংলা খবর পড়তেন ফতেহ লোহানী, মুজিবর রহমান খান, নূরুল ইসলাম প্রমুখ। পরবর্তীতে করাচিতে শক্তিশালী শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার স্থাপন করা হলে ঢাকার বার্তা বিভাগকে করাচি নিয়ে যাওয়া হয় এবং করাচি থেকে রীলের মাধ্যমে ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু ভাষায় ন্যাশনাল নিউজ বুলেটিন বা জাতীয় সংবাদ প্রচার শুরু করা হয়। করাচি থেকে বাংলা পাঠকরূপে ফতেহ লোহানী, মুজিবর রহমান খান, নূরুল ইসলাম সুপরিচিতি লাভ করেছিলেন।

মৌলিক গণতন্ত্র ও উন্নয়নের দশক

সামরিক আইন জারি করে, শাসনতন্ত্র বাতিল করে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবরে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তবে এ সত্য তিনি জানতেন যে, সামরিক আইনের দ্বারা একটি সিভিল রাষ্ট্র দীর্ঘকাল শাসন করা যায় না। তাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর অবস্থান ও ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী ও সুসংহত করার লক্ষ্যে মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক অদ্ভুত রাজনৈতিক দর্শন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। এই ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের জন্য দেশের উভয় অংশ থেকে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন করা হয়েছিল এবং এই সকল অনুগত অনুগৃহীত মৌলিক গণতন্ত্রীরা আইয়ুব খানকে প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর দল মুসলিম লীগকে প্রাদেশিক পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পরিষদে জয়যুক্ত করেছিল। সবক'টি গণমাধ্যমে, বেতারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আইয়ুব খানের রাষ্ট্রনীতি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা, প্রশাসনিক সাফল্য, উন্নয়ন ও সংস্কার কর্মসূচি সম্পর্কে প্রতিদিন ব্যাপক প্রচার চালানো হত।

মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনোভাব ছিল নেতিবাচক, অবিশ্বাস ছিল প্রবল। বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার সমালোচনা করতেন। এই সমস্ত সমালোচনা মোকাবিলা এবং মৌলিক গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস আনয়নের জন্য সরকারি নির্দেশক্রমে সবক'টি বেতার কেন্দ্র থেকে গ্রাম বাংলার শ্রোতাদের অনুষ্ঠান "বুনিয়াদী গণতন্ত্রের আসর" চালু করা হয়েছিল। দৈনিক ইত্তেফাকের সাংবাদিক আসফদ্দৌলার (মরহুম) পরিচালনার গুণে সেই "বুনিয়াদী গণতন্ত্রের আসর" এবং সেই সঙ্গে আসফ ভাই, নেজামতউল্লাহ, নসু ভাই, মজিদের মা অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন।

জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের পর ষাট দশকের শুরুতেই সরকারের নীতি ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে বেতারের বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করা হয়েছিল। পরিকল্পিতভাবে ছ'টি স্টুডিও বিশিষ্ট নতুন বেতার ভবন তৈরি করা হয়েছিল ঢাকার শাহবাগে। নাজিম উদ্দিন রোডের বাড়ি ছেড়ে এই বেতার ভবন

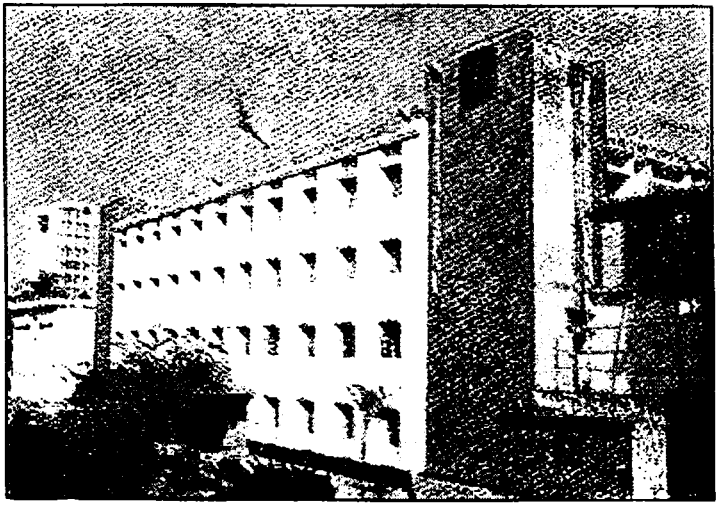

শাহবাগ বেতার ভবন

থেকে নতুন উদ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়েছিল ১৯৬০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে। প্রথমে এর সঙ্গে যুক্ত ছিল পাঁচ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার এবং ৭.৫ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার। ১৯৫৯ সালে কল্যাণপুরে ১০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন আর একটি শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার স্থান করা হয়েছিল। ১৯৬৩ সালের ১৩ মে থেকে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ১০০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গের ট্রান্সমিটার এবং ১৯৬৮ সালে ঢাকার সাভারে ১০০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন ক্ষুদ্র তরঙ্গের ট্রান্সমিটার। এই ট্রান্সমিটার বসানোর ফলে বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা থেকে ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান শোনা যেত। প্রতিদিন সকাল থেকে তিনটি অধিবেশনে অনুষ্ঠান প্রচার করা হত এবং অনুষ্ঠান প্রচারের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ট্রান্সমিটারের অভাব কিছুটা পূরণ হওয়ায় মিডিয়াম ওয়েভে "ক" এবং "খ" দু'টি চ্যানেলে অনুষ্ঠান প্রচার করা হত।

ঢাকা ছাড়াও ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে দু'টি ১০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার স্থাপন করে স্থানীয় অনুষ্ঠান প্রচার এবং পরে পূর্ণাঙ্গ বেতার ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল। সিলেট কেন্দ্র ১৯৬১ সাল থেকে দুই কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ঢাকার অনুষ্ঠান রীলে করত। ১৯৬৭ সাল থেকে সিলেট ও রংপুর কেন্দ্রে স্থাপিত হয়েছিল দু'টি ১০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার। ঢাকার অনুষ্ঠান রীলে ছাড়াও এই দু'টি কেন্দ্র নিজস্ব অনুষ্ঠান প্রচার করত।

খুলনা'র গল্লামারী'তে স্থাপন করা হয়েছিল একটি ১০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গের ট্রান্সমিটার। এই কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয় ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর থেকে। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশকে বেতার অনুষ্ঠান প্রচার পরিধির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছিল।

গণমাধ্যম হিসাবে তৎকালীন বেতারের ভূমিকা

শিল্পী প্রতিভার সমাদরে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা সহ অন্যান্য আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্রে যথেষ্ট অবদান থাকলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সরকার নিয়ন্ত্রিত এই গণমাধ্যমটি কখনওই গণমানুষের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ধারক-বাহক হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। দেশবিভাগের পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সব বেতার কেন্দ্রগুলো ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং বেতার অনুষ্ঠান প্রচারের নীতি নির্ধারণে একক কর্তৃত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি বা অবাঙালি কর্মকর্তাদের। সুতরাং বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান পর্যন্ত সকল স্বাধিকার সংগ্রামে ঢাকা সহ সকল আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্রকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। বেতারে অনেক সুযোগ্য প্রতিভাবান কর্মকর্তা বিভিন্ন সময়ে এসেছেন, চলে গেছেন। জীবন-ঘনিষ্ঠ, শিল্প-সমৃদ্ধ, জনপ্রিয় অনেক অনুষ্ঠান তাঁরা উপহার দিয়েছেন। কিন্তু কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি কোনও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নেয়া অথবা বাঙালি জাতীয়তাবাদের চিন্তা-চেতনাকে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিফলিত করা। তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, বেতারের শিল্পীরা রাজপথে সব সময়েই চলমান আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছেন, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে শরীক হয়েছেন।

সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসেবে যাঁরা বেতারে চাকরি করেছেন, অনুষ্ঠান প্রযোজনা করেছেন তাঁদেরকে সব সময়েই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নানা রকম বিধি-নিষেধের মধ্যে কাজ করতে হত। নানা প্রক্রিয়ায় তাদের মগজ স্নান ও বুদ্ধি শোধনের ব্যবস্থা করা হত। বলা হত, আমাদের পূর্ব বাংলা বলে কিছু নেই, আমাদের আছে একটি মাত্র দেশ পাকিস্তান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে হাজার মাইলের ভৌগোলিক ব্যবধান থাকলেও তা তুচ্ছ, কারণ আমাদের হৃদয় একটি। পূর্ব ও পশ্চিম হচ্ছে একটি পাখির দু'টি ডানা অথবা একটি কুঁড়ি, দু'টি পাতা। আমাদের বাঙালি, বেলুচ, সিন্ধি, পাঠান, পাঞ্জাবি পরিচয় বড় নয়। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ভিন্ন হলেও আমাদের ধর্ম ইসলাম, আমাদের কালচার ইসলামিক কালচার। আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা পাকিস্তানি, সবাই ভাই ভাই। এসব প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের মটিভেশন। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পশ্চিমারা ভয় পেত। তাই বাঙালিদের সাচ্চা পাকিস্তানি তৈরি করার প্রয়াসে জাতীয় সংহতির নামে প্রলোভনের রঙিন মোড়কে নানা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করা হত।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক, সামরিক জান্তা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের অখন্ডতা, জাতীয় সংহতির জিগির তুলে পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সব রকমের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে সব সময়েই ভারতীয় অথবা কম্যুনিস্ট চক্রান্ত আবিষ্কার করত এবং বেতারকে এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক ও পাকিস্তান প্রেমে উজ্জীবিত করার মহান দায়িত্ব (!) পালন করতে হত। বেতারের অনুষ্ঠান নির্মাতা হিসেবে সে দায়িত্ব আমরা পালন করতাম কওমী গানের মধ্য দিয়ে, নাটকের মধ্য দিয়ে, পাকিস্তান প্রিয় প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা, কথিকার মধ্য দিয়ে। ভাষা আন্দোলনের পর শাসকবৃন্দ ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল বটে কিন্তু বাংলা ভাষার প্রচলন কোথাও ছিল না। ইংরেজি ছিল আমাদের অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ এবং চাকরি পাওয়া বা পদোন্নতির ব্যাপারে উর্দু জানা আমাদের জন্য অপরিহার্য ছিল। বেতারের পান্ডুলিপিতে পূর্ব বাংলা এবং পূর্ব বঙ্গ শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। স্বাগতম্ শব্দের পরিবর্তে বলা হত খোশ আমদেদ বা আহলান সাহলান। কওমের খিদমত ও তরক্কী'র জন্য কওম, উজিরে আজম, সদরে রিয়াসত, হুকুম আহকাম, তাহজীব তমুদ্দুন এমনই বহু পরিচিত অপরিচিত আরবি, উর্দু শব্দ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেতারের পান্ডুলিপিতে ব্যবহার করতে হত। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানিরা মনে করত বাংলা ভাষা হিন্দুদের ভাষা এবং এটি মুসলমানদের জবান নয়। তাই বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে হিন্দু প্রভাবমুক্ত করার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে বাংলা, উর্দু, আরবি মিশিয়ে একটি পাকিস্তানি খিচুড়ি ভাষা চালু করার প্রয়াসেই এসব করা হত। পাকিস্তানপ্রেমী, উর্দুপ্রেমী, তাহজীব তমদ্দুন মার্কা কিছু বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের এসব বিষয়ে প্রচন্ড উৎসাহ ছিল। ইকবাল ছিলেন পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং জাতীয় কবি। কায়েদে আজম জিন্নাহ'র মতো বেতারে ইকবালের জন্ম ও মৃত্যু দিবস সাড়ম্বরে পালিত হত, উর্দু ও বাংলায় নানা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করা হত। নজরুল ইসলাম ছিলেন মুসলমান কবি। তিনি খন্ডিত এবং সংশোধিত হয়ে প্রচারিত হতেন। তাঁর লেখা ইসলামী গান, প্রেমের গান প্রচার করা হত। কিন্তু বিদ্রোহের গান, দেবদেবী আছে এমন কোনও কবিতা বা গান প্রচার করা যেত না। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু কবি, ইন্ডিয়া'র কবি। তাঁর গানে কওমি জোশ নেই, জেহাদ নেই। আছে ঈশ্বর, দেবদেবীর আরাধনা ও নিরুত্তাপ প্রশান্তি। অতএব, তিনি নিষিদ্ধ হলেন পাকিস্তান বেতারে। পূর্ব পাকিস্তানের এক প্রভাবশালী গভর্ণর কবিদের উপদেশ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতো গান লিখতে। এই সব অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্ত ও উপদেশের বিরুদ্ধে শিল্পী, সাহিত্যিকরা তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। প্রতিবাদ জনরোষে পরিণত হতে পারে এই ভয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সরকারি সিদ্ধান্ত কিছুটা শিথিল হল। প্রকৃতি ও প্রেমের কিছু গানের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনওক্রমে বেঁচে রইলেন বেতারের শ্রোতাদের হৃদয়ে।

রেডিও পাকিস্তান থেকে "ভারত" উচ্চারণ করা হত না, বলা হত হিন্দুস্থান। রেডিও পাকিস্তানের সব অনুষ্ঠানের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল হিন্দুস্থানের সরকার,

হিন্দুস্থানের সাম্প্রদায়িকতা এবং হিন্দুস্থান অধিকৃত কাশ্মির। ঢাকা বেতার থেকে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে বেশ কিছু কথিকা, জীবন্তিকা নিয়মিতভাবে প্রচার করা হত। এগুলোর মধ্যে ইসরাফিল, হিং টিং ছট অনুষ্ঠান শ্রোতারা বেশ উপভোগ করত।

পঁয়ষট্টি সালের সেপ্টেম্বরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বেতার কেন্দ্র (এই তিনটি ছিল তখন পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র) রণ উন্মাদনা তৈরিতে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের রণাঙ্গনে সতের দিন ধরে যুদ্ধ চলেছিল। যুদ্ধ চলাকালে জনগণের মনোবল অটুট রাখতে এবং দেশপ্রেমে তাদেরকে উজ্জীবিত করতে বেতারের সব ক'টি কেন্দ্র থেকে সারাক্ষণ ইসলামী জোশ আর জেহাদের গান, উদ্দীপনামূলক কবিতা, নাটক, জীবন্তিকা, কথিকা প্রচার করা হত। শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, কথক সবাই কোনও সম্মানী ছাড়াই স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে বেতারের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। সংবাদের চরিত্র গিয়েছিল পাল্টে। সংবাদ পাঠকেরা জেহাদি জোশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং পাকিস্তানি বাহিনীর জয়গাথা ও বিরাট সাফল্যের (!) খবর পাঠ করতেন। তবে এ কথা সত্য যে, পাকিস্তানের লাহোর ফ্রন্টে বাঙালি সৈন্যদের দুঃসাহসিক বীরত্ব ও অকুতোভয় আত্মাহূতির কারণে লাহোরের পতন ঠেকানো সম্ভব হয়েছিল। চট্টগ্রাম বেতার থেকে বেতারের নিজস্ব শিল্পী বেলাল মোহাম্মদ প্রতি রাত ৮.৪০ মিনিটে যুদ্ধের খবর তাৎক্ষণিকভাবে ছন্দোবদ্ধ পুঁথি পাঠের আকারে প্রচার করে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শুরুতে বলতেন– "আহা আল্লাহ নবী মনে ভাবি করহ মদদ। এখন খবর বলি বেলাল মোহাম্মদ।" পঁয়ষট্টির যুদ্ধে বেলাল মোহাম্মদ ব্যাপক পরিচিতি ও জনপ্রীতি পেয়েছিলেন পুঁথি পাঠক হিসেবে। একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চে এই বেলাল মোহাম্মদ ও তাঁর সহযোগী বন্ধুরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ করলেন অন্য একটি ইতিহাস। চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম উদ্যোক্তা ও সংগঠক হিসেবে তাঁরা এখন ঐতিহাসিক চরিত্রে পরিণত।

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত ছয় দফা নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং তার অনুগত গভর্নর মোনায়েম খান প্রতিটি আন্দোলনকে নির্যাতনের মাধ্যমে কঠোরভাবে দমনের চেষ্টা করেন। ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় শেখ মুজিবকে বার বার কারারুদ্ধ করা হয় এবং পরে চাঞ্চল্যকর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করে তাঁর বিচার শুরু করা হয়। আইয়ুব খানের দমননীতি ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্ররা ব্যাপক সংগ্রাম গড়ে তোলে। এই সংগ্রাম গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলে সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে এবং শেখ মুজিব সহ অভিযুক্ত অন্যান্য আসামী মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। উনসত্তুরের এই গণঅভ্যুত্থানে বাইরের উত্তপ্ত আলো, হাওয়া ঢাকা বেতারেও কিছুটা প্রবেশের সুযোগ পায়।

সংবাদের ওপর আরোপিত বিধি নিষেধ কিছুটা শিথিল হয় এবং অনুষ্ঠানসমূহে ব্যক্তি প্রচারণার পরিবর্তে আধুনিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার কিছুটা প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। চিরাচরিত ও নিয়ন্ত্রিত প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে গণমানুষের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠান নির্মাণের এই স্বাধীনতা বেতারের কর্মীরা বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি। আইয়ুব খানের পদত্যাগের দাবিতে সমগ্র দেশব্যাপী ছাত্র বিক্ষোভের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং প্রশাসনিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। এই অবস্থার মধ্যে আইয়ুব খান দেশের শাসনভার জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে তুলে দিয়ে পদত্যাগ করেন এবং ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করেন। ফলে বেতারের অনুষ্ঠান ও সংবাদ পুনরায় সামরিক আইনের বিধি-নিষেধের শেকলে বাঁধা পড়ে যায়।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরে পূর্ব বাঙলার সমগ্র দক্ষিণ উপকূল জুড়ে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়। কিন্তু ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার দুর্গত মানুষের ত্রাণ কার্যে নিদারুন অবহেলা প্রদর্শন করে। বিক্ষুব্ধ বাঙালি জাতি এই অবহেলার জবাব দেয় ১৯৭০ সালে ৭ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে । রেডিও পাকিস্তানের সকল কেন্দ্র এই প্রথমবারের মতো ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী বিরতিহীন অধিবেশনে নির্বাচনী ফল প্রচারের ব্যবস্থা নেয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের গোপন ষড়যন্ত্র ও নানা বিধি বিধান সত্ত্বেও নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০ আসনের মধ্যে ৩০৫টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভ পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী ও সামরিক শাসক গোষ্ঠীকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

মার্চ '৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো চক্রান্ত শুরু করেন বঙ্গবন্ধু'কে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা না দেওয়ার জন্য। পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক আসন লাভ করেছিল পিপলস পার্টি। সে প্রেক্ষিতে পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ভিন্ন দাবি তোলেন। তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়ে দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। বঙ্গবন্ধু এই দাবির তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানান। কিন্তু এই আহবানের প্রতি কর্ণপাত না করে ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা কার্যকর করতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৯৭১ সালের ১ মার্চে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত করার ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং একাত্তরের ২ মার্চ থেকে দেশব্যাপী হরতাল ও

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। সর্বস্তরের সকল সরকারি ও বেসরকারি বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে অনুরূপ একাত্মতা ঘোষণা করেন ঢাকা বেতার সহ সকল আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্রের বাঙালি কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ। মার্চ ৪ থেকেই কেন্দ্রসমূহ রেডিও পাকিস্তানের পরিবর্তে স্থানিক পরিচয়ে যেমন ঢাকা বেতার কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র, রাজশাহী বেতার কেন্দ্র, খুলনা বেতার কেন্দ্র পরিচিতিতে গণ-উদ্দীপনামূলক অনুষ্ঠান, জনজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জনগণের প্রতি বঙ্গবন্ধু'র আদেশ নির্দেশসহ আন্দোলন সংক্রান্ত সকল সংবাদ গুরুত্ব সহকারে প্রচার শুরু করে। ওই সময়ে বেতারের সকল নথিপত্রে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ভাষার ব্যবহারও শুরু করা হয়। অসহযোগ আন্দোলন পূর্বে স্বাধিকার আন্দোলনে উদ্দীপ্ত করেছিল এমন একটি বিশেষ বেতার অনুষ্ঠানের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। মার্চ ২ এর আগে কোনও বেতার কেন্দ্রই পাকিস্তানি ভাবধারার অনুষ্ঠান ছাড়া বাঙালি জাতীয়তাবাদ বা স্বাধিকার সংগ্রাম বিষয়ক কোনও অনুষ্ঠান প্রচারের সাহস পায়নি। সুযোগ পায়নি পূর্ব পাকিস্তানকে সোনার বাংলা বলবার। সামরিক শাসক নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে একাত্তর এর ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদ দিবস উদযাপন উপলক্ষে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" এই শিরোনামে একটি বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছিল যা ছিল সেই রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে শৃঙ্খলমুক্ত হবার জন্যে উদ্দীপ্তময় আহ্বান এবং সেই সঙ্গে ঢাকা বেতারের কর্মীদের একটি দুঃসাহসী পদক্ষেপ। এই সংগীতানুষ্ঠানটির পাণ্ডুলিপি ও গানের কথা লিখেছিলেন কবি সিকান্দার আবু জাফর এবং কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। সুরারোপ ও সংগীত পরিচালনা করেছিলেন আব্দুল আহাদ।

অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে ৭ মার্চে রেসকোর্সের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

বঙ্গবন্ধু'র ৭ মার্চের ভাষণ ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে সরাসরি প্রচার করার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা কার্যকর করা যায়নি। সামরিক কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু'র বক্তৃতা সরাসরি প্রচার না করার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল এবং তাদের নির্দেশে রেসকোর্স থেকে বেতার ভবনের সংযোগ কেটে দেয়া হয়েছিল। ঢাকা বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক আশরাফ-উজ-জামান ছিলেন বক্তৃতা মঞ্চে বঙ্গবন্ধু'র কাছে। স্টুডিও থেকে হট লাইনে সামরিক নির্দেশটি তাঁকে পড়ে শোনালে তিনি বঙ্গবন্ধুর কানে-কানে বলে দিয়েছিলেন ওই নিষেধাজ্ঞার কথা। তখন বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন, "মনে রাখবেন কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও ষ্টেশনে যাবেনা। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না।" রেসকোর্স ময়দানে ঢাকা বেতারের ওবি টিম নিয়োজিত ছিল। তারা টেপরেকর্ডারে বঙ্গবন্ধু'র ভাষণটি রেকর্ড করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু'র ৭ মার্চের ভাষণ প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ওইদিন বিকেলে আশরাফ-উজ-জামানের নেতৃত্বে বেতারের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী বেতার ভবন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। দুপুর ৩-২০ থেকে অনুষ্ঠান প্রচার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যে ৭টায় শাহবাগের বেতার ভবন প্রাঙ্গনে একটি হাত বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। এ ধরনের ঘটনা ছিল বেতারের ইতিহাসে প্রথম। পশ্চিম পাকিস্তানে এবং সামরিক শাসকদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মারাত্মক। সবার ধারণা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

বঙ্গবন্ধু'র রেকর্ডকৃত ভাষণ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হবে এই শর্তে সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বেতার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতায় উপনীত হলে পরদিন সকালে পুনরায় ঢাকা বেতার কেন্দ্র চালু করা হয়েছিল এবং সকাল ৮-৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু'র ওই রেকর্ডকৃত ভাষণ প্রচার করা হয়েছিল।

চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

ক্ষমতালুব্ধ পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সামরিক জান্তার পক্ষে কখনওই সম্ভব ছিল না পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় পূর্ব বাংলার প্রাধান্য মেনে নেয়া। তাই বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার প্রয়াসে পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতে হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা ঘুমন্ত নগরবাসী, নিরীহ ছাত্র-জনতার ওপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালিয়ে ঢাকাসহ বাংলাদেশের সর্বত্র হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা করে। মধ্য রাতেই তারা বঙ্গবন্ধু'কে গ্রেফতার করে এবং ঢাকা বেতার কেন্দ্র দখল করে নেয়। ২৬ মার্চ তারিখে সকালে হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যকবলিত ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে সামরিক নির্দেশ প্রচার শুরু হওয়া মাত্রই চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কর্তব্যরত কর্মীরা সম্প্রচার বন্ধ করে দেন। তখন থেকেই স্বাধীনতার চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ কিছু বেতার-কর্মী, শিল্পী ও রাজনৈতিক কর্মী বিক্ষিপ্তভাবে চেষ্টা করতে থাকেন কীভাবে জনগণকে চট্টগ্রাম বেতারের মাধ্যমে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সংগঠিত করা যায়।

২৫ মার্চের মধ্য রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং ইপিআর-এর একজন অয়ারলেস অপারেটর তৎক্ষণাৎ ওই ঘোষণা পত্র প্রেরণ করেছিলেন বিভিন্ন স্থানে। বঙ্গবন্ধু'র এই ঘোষণাপত্র সাইক্লোস্টাইল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। হ্যান্ডবিলটির শিরোনাম ছিল "জরুরি ঘোষণা" নিচে "স্বাক্ষর শেখ মুজিবুর রহমান"। বক্তব্য ছিলঃ "অদ্য রাত ১২টায় বর্বর পাক-বাহিনী ঢাকার পিলখানা এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অতর্কিতে হামলা চালায়। লক্ষ লক্ষ বাঙালি শহীদ হয়েছেন। যুদ্ধ চলছে। আমি এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং সমস্ত বিশ্বের স্বাধীনতাকামী দেশসমূহের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করছি। জয় বাংলা।" এই ঘোষণা পত্র প্রচারের জন্যে চট্টগ্রাম বেতারের নিজস্ব শিল্পী বেলাল মোহাম্মদ, ফটিকছড়ি কলেজের ভাইস

প্রিন্সিপাল ও সাংবাদিক আবুল কাশেম সন্দ্বীপ এবং চট্টগ্রাম বেতারের অনুষ্ঠান প্রযোজক আবদুল্লাহ আল ফারুক চেষ্টা করেছিলেন কীভাবে চট্টগ্রাম বেতার চালু করা যায় এবং বেতার প্রকৌশলীদের সাহায্য সমর্থন পাওয়া যায়। এরই মধ্যে চট্টগ্রামের তৎকালীন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এ. হান্নান তাঁর একক প্রচেষ্টায় ২৬ মার্চ দুপুরে আগ্রাবাদ বেতার ভবন থেকে পাঁচ মিনিটের একটি অনির্ধারিত অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু'র স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচার করেন। ২৬ মার্চে বঙ্গবন্ধু'র নামে চট্টগ্রাম বেতার থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রচারপত্র প্রচারের একক এবং প্রথম কৃতিত্ব জনাব হান্নানের। এর পর বেতারের নিরাপত্তা ও হানাদার বাহিনীর আক্রমণের আশংকায় আগ্রাবাদ বেতার ভবন থেকে অনুষ্ঠান প্রচারের অনুমতি এবং সুযোগ না পেয়ে বেতারের তৎকালীন সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক সৈয়দ আবদুল কাহহারের পরামর্শে বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ ও আবদুল্লাহ আল ফারুক সন্ধ্যায় চলে যান কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনে। বেলাল মোহাম্মদ তাৎক্ষণিকভাবে লিখেছিলেন "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র"। আবুল কাশেম সন্দ্বীপের অনুরোধে যোগ করেছিলেন "বিপ্লবী" কথাটি।

বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ ও আবদুল্লাহ আল ফারুকের বহু অনুরোধ-উপরোধে ট্রান্সমিটার চালু করেছিলেন প্রকৌশলী মোসলেম খান ও দিলওয়ার হোসেন। অনুষ্ঠান প্রচারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকৌশলীয় সহযোগিতা দিয়েছিলেন মেকানিক সৈয়দ আবদুস শুকুর। ২৬ মার্চের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে সন্ধ্যা ৭-৪০ মিনিটে আবুল কাশেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে প্রথমবারের মতো প্রচারিত হয়েছিল "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি।" নাম ঘোষণার পরে আবদুল্লাহ আল-ফারুক এবং স্বেচ্ছায় আগত ঘোষক চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র সুলতানুল আলম অনুষ্ঠান ঘোষণায় অংশ নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু'র স্বাধীনতা ঘোষণার হ্যান্ডবিলটি বারবার প্রচার করা হয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য চট্টগ্রামের প্রবীণ কবি আবদুস সালাম তাঁর নিজের লেখা একটি জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রচার করেছিলেন স্বকণ্ঠে। অধিবেশন চলাকালে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব হান্নান পুনরায় কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু'র স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পুনরায় প্রচার করেছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সাংগঠনিক তৎপরতা হিসেবে ২৬ মার্চে এই সূচনা অধিবেশনটি স্থায়ী হয়েছিল আধঘণ্টা। দশ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন ট্রান্সমিটারের অনুষ্ঠান সাধারণত পঞ্চাশ বর্গ মাইলের বাইরে শোনার কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে দেশের বহু এলাকা থেকে এই অনুষ্ঠান শোনা গিয়েছিল এবং সেই চরম সংকটের মুহূর্তে এই অনুষ্ঠান মৃতপ্রায় বাঙালি জাতির দেহে সঞ্চার করেছিল সাহসের এক নতুন সঞ্জীবনী ধারা।

বেলাল মোহাম্মদ এবং তাঁর সহযোগীরা অনুষ্ঠান প্রচার শেষ করে চলে যাওয়ার পর মাহমুদ হোসেন নামে বেলাল মোহাম্মদের জনৈক বন্ধু কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে

গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। বেতারের দু'জন প্রকৌশলীকে তিনি পিস্তলের মুখে বাধ্য করেছিলেন পুনরায় ট্রান্সমিটার চালু করতে। ইংরেজিতে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে 'হ্যালো ম্যানকাইন্ড' বলে বঙ্গবন্ধু'র পক্ষে স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চট্টগ্রাম বেতারের নিজস্ব শিল্পী টেপলাইব্রেরিয়ান রঙ্গলাল দেব চৌধুরী, আগ্রাবাদ হোটেলের সহকারী ম্যানেজার ফারুক চৌধুরী এবং ঘোষক কবির। এই মাহমুদ হোসেন এবং ফারুক চৌধুরী পরে সীমান্ত অতিক্রমকালে নিহত হয়েছিলেন আততায়ীর হাতে।

পরদিন ২৭ মার্চ। সবাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন কালুরঘাট ট্রান্সমিটারের নিরাপত্তা নিয়ে। যে কোনও মুহূর্তে পাকিস্তানি সৈন্যরা আক্রমণ চালাতে পারে। ট্রান্সমিটার পাহারা এবং আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তখন প্রয়োজন বাঙালি সৈন্যদের সাহায্য-সহযোগিতা। খবর পাওয়া গেল, পটিয়া'তে একজন বাঙালি মেজর আছেন কিছু বাঙালি সৈন্য নিয়ে। এখানে উল্লেখ্য যে চট্টগ্রামের ষোল শহরে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রে তাঁরা টেলিফোনে জানতে পারেন যে ঢাকায় পাক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং নির্বিচার হত্যাকান্ড শুরু হয়েছে। ঐ সময়ে মেজর জিয়াউর রহমান এবং মেজর শওকত আলীকে ষোল শহরের ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রধান কার্যালয় থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে মেজর জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশক্রমে বন্দরে যাওয়ার পথেই আগ্রাবাদে মেজর জিয়া এই নির্দেশ অমান্য এবং বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এবং মেজর শওকত তৎক্ষনাৎ রেজিমেন্টের অবাঙালি অফিসার ও সৈন্যদের আত্মসমর্পনে বাধ্য ও গ্রেফতার করেন। তাঁরা উভয়ে ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়াটারে ফিরে ব্যাটেলিয়ানের সব বাঙালি অফিসার ও জোয়ানদের একজায়গায় একত্র করে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দেন। এরপর ভোরে তাঁরা অনুগত সৈন্যদের নিয়ে পটিয়ার পাহাড়ে চলে যান এবং সেখানে প্রতিরোধ ঘাটি গড়ে তোলেন। এ প্রসঙ্গে বেলাল মোহাম্মদ তাঁর "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কালুরঘাট ট্রান্সমিটার পাহারা এবং হানাদার বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যে তিনি তাঁর বন্ধু মাহমুদ হোসেন'কে সঙ্গে নিয়ে সেই মেজরের সন্ধানে গেলেন পটিয়া'তে এবং সেখানেই দেখা হল মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে। বেলাল মোহাম্মদের অনুরোধে মেজর জিয়া তাঁর অনুগত সৈন্যদের নিয়ে সেইদিনই পটিয়া থেকে কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে এসে উপস্থিত হলেন এবং পরিখা খুঁড়ে ট্রান্সমিটারের চারদিকে প্রহরা বসালেন। সন্ধ্যায় ট্রান্সমিটারের অফিস কক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান, বেলাল মোহাম্মদ এবং ক্যাপ্টেন অলি আহমেদ। একটু পরেই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুরু করতে হবে। মেজর জিয়াউর রহমান'কে বেলাল মোহাম্মদ বলেন, "আচ্ছা মেজর সাহেব, আমরা তো সব মাইনর। আপনি মেজর হিসেবে স্বকণ্ঠে কিছু প্রচার করলে কেমন হয়?" বেলাল

মোহাম্মদ হালকাভাবে কথাটি বললেও জিয়াউর রহমান গুরুত্ব সহকারে প্রস্তাবটা নিয়েছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বলেছিলেন "হ্যাঁ কিন্তু কি করা যায় বলুন তো?"

বেলাল মোহাম্মদ এক পাতা কাগজ এগিয়ে দিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান প্রথমে লিখেছিলেন, "I Major Zia do hereby declare independence of Bangladesh". বেলাল মোহাম্মদ তখন বললেন, দেখুন বঙ্গবন্ধু'র পক্ষ থেকে বলবেন কি? জিয়াউর রহমান সম্মতি প্রকাশ করে নিজের নামের পরেই লিখেছিলেন—"On behalf of our Great National Leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman....." জিয়াউর রহমান ঘোষণাপত্র লিখেছিলেন ইংরেজিতে। সে সময়ে বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের বাংলার অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ। তাঁর সহায়তায় ঘোষণা পত্রটি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছিল। ঘোষণার মর্মবাণী ছিল, মেজর জিয়া মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশের সর্বত্র দখলদার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে দমন করতে আমাদের একদিন বা দু'দিনের বেশি সময় লাগবে না। এখন দেশ-বিদেশের কাছ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র সাহায্য আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। প্রভৃতি।

২৭ মার্চের সান্ধ্য অধিবেশনে মেজর জিয়াউর রহমানের স্বকণ্ঠ ঘোষণার পর অনুবাদটি অন্যদের কণ্ঠে বারবার প্রচার করা হয়েছিল। আবুল কাশেম সন্দ্বীপ সংবাদ বুলেটিন প্রচার করেছিলেন। ওইদিন ট্রান্সমিটারে প্রকৌশলীয় সহায়তায় ছিলেন চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আমিনুর রহমান এবং মেকানিক সৈয়দ আবদুস শুকুর।

২৮ মার্চ তারিখে "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে"র অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল সকাল ন'টায়। জিয়াউর রহমানের পরামর্শক্রমে দুপুরের অধিবেশন থেকে "বিপ্লবী" শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছিল। ওইদিন কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিয়েছিলেন বেতার প্রকৌশল বিভাগের রাশেদুল হোসেন ও শরফুজ্জামান। আরও ছিলেন কাজী হাবিব উদ্দিন আহমেদ নামে একজন তরুণ ব্যবসায়ী। বিকেলের অধিবেশনে জিয়াউর রহমান একটি নতুন ঘোষণাপত্রে নিজেকে Provisional head of Bangladesh হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। এতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ায় চট্টগ্রামের বিশিষ্ট প্রবীণ রাজনীতিবিদ্ এ. কে. খানের উপদেশে মেজর জিয়াউর রহমান তা সংশোধন করে ২৯ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু'র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তৃতীয় একটি ঘোষণা প্রচার করেছিলেন। এই তৃতীয় ঘোষণাটি রেকর্ডকৃত এবং ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে এখনও সংরক্ষিত।

২৯ মার্চ কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিয়েছিলেন বেতার প্রকৌশলী সৈয়দ আবদুস শাকের, অনুষ্ঠান প্রযোজক মুস্তাফা আনোয়ার, প্রকৌশলী

কর্মী রেজাউল করিম চৌধুরী। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ আল-ফারুক, কাজী হাবিবউদ্দিন আহমদ, রাশেদুল হোসেন, শরফুজ্জামান, আমিনুর রহমান এবং সৈয়দ আবদুস শুকুর। স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত এই সব শব্দসৈনিকদের যাত্রা শুরু হয়েছিল এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যদের বিভ্রান্ত ও হতোদ্যম করার জন্য কালুরঘাটের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর খবর প্রচার করা হয়েছিল। "জেনারেল টিক্কা খান নিহত","বালুচ ও পাঞ্জাবি হানাদার সৈন্যদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ", "বঙ্গবন্ধু আমাদের মধ্যে আছেন"-এ ধরনের প্রচারযুদ্ধে আক্রান্ত নিরস্ত্র বাঙালিদের মনে সাহস সঞ্চারে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শুরু থেকে শেষদিন পর্যন্ত অনুষ্ঠানের সূচক সুর হিসেবে "জয় বাংলা, বাংলার জয়" গানটি এবং প্রতিদিনের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণায় কোরানের একটি বাণী প্রচার করা হত–আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, "আমি তখনই কোনও জাতিকে সাহায্য করি যখন সে জাতি নিজেকে নিজে সাহায্য করে।"

৩০ মার্চের প্রভাতী অধিবেশনে ঘোষণাপত্র পাঠ করে মেজর জিয়াউর রহমান অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। দুপুরের অধিবেশন শেষ হওয়ার পর-পরই হানাদার বাহিনীর বিমান হামলা শুরু হয়েছিল কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে। ট্রান্সমিটার ভবন ও রিসিভিং সেন্টারে তখন উপস্থিত ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতারের কর্মীরা। বিমান হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ট্রান্সমিটারের মাস্ট এবং যন্ত্রপাতি। ফলে কালুরঘাটে স্বাধীন বাংলা বেতারের প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ড ওইখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। বোমাবর্ষণ শেষ হওয়ার পর সবাই যে যার মতো নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলে গিয়েছিলেন।

৩১ মার্চের সকালে আবার সবাই মিলিত হয়েছিলেন ট্রান্সমিটার ভবনে। সেখান থেকে আর অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব ছিল না। হানাদার বাহিনী চট্টগ্রাম শহরে পৌঁছে গিয়েছিল। কালুরঘাটের পতন ছিল অত্যাসন্ন। এ অবস্থায় বেতার প্রকৌশলী সৈয়দ আব্দুস শাকেরের তত্ত্বাবধানে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আমিনুর রহমান এবং মেকানিক আবদুস শুকুর দু'জন অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে ট্রান্সমিটার ভবনে রক্ষিত একটি এক কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার ডিসমেন্টাল করলেন। উদ্দেশ্য ট্রান্সমিটারটি ট্রাকের ওপর নিয়ে তা মোবাইল ট্রান্সমিটার হিসেবে ব্যবহার করা। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্রান্সমিটার সহ ট্রাকটি পটিয়া'য় নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু সেখান থেকেও এই ক্ষুদ্র ট্রান্সমিটার ব্যবহার বা অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব হয়নি। কেননা পটিয়া'তেও বিমান হামলার আশঙ্কা ছিল প্রতি মুহূর্তে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়

এরপর স্বাধীন বাংলা বেতারের কর্মীরা কিভাবে রামগড় সীমানা অতিক্রম করে ৩ এপ্রিলে ভারতের আগরতলা'য় পৌঁছেছিলেন, দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান প্রচার কী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পুনরায় শুরু করেছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ বেলাল মোহাম্মদ দিয়েছেন তাঁর লেখা "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" গ্রন্থে ও বেতার বাংলা ডিসেম্বর ২য় পক্ষ ১৯৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত "বেতার-মুক্তি সংগ্রামে" শিরোনামের নিবন্ধে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত সময়কালের স্বাধীন বাংলা বেতারের কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত তথ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন এভাবে–"২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত চট্টগ্রামের কালুরঘাট এবং ৩ এপ্রিল থেকে ২৫ মে ১৯৭১ পর্যন্ত রামগড় সীমান্তবর্তী মুক্ত অঞ্চল। কালুরঘাট পর্যায়ে চট্টগ্রাম বেতারের ১০ কিলোওয়াট শক্তির ট্রান্সমিটার এবং পরবর্তী পর্যায়ে ট্রান্সমিটার ভবন থেকে স্থানান্তরিত একটি ১ কিলোওয়াট শক্তির মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার ও অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রথমত ২০০ ওয়াট শক্তির ওপরে ৪০০ ওয়াট শক্তির শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার ব্যবহার করা হয়।

"কালুরঘাটে ৫ দিনের মধ্যে আমাদের দশ জনের একটি ক্ষুদে কর্মীদল গড়ে ওঠে। দলের সদস্যরা হচ্ছেন–অনুষ্ঠান বিভাগীয় আমি (বেলাল মোহাম্মদ), আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ আল-ফারুক, মুস্তাফা আনোয়ার ও কাজী হাবিব উদ্দিন আহম্মদ এবং প্রকৌশল বিভাগীয় সৈয়দ আবদুস শাকের, রাশেদুল হোসেন, আমিনুর রহমান, শারফুজ্জামান ও রেজাউল করিম চৌধুরী। ওই সময়েই দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ২৭ মার্চ, ১৯৭১ আমি আমার বন্ধু মাহমুদ হোসেন (শহীদ) সহ পটিয়া'য় গিয়ে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করি। মেজর জিয়া ট্রান্সমিটার ভবনে নিরাপত্তা প্রহরার ব্যবস্থা করেন এবং সেদিনই সন্ধ্যায় বেতারে তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচার করেন। আলোচ্য পর্যায়ে প্রকৌশলিক দায়িত্বে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন মেকানিক আবদুস শুকুর। দলভুক্ত কর্মীগণ ছাড়া নৈমিত্তিকভাবে অন্যান্য যাঁরা অনুষ্ঠান প্রচার বা ঘোষনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি আবদুস সালাম, এম এ হান্নান, হাবিবুর রহমান জালাল, সুলতানুল আলম, তমজিদা বেগম, তৎকালীন ক্যাপটেন ভূঁইয়া, মাহমুদ হোসেন (শহীদ) প্রমুখের নাম উল্লেখ্য।

"৩০ মার্চ, ১৯৭১ ট্রান্সমিটার ভবনে বিমান থেকে বোমা বর্ষণের পর ৩১ মার্চে ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি ডিসমেন্টাল করে নিয়ে আমরা পটিয়া'য় অধ্যাপক নূরুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং সেখানে যুবকর্মী শামসুল আলমের আতিথ্য গ্রহণ করি। পটিয়া'য় বেতার প্রকৌশলী মোসলেম খানের কাছ থেকে আমরা উপদেশ গ্রহণ করি, ১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি ইনস্টল করার স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে। তিনি বললেন ট্রান্সমিটারটি এখানে স্থাপন করেও কোন লাভ হবে না। ১

কিলোওয়াটের কভারেজ খুবই কম। ট্রান্সমিটিং শুরু হওয়া মাত্র এই এলাকাটি শত্রুর বোমার টার্গেট হবে। তার চেয়ে আমরা যদি ভারত সীমান্তের কাছাকাছি কোনও মুক্ত অঞ্চলে চলে যাই এবং ভারতীয় এলাকা থেকে আমাদের ব্রডকাস্ট শোনা গেলে কাজের মতো কাজ হবে।

৩রা এপ্রিল ১৯৭১ সকাল বেলা আমরা যাত্রা করলাম পটিয়া থেকে। এই পথ যাত্রা আমাদের দশজনের সংগে সহযাত্রী হলেন সেকান্দার হায়াত খান। তরুণ ড্রাইভার এনাম মাইক্রোবাস চালিয়ে গেলেন সন্ধ্যায়। ফটিক ছড়ির ভেতর দিয়ে গ্রামীণ পথ বেয়ে আমরা রামগড় পৌছলাম। রামগড় সীমান্তের অদুরে অন্যসূত্র থেকে প্রাপ্ত একটি ২০০ ওয়াট শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার থেকে সেদিনই রাত ১০টার পর একটি অধিবেশন প্রচার করা সম্ভব হলো। অধিবেশনটি ১ ঘন্টা স্থায়ী। কালুরঘাট বিমান হামলার পর থেকে আমি ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিভিন্ন খবর টুকে টুকে নিয়ে কাগজ ভর্তি করে পকেটে রাখতাম। এখন সেটাই কাজে গেলে গেলো। বাংলা সংবাদ পাঠ করলেন আবুল কাসেম সন্দ্বীপ এবং আবদুল্লাহ-আল-ফারুকের তৈরী ইংরেজি সংবাদ পাঠ করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী এ কে খানের কনিষ্ঠ পুত্র। এই দিনে আমাদের সহায়কদের মধ্যে আতাউর রহমান কায়সার, মীর্যা আবুল মনসুর ও মোশাররফ হোসেন প্রমুখের নাম উল্লেখ্য।

৪ঠা এপ্রিল আমরা ১০ জন কর্মী দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ি। শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার এবং আমাদের নিয়ে যাওয়া ১ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটারে কর্মকর্তারা হলেন আমি (বেলাল মোহাম্মদ) আবু কাসেম সন্দ্বীপ, আবদুল্লাহ-আল-ফারুক, মোস্তফা আনোয়ার ও শারফুজ্জামান আর ১- কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি সেফ সার্কিট ডায়াগ্রামের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ গাইড মঞ্চ ছাড়াই ইনষ্টল ও চালু করার অপূর্ব দক্ষতার পরিচয়দানকারী সৈয়দ আবদুস শাকের, রাশেদুল হোসেন আমিনুর রহমান, রেজাউল করিম ও কাজী হাবীব উদ্দিন আহমদ।

১ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারটি পটিয়া থেকে রামগড় নিয়ে যাবার দুঃসাহসিক কার্যক্রম সম্পাদন করেন রাশেদুল হোসেন ও আমিনুর রহমান।

মুক্ত অঞ্চলে ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ আমাদের সংগে যোগদান করলেন সুব্রত বড়ুয়া। ঐ সময়ে আমাদের উপদেষ্টা হিসেবে নির্বাচন বিজয়ী রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ সার্বক্ষণিক ভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। এ ছাড়া এম আর সিদ্দিকী, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, মাহবুব আলম চাষী প্রমুখের কাছ থেকে আমরা প্রচুর সহযোগিতা পেলাম। নেতৃবৃন্দের কাছে আমাদের সর্ব সময়ের আবেদন, একটি উচ্চ শক্তির ট্রান্সমিটার চাই। কেননা এখন আমরা যতোই যা কিছুই প্রচার করি বেশী সংখ্যক দেশবাসীকে তা শোনানো যাচ্ছে না।

মুক্তাঞ্চলে আমাদের আভ্যন্তরীণ কথিকাদি রচনা ও প্রচার ছাড়াও আমিনুল হক বাদশা, মোস্তফা মনোয়ার ও ব্যারিষ্টার মওদুদ দু'একটি কথিকা প্রচার করেন। এই সময়ই একটি কথিকা প্রসঙ্গে আমাদের মোস্তফা আনোয়ার লিখলেন 'দখলদাররা

বাংলাদেশে মানুষ হত্যা করছে। আসুন, আমরা পশু হত্যা করি'। এই বাক্যটি পরবর্তীকালে এক দুর্দান্ত শ্লোগান হিসেবে বহুল প্রচারিত হয়।

অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা প্রসঙ্গে ঐ সময় আমিএই কথাটি চালু করলাম, 'আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন আমি তখনই কোনও জাতিকে সাহায্য করি, যখন সে জাতি নিজেকে নিজে সাহায্য করে।' কথাটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সমাপ্তি ঘোষণার শেষ দিন পর্যন্ত প্রচলিত থাকে।

২৫ মে, ১৯৭১ মুজিবনগরে ঢাকা ও রাজশাহী থেকে নবাগত অন্যান্য বেতার-কর্মীর সঙ্গে একযোগে আমরা দেশ শত্রুমুক্ত হওয়া অবধি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটারে কার্যরত থাকি। মুজিবনগরে এক বৈঠকে সংগ্রামী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম চট্টগ্রামের কালুরঘাট ট্রান্সমিটারে ২৬ মার্চ, ১৯৭১ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে সাধুবাদ দিতে গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন–"তোমরা এমন এক সময়ে আমাদের জনমনে আশার আলো সঞ্চারিত করেছিলে, যখন আমাদের দেশ জনপদে আলো ছিল না।"

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের তৃতীয় পর্যায়

মে মাসের মাঝামাঝি আগরতলায় পৌছালেন ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান সংগঠক আশফাকুর রহমান খান, অনুষ্ঠান প্রযোজক তাহের সুলতান ও টি. এইচ. শিকদার, অনুষ্ঠান ঘোষক ও শিল্পী শহিদুল ইসলাম, আশরাফুল আলম, আলী রেজা চৌধুরী, এ. কে. শামসুদ্দিন, মঞ্জুর কাদের, মহসিন রেজা এবং তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান ঢাকার মটর চালক নওয়াব জামান চৌধুরী। তাঁরা কিছু অনুষ্ঠান ও গানের টেপ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, স্বাধীন বাংলা বেতারে কাজ করা। দখলদার বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ ঢাকা বেতার থেকে আশফাকুর রহমান এবং তাঁর সহকর্মীরা মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলা বেতারে যোগদানের জন্য পূর্ব থেকেই দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতারে যোগদানের জন্য কীভাবে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে আশফাকুর রহমান স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে– "বস্তুত ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ "ঢাকা বেতার কেন্দ্র" বঙ্গবন্ধু'র আহবানে সাড়া দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচার করে। ২৫ মার্চের কালরাত্রির পর অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীতে বেতার কেন্দ্র পুনরায় ইয়াহিয়া সরকারের দখলে চলে যায়। ২৬ শে মার্চ সকালে কার্ফু চলাকালে সামরিক কর্তৃপক্ষ বেতার ভবনের চৌকিদারদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে অনুষ্ঠানকর্মী ও প্রকৌশলীদের বাড়ি খুঁজে-খুঁজে তাদেরকে তুলে আনে এবং অনুষ্ঠান প্রচারে বাধ্য করে। শুধু তাই নয়, আমরা যারা অসহযোগের সময় কিছুটা বেশি সক্রিয় ছিলাম তাদের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছিল। ২৬ মার্চ রাত্রে আমরা চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে আমাদের সহকর্মীদের উদ্‌যোগে প্রচারিত "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র" শুনতে পেয়েছিলাম, যেটি ৩০ মার্চ পর্যন্ত চালু রাখার

পর পাকিস্তানি বিমান আক্রমণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে সময় ঢাকা কেন্দ্রের আমরা কয়েকজন সমমনা কর্মী মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে একটি সুপরিকল্পিত বেতার কেন্দ্র চালু রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। শুরু হয় বিশ্বস্ত ও প্রয়োজনীয় কর্মী নির্বাচন (ওই পরিস্থিতিতে কাজটি ছিল খুবই কঠিন) এবং শত্রু কবলিত বেতার কেন্দ্র থেকে (তখন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের ভেতর ও বাইরে সার্বক্ষণিকভাবে সামরিক প্রহরা ছিল) বঙ্গবন্ধু'র ভাষণসহ অসহযোগ আন্দোলনকালীন অনুষ্ঠানগুলো বাইরে পাচার করার কাজ খুবই দুরূহ ও ঝুঁকিপূর্ণ হলেও পুরো এপ্রিল মাস এই প্রক্রিয়া চলে। একই সঙ্গে মুক্তাঞ্চলে প্রবাসী সরকারের সঙ্গে যোগদানের জন্য পথ বের করার জন্য প্রচেষ্টা চলতে থাকে। অবশেষে একজন মুক্তিযোদ্ধা (ডাক নাম খোকন) গন্তব্য স্থলে পৌঁছানোর দায়িত্ব নেন। অগ্রণী দল হিসেবে আমি, তাহের সুলতান ও টি. এইচ. শিকদার ১০ মে তারিখে ভোর রাতে ঢাকা থেকে বের হই। সঙ্গে ছিল অনুষ্ঠানের টেপ। স্পুল থেকে খুলে বালিশের খোলের ভেতর ভরে নেয়া হয়েছিল। আমরা বাস ও লঞ্চে নবীনগরে গিয়ে খোকনদের বাড়িতে একরাত অবস্থান করে পরদিন আবার শেষ রাতে একদল মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে গন্তব্য স্থান আগরতলার দিকে রওনা হই। প্রথমে নৌকায়, পরে পদব্রজে আরও প্রায় ২০ মাইল। এই যাত্রাপথে আমরা সম্মুখীন হই পাকিস্তানি সেনাদের গানবোটের টহল, শান্তি কমিটির সভা এবং আখাউড়া সীমান্তে খানসেনা এবং মুক্তিবাহিনীর মধ্যে প্রচন্ড ক্রস ফায়ারের। এই সংঘর্ষের জন্য সেখানকার একটি প্রাইমারি স্কুলে রাত কাটাতে হয়েছিল। ১২ মে সন্ধ্যায় পৌঁছি আগরতলা'য়। সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ক্যাম্প অফিসে রিপোর্ট করি এবং আমাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি। আগরতলা'য় বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, অধ্যাপক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এবং ভারতীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের বেশ কয়েকজন কর্তা ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হয়। এদের মধ্যে তৎকালীন কেন্দ্রীয় তথ্য বেতার প্রতিমন্ত্রী নন্দিনী সৎপথি, পূর্ববাংলার ক্যাম্পসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ড. ত্রিগুণা সেন, কর্নেল ব্যানার্জি, আকাশবাণী'র মহাপরিচালক অশোক সেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ওই সময় আগরতলা সফর করেন। বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে আমরাও অংশগ্রহণ করি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ থেকে আগত অন্যান্য শিক্ষক, অধ্যাপক-সাংবাদিকদের ভারত সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার প্রস্তাব ও সুযোগ দিচ্ছিল। সেই মতো আমাদেরকেও আকাশবাণী'তে চাকরির প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে আমাদের উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক একটি বেতার কেন্দ্র চালু করার কথা ব্যক্ত করি এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রার্থনা করি। কয়েকদিন পর আমরা জানতে পারি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার একটি বেতার কেন্দ্র চালু করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি ৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটার লাভের আশ্বাস পেয়েছেন এবং অভিজ্ঞ বেতার কর্মীর জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদেরকে বলা হলো, আপনারা তিনজন কি চালু করতে পারবেন? আমরা তখন সম্মতি জানিয়ে ঢাকায়

অপেক্ষারত আমাদের দ্বিতীয় দলের কথা বলি। ১৮ মে আমাদেরকে কলকাতায় যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। সে অনুযায়ী আমরা তিনজন বাসে ও ট্রেনে ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় অতিক্রম করে চারদিন পর কলকাতা পৌঁছি। ২২ মে কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনে গিয়ে আমিনুল হক বাদশা'র (পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু'র উপ-প্রেস সেক্রেটারি) দেখা পাই। তিনি আমাদেরকে নিয়ে যান প্রবাসী সরকারের তথ্য ও বেতারের ভারপ্রাপ্ত এম এন এ জনাব আবদুল মান্নান-এর কাছে "জয়বাংলা" পত্রিকা অফিসে। তিনি বলেন, ট্রান্সমিটারটি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে থাকবে। অনুষ্ঠান নির্মানের জন্য আমাদের কী প্রয়োজন? সে মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে কোনও প্রকৌশলী ছিল না। তবুও আমরা জানালাম, অনুষ্ঠান বাণীবদ্ধ করার জন্য একটি ঘর, দু'টি প্রফেশনাল টেপরেকর্ডার, মাইক্রোফোন এবং কিছু টেপ পেলেই আমরা অনুষ্ঠানের কাজ শুরু করতে পারব। এরপর আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে। সেখানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ সহ প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য এবং জনাব মান্নান অবস্থান করছিলেন। জানা গেল, দু'একদিনের মধ্যেই তাঁরা অন্যত্র চলে যাবেন এবং এই বাড়িতেই বেতার কেন্দ্রের কাজ চলবে। আমরা সেখানেই অবস্থান করলাম। পরদিন অর্থাৎ ২৩ মে আমাদের প্রার্থিত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এসে গেল। আমরা সারাদিন ধরে বালিশের খোলে জড়ানো টেপ পুনরায় স্পুলে জড়ানোর কাজে এবং পাণ্ডুলিপি রচনায় ব্যস্ত রইলাম। ওদিকে তাহের সুলতান একজন প্রকৌশলীর মতোই অ্যামপ্লিফায়ার, টেকরেকর্ডার, পাওয়ার মিক্সচার, মাইক্রোফোনের তার সংযোগের কাজ সম্পন্ন করছিল। ইতিমধ্যে কলকাতায় অবস্থানরত কামাল লোহানী, সৈয়দ হাসান ইমাম, আমিনুল হক বাদশা সংবাদ বিভাগের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এম আর আখতার মুকুল ভাই নিয়ে এলেন তীব্র ব্যঙ্গাত্মক এবং অত্যন্ত রসঘন রম্য কথিকা–যার নাম দিয়েছিলাম "চরমপত্র"। আমাদের কাছে ছিল বঙ্গবন্ধু'র ৭ই মার্চের ভাষণ এবং বেশ কিছু দেশাত্মবোধক গান। যার মধ্যে "জয় বাংলা, বাংলার জয়", নজরুলের "কারার ওই লৌহ কপাট", "শিকল পরার ছল" প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৪মে সারাদিন ধরে একটি অধিবেশনের অনুষ্ঠান বাণীবদ্ধ করা হয়। ২৫ মে সকালে ৫০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার মারফত ইথারে ধ্বনিত হয় "স্বাধীন বাংলা বেতার"-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম অধিবেশন। কোরান তেলাওয়াত, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনুষ্ঠান "অগ্নিশিখা", "চরমপত্র", দেশাত্মবোধক সংগীতানুষ্ঠান "জাগরণী", সংবাদ ছাড়াও সেই দিন ছিল ১১ জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ কবি নজরুলের জন্মদিন। এ উপলক্ষে তাঁর গান ও কবিতার সমন্বয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এভাবেই শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পিত শক্তিশালী স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান যা চূড়ান্ত বিজয়েরও কয়েকদিন পর পর্যন্ত চালু ছিল। শুরুর কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকা থেকে আমাদের দ্বিতীয় দল এবং আগরতলা থেকে চট্টগ্রামের সহকর্মীবৃন্দ, এরপর রাজশাহী এবং খুলনার বেতার কর্মীরাও যোগদান করেন। এছাড়া বাংলাদেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক,

বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ্‌সহ প্রায় আড়াই শতাধিক ব্যক্তি স্বাধীন বাংলা বেতারে অংশগ্রহণ করেন।"

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে হানাদার বাহিনী আক্রান্ত রাজশাহী থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে কলকাতায় গিয়েছিলেন রাজশাহী বেতারের অনুষ্ঠান সংগঠক শামসুল হুদা চৌধুরী, মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ এবং অনুষ্ঠান প্রযোজক অনু ইসলাম, শাজাহান ফারুক এবং বার্তা বিভাগের সাব-এডিটর ম. মামুন। শামসুল হুদা চৌধুরী, মেজবাহ উদ্দিন, শাজাহান ফারুক এবং ম. মামুন যোগ দিয়েছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতারে। অনু ইসলাম যুক্ত হয়েছিলেন সাপ্তাহিক "জয়বাংলা" পত্রিকায়। আলী যাকের ছিলেন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রোগ্রামের অনুষ্ঠান প্রযোজক। মুজিবনগরের স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান কার্যক্রম ও অংশগ্রহণকারীদের বিষয়ে শামসুল হুদা চৌধুরী'র 'একাত্তরের রণাঙ্গন' এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে আহরিত কিছু তথ্য সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করছি ঃ

পঞ্চাশ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে ২৫ মে সকাল ৭টায় প্রথম অধিবেশনের শুভ উদ্বোধনের সঙ্গেই শুরু হয়েছিল মুজিবনগরে সংগঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকগণের দৃপ্ত পথযাত্রা। দৈনিক সকাল ৭টা ও সন্ধ্যা ৭টা এই দুই অধিবেশনে শুরু হয়েছিল এই অনুষ্ঠান প্রচার। অনুষ্ঠানসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বাংলা ও ইংরেজি খবর, সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান, অগ্নিশিখা, চরমপত্র, বিশেষ কথিকা, বঙ্গবন্ধু'র বাণী এবং দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান "জাগরণী"।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কাজ চলত কলকাতাস্থ বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের ছোট্ট একটি দ্বিতল বাড়িতে (৫৭/৮, বালিগঞ্জ, সারকুলার রোড)। এই বাড়িতে প্রাথমিকভাবে অনুষ্ঠান বাণীবদ্ধ করার জন্য কর্মীরা একটিমাত্র কক্ষ পেয়েছিলেন। সারাদিন এবং গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করার পর ওই দ্বিতল বাড়ির খোলা মেঝেতে চাদর বিছিয়ে তাঁরা শুয়ে পড়তেন। কেউ-কেউ ওই একমাত্র স্টুডিও'তেই ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দিতেন।

প্রথম থেকেই বার্তা সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন কামাল লোহানী। বাংলা সংবাদ বুলেটিন–আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, রণজিৎ পাল চৌধুরী। বাংলা সংবাদ পাঠ–কামাল লোহানী, হাসান ইমাম, আলী রেজা চৌধুরী, নূরুল ইসলাম সরকার, শহীদুল ইসলাম, আশরাফুল আলম ও বাবুল আখতার। ইংরেজি সংবাদ বুলেটিন ম. মামুন, সুব্রত বড়ুয়া, এ. কে. এম. জালালউদ্দিন। ইংরেজি সংবাদ পাঠ–পারভীন হোসেন, জরীন আহমদ (নাসরীন আহ্‌মদ) ও ফিরোজ ইফতেখার। প্রকৌশল বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন সৈয়দ আবদুস শাকের। সহযোগী প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন রাশেদুল হোসেন, আমিনুর রহমান, শারফুজ্জামান, মোমিনুল হক চৌধুরী, প্রণব রায়, রেজাউল করিম চৌধুরী ও হাবিবুল্লাহ চৌধুরী।

অনুষ্ঠান সংগঠক আশফাকুর রহমান শুরু থেকেই অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, নতুন গান বাণীবদ্ধকরণ, নতুন আঙ্গিকে ঘোষণাপত্র লিখন এবং কণ্ঠদানসহ অনুষ্ঠান উপস্থাপনার সমন্বয় করতেন। প্রত্যেক অনুষ্ঠান-কর্মী যার-যার মেধা অনুযায়ী পরিকল্পনা এবং প্রচারে অংশ নিতেন। প্রথম কিছুদিন আশফাকুর রহমান, বেলাল মোহাম্মদ কিংবা টি. এইচ. শিকদার অধিবেশনপত্র লিখতেন। পরে বেলাল মোহাম্মদ, শামসুল হুদা চৌধুরী এবং আশফাকুর রহমান'কে নিয়ে একটি নির্ধারিত অনুষ্ঠান প্রচার তালিকা (ফিক্সড পয়েন্ট চার্ট) তৈরি করা হয়েছিল। ওই চার্ট অনুযায়ী প্রতিদিনের অধিশেনপত্র তৈরি করে দেয়ার দায়িত্ব পালন করতেন সিনিয়র অনুষ্ঠান সংগঠক শামসুল হুদা চৌধুরী।

স্বাধীন বাংলা বেতারের অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল "জল্লাদের দরবার" নাটিকা এবং "চরমপত্র"। "জল্লাদের দরবার"-এ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান'কে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে চিত্রিত কেল্লা ফতেহ আলী খানের চরিত্রে অভিনয় করতেন রাজু আহমেদ। দুর্মুখ চরিত্রে অভিনয় করতেন নারায়ণ ঘোষ। নাটিকাটি ধারাবাহিকভাবে লিখতেন নাট্যকার কল্যাণ মিত্র।

ঢাকার কথ্য ভাষায় উপস্থাপিত "চরমপত্র" লিখতেন এবং পড়তেন জনাব এম. আর. আখতার মুকুল। অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা করেছিলেন জনাব আবদুল মান্নান (ভারপ্রাপ্ত এম এন এ) এবং নামকরণ করেছিলেন জনাব আশফাকুর রহমান। মুক্তিবাহিনীর জন্য "অগ্নিশিখা" নামে বিশেষ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, প্রযোজনা এবং নামকরণ করেছিলেন টি. এইচ. শিকদার। পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে মোস্তফা আনোয়ার এবং আশরাফুল আলম এই অনুষ্ঠানের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন।

টি. এইচ. শিকদারের পরিকল্পনানুযায়ী সংযোজিত হয়েছিল সাহিত্যানুষ্ঠান "রক্তস্বাক্ষর"। "বিশ্ব জনমত" এবং সাপ্তাহিক "জয় বাংলা" পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য এই দু'টি পাণ্ডুলিপি পড়তেন আমিনুল হক বাদশা। বিশ্ব জনমত লিখে দিতেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সাদেকীন। তবে মাঝে-মধ্যে আবুল কাশেম সন্দ্বীপও এই অনুষ্ঠানের পাণ্ডুলিপি লিখতেন। একই নামের মধ্যে নতুন সংযোজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল রণভেরী, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ সংবাদ বুলেটিন এবং দর্পণ। মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে লিখিত বিশেষ এই কথিকাটি লিখতেন ও পড়তেন আশরাফুল আলম।

গান, নাটক এবং কথিকা সহ যাবতীয় অনুষ্ঠান বাণীবদ্ধ করার জন্য প্রথমে একটিমাত্র স্টুডিও ব্যবহার করা হতো। এই স্টুডিও'তে শব্দ নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অক্টোবর '৭১-এর প্রথম সপ্তাহে শুধুমাত্র সংগীত বাণীবদ্ধ করার জন্য আরও একটি কক্ষকে স্টুডিও'তে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

সেপ্টেম্বর '৭১ থেকে নভেম্বর '৭১ পর্যন্ত আরও যেসব নতুন অনুষ্ঠান সংযোজন করা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে ছিল "সোনার বাংলা", "প্রতিধ্বনি", "কাঠগড়ার আসামি", "পিন্ডির প্রলাপ", "মুক্তাঙ্গন ঘুরে এলাম", "ইয়াহিয়া জবাব দাও",

"প্রতিনিধি কণ্ঠ" প্রভৃতি। এছাড়া এম. আর. আখতার মুকুলের উৎসাহে "ওরা রক্তবীজ" শিরোনামে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ একটি অনুষ্ঠানও সংযোজিত হয়েছিল।

গ্রাম-বাংলার শ্রোতাদের জন্য "সোনার বাংলা" অনুষ্ঠানটির প্রচার শুরু হয়েছিল ২১ সেপ্টেম্বর '৭১ থেকে। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, পাণ্ডুলিপিকার এবং পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শহীদুল ইসলাম। তিনি একই সঙ্গে "প্রতিধ্বনি" অনুষ্ঠানটিও প্রযোজনা করেছিলেন। অল্পদিন পরে "সোনার বাংলা" অনুষ্ঠানটির পাণ্ডুলিপি লিখন এবং পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন রাজশাহী থেকে আগত বিশিষ্ট শিল্পী ও গীতিকার মুস্তাফিজুর রহমান। "কাঠগড়ার আসামি" অনুষ্ঠানটিরও লেখক এবং পাঠক ছিলেন তিনি। "সোনার বাংলা" অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা ছিলেন মাধুরী চট্টোপাধ্যায় (কাজলীর মা), সৈয়দ মোহাম্মদ চাঁদ (রুস্তম ভাই), ইয়ার মোহাম্মদ (জমির ভাই) এবং আপেল মাহমুদ (মজিদের বাপ)। "পিন্ডির প্রলাপ"-এর লেখক এবং পাঠক ছিলেন আবু তোয়াব খান। পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানটি লিখতেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ এবং পাঠ করতেন কামাল লোহানী। "ইয়াহিয়া জবাব দাও" কথিকা সিরিজের লেখক এবং পাঠক ছিলেন কথাশিল্পী শওকত ওসমান।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত অনুষ্ঠান সিরিজের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল "প্রতিনিধির কণ্ঠ"। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী কর্তৃক জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ এবং বাণী সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মনে সঞ্চার করেছিল আশার আলো। মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল আতাউল গনি ওসমানীও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ রেখেছিলেন। এছাড়া যে সব প্রতিনিধি বিভিন্ন সময়ে এই সিরিজে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কণ্ঠ দান করেছেন, তাঁরা ছিলেন তৎকালীন এম এন এ আবদুল মান্নান (ভারপ্রাপ্ত এমএনএ, প্রেস, বেতার ও ফিল্ম), জিল্লুর রহমান, কার্যনির্বাহী সম্পাদক, সাপ্তাহিক জয়বাংলা পত্রিকা। আবদুল মালেক উকিল, মিজানুর রহমান চৌধুরী, ইউসুফ আলী, সৈয়দ আবদুস সুলতান, অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, বেগম বদরুন্নেসা আহমদ, নূরুল হক, অধ্যাপক হুমায়ুন খালেদ, শামসুর রহমান খান শাহজাহান, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, শামসুদ্দিন মোল্লা, মোস্তাফিজুর রহমান (চুন্নু মিঞা), মনসুর আহমদ, সাখাওয়াতউল্লাহ, ডাক্তার সাহিদুর রহমান ও নাজিমুদ্দিন প্রমুখ।

যে সকল নিবেদিত বুদ্ধিজীবী নিয়মিত অনুষ্ঠান সিরিজে অংশ নিয়েছেন, তাঁরা ছিলেন–সৈয়দ আলী আহসান ("ইসলামের দৃষ্টিতে" ঃ ধারাবাহিক কথিকা), ডক্টর মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক রণেশ দাশগুপ্ত (দৃষ্টিপাত" ঃ ধারাবাহিক পর্যালোচনা), আবদুল গাফফার চৌধুরী ("পুতুল নাচের খেলা"), ফয়েজ আহমদ ("পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে"), সাংবাদিক সাদেকীন ("বিশ্ব

জনমত"), আমীর হোসেন ("সংবাদ পর্যালোচনা"), গাজীউল হক ("রণাঙ্গনের চিঠি"), সলিমুল্লাহ ("রাজনৈতিক পর্যালোচনা"), মাহবুব তালুকদার ("মানুষের মুখ"), আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী ("দখলীকৃত এলাকা ঘুরে এলাম"), বদরুল হাসান ("বেঈমানের দলিল"), মোহাম্মদ মুসা ("রণাঙ্গন ঘুরে এলাম") নাসিম চৌধুরী ("গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল") এবং আরও অনেকে।

যে সকল বুদ্ধিজীবী-সুধীজন অনিয়মিত কথক হিসেবে কিংবা ছোট গল্প লিখে অনুষ্ঠান প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড. মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, ড. এ. আর. মল্লিক, ড. আনিসুজ্জামান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, ড. বেলায়েত হোসেন, ড. এ. জি. সামাদ, ড. অজয় রায়, ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, ড. এ. কে. এম আমিনুল ইসলাম, জহির রায়হান, সন্তোষ গুপ্ত, অধ্যাপক অসিত রায় চৌধুরী, অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর, জাহাঙ্গীর আলম, ডা. নুরুন্নাহার জহুর, আইভি রহমান, কুলসুম আসাদ, নূরজাহান মযহার, বেগম মুশতারি শফী, রাফিয়া আখতার ডলি, মাহমুদা খাতুন, বাসনা গুণ, দীপ্তি লোহানী, রেবা আখতার, জলি জাহানুর, দীপক ব্যানার্জী, সুকুমার হোড়, শওকত আরা আজিজ, পারভীন আখতার, দিলীপ কুমার ধর, বুলবন ওসমান, আবদুল জলিল, অধ্যাপক অনুপম সেন, খোন্দকার মকবুল হোসেন, দেবেশ দাস, মুজিব বিন হক, মোহাম্মদ আশরাফউদ্দিন, অধ্যাপক আবু সুফিয়ান, প্রণব চৌধুরী, হাফেজ আলী, আবুল মনজুর এবং আরও অনেকে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অনন্য। যেসব ছাত্রনেতা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মূল্যবান ভাষণ এবং কথিকা প্রচার করেছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন, আসম আব্দুর রব, এম. এ. রেজা এবং আরও অনেকে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে মনোবল ও প্রেরণা সঞ্চারের জন্য গানের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। যাঁরা গান অথবা কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সিকান্দার আবু জাফর, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, আসাদ চৌধুরী, টি. এইচ. শিকদার, সরওয়ার জাহান, শহীদুল ইসলাম, বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, মুস্তাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ শাহ বাঙালী, প্রণদিৎ বড়ুয়া, এস. এম. আবদুল গনি বোখারী, মিজানুর রহমান চৌধুরী, নওয়াজেশ হোসেন, গণেশ ভৌমিক, মোকসেদ আলী সাঁই, সবুজ চক্রবর্তী, বিপ্লব দাস, বিপ্রদাস বড়ুয়া, রফিক নওশাদ, অধ্যাপক অসিত রায় চৌধুরী, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, পুনম চৌধুরী, অরূপ তালুকদার, নাসিম চৌধুরী, কাজী রোজী এবং আরও অনেকে। যে সব নেপথ্য গীতিকার স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রে যান নি, কিন্তু যাদের রচিত গান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে গীত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন গাজী মাজহারুল আনোয়ার, আবদুল লতিফ, ফজল-এ-খোদা, নঈম গহর, ড. মনিরুজ্জামান, কবি আজিজুর রহমান, হাফিজুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হুদা ও আরও অনেকে। ঐ সময়ে

কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় গীতিকার রচিত গান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে গীত হয়েছে। তাঁরা ছিলেন গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ("শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণি") গোবিন্দ হালদার ("মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি"), সলিল চৌধুরী ("বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা"), শ্যামল দাশগুপ্ত ("সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি নাম মুজিবর") প্রমুখ। "শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি" গানটির সুরারোপ এবং কণ্ঠ দিয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পী অংশুমান রায়।

যাঁরা সংগীতে অথবা পুঁথি পাঠে অথবা আবৃত্তিতে কণ্ঠদান কিংবা সংগীত পরিচালনায় মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সমর দাস, আবদুল জব্বার, অজিত রায়, আপেল মাহমুদ, রথীন রায়, মান্না হক, এম. এ. মান্নান, পুঁথি পাঠে মোহাম্মদ শাহ বাঙালী, আবৃত্তিতে অতিথি শিল্পী কাজী সব্যসাচী (কাজী নজরুল ইসলাম-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র) মুজিব বিন হক, নিখিল রঞ্জন দাশ (ধারাবর্ণনা), একক বা সমবেত কণ্ঠদানে শাহ আলী সরকার, সন্‌জীদা খাতুন, কল্যাণী ঘোষ, অনুপ কুমার ভট্টাচার্য, মঞ্জুর আহমদ, কাদেরী কিবরিয়া, সুবল দাস, হরলাল রায়, এস. এম. এ. গনি বোখারী, শাহীন মাহমুদ, অনিল চন্দ্র দে, অরূপ রতন চৌধুরী, মোশাদ আলী, শেফালী ঘোষ, হেনা বেগম, মফিজ আঙুর, লাকি আখন্দ, স্বপ্না রায়, মালা খান, রূপক খান, মাধুরী আচার্য, নমিতা ঘোষ, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, আবু নওশের, রমা ভৌমিক, মনোয়ার হোসেন, অজয় কিশোর রায়, কামালউদ্দিন, ইকবাল আহমদ, রঞ্জন ঘটক, মনোরঞ্জন ঘোষাল, তোরাব আলী শাহ, নায়লা জামান, বুলবুল মহলানবীশ, এম. এ. খালেক, মাকসুদ আলী সাঁই, ফকির আলমগীর, মলয় ঘোষ দস্তিদার, মঞ্জুলা দাশ গুপ্ত, সুব্রত সেন গুপ্ত, উমা চৌধুরী, মোশাররফ হোসেন, ঝর্ণা ব্যানার্জি, সুকুমার বিশ্বাস, তরুণ রায়, প্রবাল চৌধুরী, তোরাব আলী, রফিকুল আলম, কল্যাণী মিত্র, মঞ্জুশ্রী নিয়োগী, লীনা দাস, সকিনা বেগম, রেজওয়ানুল হক, অনীতা বসু, নীনা, কণা, মহিউদ্দিন খোকা, রিজিয়া সাইফুদ্দিন, রেহানা বেগম, মিহির নন্দী, অমিতা সেন গুপ্ত, মোস্তফা তানুজ, সাধন সরকার, মুজিবুর রহমান, মিনু রায়, রীতা চ্যাটার্জি, শান্তি মুখার্জি, জীবনকৃষ্ণ দাস, শিব শংকর রায়, সৈয়দ আলমগীর, ভারতী ঘোষ, শেফালী সান্ন্যাল, মদন মোহন দাস, শহীদ হাসান, অরুণা সাহা, জয়ন্তী ভূঁইয়া, কুইন মাহাজীন, মৃণাল ভট্টাচার্য, শাফাউন নবী, প্রদীপ ঘোষ, মিহির কর্মকার, শক্তি শিক্ষা দাস, মিহির লালা, গীতশ্রী সেন, গৌরাঙ্গ সরকার, প্রণব চন্দ্র, সাইদুর রহমান, কাঞ্চন তালুকদার, মুকুল চৌধুরী, মলিনা দাস, জরিন আহমদ, ইন্দুবিকাশ রায়, বাসুদেব, পরিতোষ শীল, মিতালী মুখার্জী, মলয় গাঙ্গুলী, তপন ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন ভূঁইয়া, শক্তি মহলানবীশ, তিমির নন্দী, মামুনাল চৌধুরী, আফরোজা মামুন এবং আরও অনেকে। যেসব সংগীত শিল্পী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যান নি, কিন্তু যাঁদের গান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন শাহনাজ বেগম (পরবর্তীকালে শাহনাজ রহমতুল্লাহ)। শিল্পীকণ্ঠে গীত, আবদুল

লতিফ রচিত ও সুরারোপিত "সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা, সোনা নয় তত খাঁটি" গানটি স্বাধীন বাংলা থেকে নিয়মিত প্রচারিত হত। সংগীত বিভাগের নানাবিধ কাজে সহযোগিতা করতেন কাজী হাবিবুদ্দিন (অনুষ্ঠান সচিব), এবং রঙ্গলাল দেব চৌধুরী (টেপ লাইব্রেরিয়ান)। যন্ত্র সংগীতে ছিলেন সুজেয় শ্যাম, কালাচাঁদ ঘোষ, গোপীবল্লভ বিশ্বাস, হরেন্দ্র চন্দ্র লাহিড়ী, সুবল দত্ত, বাবুল দত্ত, অবিনাশ শীল, সুনীল গোস্বামী, তড়িৎ হোসেন খান, দিলীপ দাস গুপ্ত, দিলীপ ঘোষ, জুলু খান, রুমু খান, বাসুদেব দাস, সমীর চন্দ্র শতদল সেন এবং আরও অনেকে।

নাট্যকার, নাট্য প্রযোজনা এবং নাট্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন নাট্যকার আবদুল জব্বার খান, নারায়ণ ঘোষ, কল্যাণ মিত্র, মামুনুর রশীদ, নাট্য প্রযোজক রণেন কুশারী, নাট্য প্রযোজক অভিনেতা হাসান ইমাম, মরহুম রাজু আহমদ ("জল্লাদের দরবার" নাটিকার প্রধান চরিত্র কেল্লা ফতেহ আলী খান), নারায়ণ ঘোষ ("জল্লাদের দরবার" নাটিকার অন্যতম প্রধান চরিত্র দুর্মুখ), তোফাজ্জেল হোসেন এবং আরও অনেকে। নাটক এবং জীবন্তিকায় অংশগ্রহণ করেছেন সুভাষ দত্ত, আতাউর রহমান, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা দেবী, আজমল হুদা মিঠু, ফিরোজ ইফতিখার, প্রসেনজিৎ বোস, অমিতাভ বসু, জহুরুল হক, ইফতেখারুল আলম, বুলবুল মহলানবিশ, করুণা রায়, গোলাম রব্বানী, মাসুদা নবী, অমিতা বসু, সৈয়দ দীপেন, লায়লা হাসান, মুক্তি মহলানবিশ, নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়, রাশেদুর রহমান, কাজী তামান্না, দিলীপ চক্রবর্তী, দিলীপ সোম, বাদল রহমান, মযহারুল হক, আসহাবুদ্দিন খান, মদন শাহ, খান মুনির, পূর্ণেন্দু সাহা, তোফাজ্জল হোসেন, আসলাম পারভেজ, উম্মে কুলসুম, সুফিয়া খাতুন, তাজিন শাহনাজ মুর্শিদ, দিলশাদ বেগম, ইয়ার মোহাম্মদ, সৈয়দ মোহাম্মদ এবং আরও অনেকে।

যাঁরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পবিত্র কোরান তেলাওয়াত ও অনুবাদে মৌলানা নূরুল ইসলাম জেহাদী, মৌলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী ও মৌলানা ওবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী। পবিত্র গীতা পাঠে অংশ নিয়েছেন বিনয় কুমার মন্ডল ও জ্ঞানেন্দ্র বিশ্বাস। পবিত্র ত্রিপিটক পাঠে রণধীর বড়ুয়া এবং পবিত্র বাইবেল পাঠে ছিলেন ডেভিড প্রণব দাশ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ছিল অত্যন্ত গতিশীল এবং আকর্ষণীয়। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় যারা কণ্ঠ দিয়েছেন প্রায় ক্ষেত্রেই তারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়েই লিখে দিয়েছেন অনুষ্ঠান ঘোষণা এবং উপস্থাপনার কথা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আশফাকুর রহমান খান, টি. এইচ. শিকদার, মুস্তফা আনোয়ার, আশরাফুল আলম, শহীদুল ইসলাম, বাবুল আখতার (মঞ্জুর কাদের), আবু ইউনুস, মোতাহার হোসেন, মহসীন রেজা এবং আরও অনেকে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বিভিন্ন ধারার কাজে আরও যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফজলুল হক, শাহ সালাহ্ উদ্দিন সাজ্জাদ, দেলওয়ার হোসেন, সফিউর রহমান দুলু, নাসির আহমদ প্রমুখ।

স্বাধীন বাংলা বেতার ছাড়াও নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দখলদার বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ বেতার কেন্দ্রগুলোর অবস্থা কিছুটা উল্লেখ করতে চাই। যে সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যেতে পারেনি তাদের মধ্যে কেউ-কেউ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। অনেক কর্মকর্তা কর্মচারী বাধ্য হয়ে বেতারের চাকরিতে যোগদান করেছিলেন। যারা চাকরি করতেন তারা উদ্যত রাইফেলের সম্মুখে কাজ করতে বাধ্য হতেন। এঁদের ওপর সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর শ্যেন দৃষ্টি ছিল। সবাইকে তারা সন্দেহ করত মুক্তিবাহিনীর দোসর হিসেবে। বেতার ভবনে প্রহরারত দখলদার সৈন্যরা নানা ছলছুতোয় বাঙালি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নানাভাবে নির্যাতন, অপমান অপদস্ত করে উল্লাস বোধ করত। তাদের নির্দেশের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলেই সন্দেহভাজন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে "মুক্তি" হিসেবে ধরে নিয়ে যাওয়া হত। তাদের ওপর নেমে আসতো অকথ্য নির্যাতন। রংপুর বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সংগঠক মহিউদ্দিন হায়দার এবং রাজশাহীর বেতার প্রকৌশলী মোহসেন আলী, অফিস সহকারী আব্দুল মতিন, রংপুর বেতার কেন্দ্রের গাড়িচালক চাঁদ আলী হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছিলেন। নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন রংপুর কেন্দ্রের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রিয়াজুল হক। চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালনার প্রাথমিক কাজে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন বেতার প্রকৌশলী মোসলেম খানও হানাদার বাহিনীর হাতে অবর্ণনীয় নির্যাতনের ফলে দীর্ঘকাল মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় ছিলেন। ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক মফিজুল হক'কে বন্দী করে রাখা হয়েছিল জেলে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুঃখজনকভাবে নিহত হয়েছিলেন খুলনা'র আঞ্চলিক প্রকৌশলী বজলুল হালিম চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক চৌধুরী আবদুল কাহহার। এভাবে বহু কর্মকর্তা, কর্মচারী, বেতার শিল্পী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কেউ হারিয়েছেন তাদের ভাই, কেউ হারিয়েছেন পিতা, কেউ বা স্বামী, কেউ হারিয়েছেন সম্ভ্রম। তবু এপারের সকল বেতার কর্মীদের শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সহকর্মীদের প্রতি, শব্দসৈনিকদের প্রতি। নয় মাসের অবরুদ্ধ অন্ধকার প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত্রি তাদের কেটেছে অপেক্ষায়-অপেক্ষায় কখন স্বাধীনতার সূর্যোদয় হবে।

বাংলাদেশ বেতারের সূচনা ও অভিযাত্রা

ডিসেম্বরের শুরুতে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হতেই ভারত ৬ ডিসেম্বর তারিখে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। সেদিন থেকে "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে"র নামকরণ করা হয় "বাংলাদেশ বেতার"।

অবশেষে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশিত বিজয় এল ১৬ ডিসেম্বর। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় ঘটল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির চির আকাঙ্ক্ষিত সোনার

বাংলা স্বাধীন হল। স্বাধীন বাংলাদেশে এবার সবার ঘরে ফেরার পালা। ২২ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে যুদ্ধকালীন সরকার ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। ১৬ ডিসেম্বর থেকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের ঢাকা বেতার কেন্দ্র। বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র চালু করার ব্যাপারে অগ্রগামী পর্যবেক্ষক হিসেব প্রকৌশলী সৈয়দ আবদুস শাকের'কে ঢাকায় পাঠানো হল। প্রবাসী সরকারের ঢাকায় প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ধারা বিবরণী প্রচার করা হল ২২ ডিসেম্বরে। ইতোমধ্যে কামাল লোহানী, আশফাকুর রহমান, শহীদুল ইসলাম, মুস্তফা আনোয়ার, শারফুজ্জামান স্বাধীন বাংলা বেতারের বাছাই করা অনুষ্ঠানগুলোর কিছু টেপ নিয়ে ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন। ২২ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ বেতার ঢাকার অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে প্রচার শুরু হলেও কলকাতা থেকে "বাংলাদেশ বেতার, মুজিবনগর" কেন্দ্র চালু ছিল ২ জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত। তারপর নির্দেশক্রমে সমাপ্তি ঘটল মুজিবনগর বেতারের। শেষ হল স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারের নয় মাসের সংগ্রামী অভিযাত্রা।

এরপর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে বাংলাদেশ বেতারের পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতারের নিউক্লিয়াস থেকে। প্রথমে শাহবাগে ঢাকা বেতারের একটি কক্ষে পরে ধানমন্ডির একটি ভাড়া বাড়িতে স্থাপন করা হয়েছিল বাংলাদেশ বেতারের হেড কোয়ার্টার বা সদর দপ্তর। প্রথম মহাপরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন আশরাফ-উজ-জামান। ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অস্থায়ী দায়িত্ব পেয়েছিলেন ওএসডি হিসেবে নিযুক্ত কামাল লোহানী। সার্বিক প্রশাসন এবং অনুষ্ঠান কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য ঢাকা সহ সকল আঞ্চলিক কেন্দ্র এই সদর দফতরের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছিল। ঢাকা কেন্দ্র নিজস্ব আঞ্চলিক অনুষ্ঠান ছাড়াও জাতীয় অনুষ্ঠান প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করছিলেন ১০ জানুয়ারি তারিখে। তাঁর প্রত্যাবর্তনের দিনটি ছিল একটি ঐতিহাসিক দিন। বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানাতে ঢাকা পুরাতন বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স, সমস্ত ঢাকা শহর লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে ফুলের মতো আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল। ঢাকা বেতার সেদিন বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লক্ষ জনতার শোভাযাত্রার ওপর সরাসরি ধারা বিবরণী প্রচার করেছিল।

বেতারের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় যে সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী স্বাধীন বাংলা বেতারে কাজ করতেন তাদের নিয়োগ, পোস্টিং ও পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করা হয়েছিল সদর দফতর থেকে। যে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী সীমান্ত অতিক্রম করে ওপারে যেতে পারেন নি এবং অবরুদ্ধ পাকিস্তান বেতারে কাজ করেছেন তাদের চাকরি বাংলাদেশে থাকবে কি থাকবে না এই নিয়ে তারা প্রথমদিকে একটা সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে সে সময়ে সর্বত্রই একটা উত্তেজনা ছিল। নাজুক অর্থনৈতিক অবস্থা ও বেকারত্বের কারণে সে সময়ের সামাজিক ও

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অস্থির এবং উত্তপ্ত। সুতরাং সেই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে নিয়োগ, পদোন্নতি নিয়ে মুজিবনগর এবং নন-মুজিবনগরের মধ্যে একটা মানসিক দ্বন্দ্ব ও অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি হয়েছিল। মুজিবনগর নন-মুজিবনগরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সিনিয়রিটি-জুনিয়রিটি নিয়ে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। বেতারের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় মুজিবনগরের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সিনিয়রিটি এবং সেই সঙ্গে কাউকে এক ধাপ, কাউকে দুই ধাপ পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল। মুজিবনগরের নন বা অবরুদ্ধ পাকিস্তান বেতারে কাজ করেছেন এমন কোনও-কোনও বাঙালি কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে (সৈয়দ জিল্লুর রহমান ব্যতীত) পদচ্যুত করা হয় নি। দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করার অভিযোগে রেডিও পাকিস্তান ঢাকার সর্বশেষ আঞ্চলিক পরিচালক সৈয়দ জিল্লুর রহমান'কে স্বাধীনতার পরপরই জেলে পাঠানো হয়েছিল। যে সকল অবাঙালি কর্মকতা ও কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন তারাও পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে চাকরি করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু এরা বেশি দিন বাংলাদেশে থাকেননি। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তারা পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন।

আশরাফ-উজ-জামান মহাপরিচালক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র তিন মাস। এপ্রিল '৭২ থেকে মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন এনামুল হক। তাঁর মেয়াদকালও ছিল তিন মাস। তারপর নিযুক্ত হয়েছিলেন চরমপত্র খ্যাত এম. আর. আখতার মুকুল। কামাল লোহানী'র পরিবর্তে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের দায়িত্ব পেয়েছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে আগত সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত শামসুল হুদা চৌধুরী। তিনি তিন মাস দায়িত্ব পালনের পর ঢাকা বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক হয়েছিলেন রংপুর বেতার কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক আলিমুজ্জামান চৌধুরী। কিন্তু তিনিও সুস্থিরভাবে কাজ করতে পারেন নি। চার মাস পর ১২-১২-৭২ থেকে তাঁর পরিবর্তে দায়িত্ব পেলেন স্বাধীন বাংলা বেতারের অন্যতম সংগঠক আশফাকুর রহমান খান। এই ধরনের ঘন-ঘন পরিবর্তন সে সময়ের একটা অস্থির অবস্থার চিত্ররূপ। এম. আর. আখতার মুকুল ২২-৭-৭২ থেকে ২৬-৮-৭৪ পর্যন্ত মহাপরিচালক ছিলেন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশ বেতারের একটা প্রশাসনিক কাঠামো অনুমোদিত হয়েছিল। বেতারের সদর দফতরসহ সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠান, প্রশাসন, প্রকৌশল ও বার্তা বিভাগের জন্য সর্বস্তরে কিছু পদ সৃষ্টি করে বেশ কিছু নিয়োগ ও পদোন্নতি দানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মুজিবনগরের যে সকল অস্থায়ী কর্মচারী বা শিল্পীকে সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দান সম্ভব হয় নি, তাদের বেশির ভাগকেই বেতারে নিজস্ব শিল্পী (স্টাফ আর্টিস্ট) অথবা মাসিক চুক্তিবদ্ধ শিল্পী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল।

বাইরের পরিবেশ পরিস্থিতিতে অস্থিরতা উত্তেজনা থাকলেও সে সময়ে বেতারের অনুষ্ঠানে এসবের ছায়াপাত ঘটেনি। মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা-চেতনার

ধারাবাহিকতায় বেতারের অনুষ্ঠান নির্মাতারা তখন কিছুটা নিয়ন্ত্রণ মুক্তভাবেই নানা ধরনের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ওই সময়ের মূল সমস্যা ছিল আইন-শৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতি এবং বেআইনি অস্ত্র। সে অবস্থায় সদ্য স্বাধীন দেশের পুনর্গঠনে সমাজের সর্বস্তরে সন্ত্রাস দমন, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অস্ত্র জমা দেয়া, বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ বেতার থেকে নানাবিধ অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সবসময়েই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে ওই সময়ে বেতারের ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর ছিল। কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বেতারের বিভিন্ন অনুষ্ঠান শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষদের যথেষ্ট প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এছাড়াও জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বঙ্গবন্ধু'র রেকর্ডকৃত বক্তৃতার চুম্বক অংশ বিশেষ অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে 'বজ্রকণ্ঠ' শিরোনামে প্রচার করা হত।

বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। এই চারটি রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত, দেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে। চেয়েছিলেন শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াসে বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। তিনি চেয়েছিলেন সবার সহযোগিতা, পরিশ্রম, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ। সর্বস্তরের সর্বমতাদর্শের জনগোষ্ঠীকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত এবং সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বাংলাদেশ বেতার ছিল তাঁর স্বপ্ন, তাঁর চিন্তা-চেতনার ছায়াসঙ্গী। তাঁর নির্দেশে জাতীয় পরিবর্তন ও চাহিদার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ বেতারকে একটি শক্তিশালী গণমাধ্যমে রূপান্তরিত করার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেন নি। বাংলার মানুষকে তিনি বড় বেশি ভালবাসতেন। শত্রু-মিত্রের কোনও ভেদ ছিল না তাঁর কাছে। আবেগ, বিশ্বাস ও ভালোবাসার কাছে তিনি ছিলেন পরাজিত। তাঁর ঔদার্যের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা-বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালাতে থাকে এবং অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও দেশের স্বাধীনতাকে এক বিপর্যয়কর পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

এ ছাড়াও সে সময়ের কিছু ঘটনা যেমন নকশাল তৎপরতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ বন্ধে রক্ষীবাহিনীর নির্মম সাঁড়াশী অভিযান, সর্বস্তরে দুর্নীতি এবং '৭৪ এর দুর্ভিক্ষে ব্যাপক প্রাণহানী সাধারণ মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে শূন্য অবস্থা থেকে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি ও প্রশাসনিক দূর্বলতার কারণে বঙ্গবন্ধু প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। ফলে জনগণের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দেশে বিদেশে তিনি দারুণভাবে সমালোচিত হতে থাকেন। বাংলাদেশের প্রতি বৈরি আমেরিকার তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জার উপহাস করে বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসাবে আখ্যা দেন।

অব্যাহত সন্ত্রাস এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে বঙ্গবন্ধু দেশে জরুরি আইন ঘোষণা করেন। এরপর ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তিনি সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রথা প্রবর্তন করেন এবং নিজে রাষ্ট্রপতি হন। এরপর ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপ নিয়ে একক জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করেন। সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কর্মী, সামরিক, বেসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারীদের বাকশালে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯৭৫ এর ১৬ জুন তারিখে দেশে সরকারি নিয়ন্ত্রণে ৪টি মাত্র সংবাদ পত্র রেখে বাকি সকল পত্রিকার প্রকাশনা বাতিল করে দেওয়া হয়। যিনি ছিলেন স্বাধীনতার স্থপতি, আজীবন গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন তাঁর এই সকল কার্যক্রম জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ময় ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

তাঁর এই সকল কার্যক্রম সুযোগ সন্ধানী তোষামদকারীদের দ্বারা বিপুল ভাবে প্রশংসিত ও অভিনন্দিত হলেও তা ছিল বাহ্যিক ও অন্তঃসারশূন্য। গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তিনি যাতে বাস্তবায়ন না করতে পারেন সেই লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র দানা বাঁধতে থাকে। সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চাকাঙ্খী অসন্তুষ্ট সদস্য এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁকে ক্ষমতা চ্যুত করার নীল নকশা প্রণয়ন করতে থাকে। অবশেষে তাদের নিযুক্ত ঘাতকচক্রের দল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখ রাত্রে কোনওরূপ প্রতিরোধ ছাড়াই সপরিবারে তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। ইতিহাসে সূচিত হয় এক কলংকজনক অধ্যায়ের। এই হত্যাকান্ডের ষড়যন্ত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিল আওয়ামী লীগের মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ, তাহের উদ্দিন ঠাকুর এবং সেনাবাহিনীর একটি বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র চক্র কর্নেল ফারুক, কর্নেল রশিদ, মেজর নূর, মেজর ডালিম, মেজর শাহ্‌রিয়ার, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা প্রমুখ এবং তাদের কিছু অনুগত সেনাসদস্য। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর-পরই ঘাতকচক্র প্রথমেই ঢাকা বেতার কেন্দ্র দখল করে নেয় এবং ১৫ আগস্টের ভোর থেকেই রেডিও পাকিস্তানের আদলে "বাংলাদেশ বেতার"কে "রেডিও বাংলাদেশ" পরিচিতির মাধ্যমে শেখ মুজিব'কে হত্যা করা হয়েছে, খোন্দকার মোশতাক'কে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে ইত্যাদি ঘোষণা প্রচার করতে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু'র এই পরিনতিতে সমগ্র জাতি সেদিন ছিল নির্বাক। কিন্তু উল্লসিত আনন্দে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল একাত্তরের পরাজিত শত্রুরা– যারা এতদিন অন্ধকারে আত্মগোপন থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিল। আওয়ামী লীগের মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে এভাবেই স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছিল। তাদের ক্ষমতা দখলের মূল কারণ ছিল বাকশাল ব্যবস্থাকে প্রতিহত করা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করা এবং বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তান বা পাকিস্তানের তাঁবেদারী প্রদেশে পরিণত করা। এই লক্ষ্য নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত সন্ত্রাসী চক্র বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের হৃদয় থেকে বঙ্গবন্ধু'র নাম, তাঁর স্মৃতি চিরতরে মুছে ফেলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করল। বেতার, টিভিতে বঙ্গবন্ধু'র নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ করা হল। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অনুৎসাহিত করা হল 'পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য', 'রাজাকার' এধরনের ঘৃণাসংবলিত শব্দ, বাক্য, বেতারের কোনও পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহার না করা এবং তাদের নৃশংসতার কথা উল্লেখ না করা।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ভেতর দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত সফল হলেও প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক তার অনুগতদের নিয়ে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা বিশেষ করে সেনাবাহিনীর মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তার ব্যর্থতায় জনরোষ ধূমায়িত হতে থাকে। সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বঙ্গবন্ধু'র হত্যাকারী এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারী মেজরদের নেতৃত্বে দেশ শাসন ও তাদের আধিপত্য মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ এর নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট মোশতাক বঙ্গভবনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। ক্ষমতাচ্যুত হবার পূর্বমুহূতে খন্দকার মোশতাকের নির্দেশে তার অনুগত ঘাতক সেনাচক্র ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক চার জাতীয় নেতা (যারা বঙ্গবন্ধু'র অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন) সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব মনসুর আলী এবং জনাব কামরুজ্জামানকে কারাগারের মধ্যেই নির্মমভাবে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে ঘাতক চক্র একটি চাটার্ড প্লেনে দেশ থেকে পলায়ন করে। এই সময় সারা বাংলাদেশে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্কলহে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্যান্টনমেন্টে বন্দী হয়ে পড়েন। মেজর জেনারেল খালেদ মোশারফ খন্দকার মোশতাককে ক্ষমতাচ্যুত নিজের অবস্থান রক্ষা করতে পারেননি। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা অবসর প্রাপ্ত কর্ণেল তাহের এবং মুক্তিযোদ্ধা অবসর প্রাপ্ত মেজর জলিল এর নেতৃত্বাধীন জাসদের গণবাহিনী সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে প্রচারপত্র বিলি করতে থাকে। গণবাহিনী প্ররোচিত সাধারণ সেনা সদস্যরা তাদের অফিসারদের হত্যা করতে শুরু করে। এর ফলে নভেম্বরের ৫ ও ৬ তারিখে খালেদ মোশাররফ সহ বেশ কিছু সেনা কর্মকর্তা এদের হাতে নিহত হন। ৭ নভেম্বর তারিখে বিপ্লবী সাধারণ সেনা সদস্যরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বন্দী জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে শাহবাগের বেতার ভবনে নিয়ে আসে। উল্লেখ্য যে ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু'র হত্যাযজ্ঞের দিন থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সকল অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থানের ঘটনা প্রবাহে শাহবাগের ঢাকা বেতার কেন্দ্র পরিণত হয়েছিল একটি সামরিক দুর্গে এবং অভ্যুত্থানকারীদের সকল কর্মকান্ড পরিচালনার একটি সেন্ট্রাল নার্ভে। বেতারের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবস্থা তখন ছিল খুবই সংগীন। বেতার ভবনের অধিকাংশ কক্ষ ছিল নিয়ন্ত্রণকারী সেনা

কর্মকর্তাদের দখলে। সে সময়ে সামরিক কর্মকর্তাদের অনুমোদন ছাড়া কোনও অনুষ্ঠান প্রচারিত হতনা। ফলে অনুষ্ঠান হয়ে পড়েছিল প্রাণহীন ও বৈচিত্রহীন। কয়েকজন অনুষ্ঠান কর্মকর্তা দুঃখজনকভাবে সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে নিগৃহিত হয়েছিলেন। রামপুরা টেলিভিশন কেন্দ্রের কয়েকজন কর্মকর্তা সেনা সদস্যদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এসব কারণে বেতারের কর্মকর্তা, কর্মচারীরা ঐ পরিস্থিতির মধ্যে প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হতেন।

যা হোক ৭ নভেম্বর তারিখে সকালে জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে বেতার ভবনে আনার পূর্বেই খন্দকার মোশতাককেও ৭ নভেম্বর ভোরে বঙ্গভবন থেকে শাহবাগ বেতার ভবনে আনা হয়েছিল। গণবাহিনীর বিপ্লবী কমান্ডার কর্ণেল তাহেরও সকালে স্বল্প সময়ের জন্য বেতার ভবনে এসেছিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই বেতার ভবন ত্যাগ করেন। বেতার ভবনের সম্মুখস্ত রাস্তায় বিপ্লবী বাহিনীর সাথে কিছু উৎসাহী লোককে বিজয় মিছিল করতে দেখা যায়। বিপ্লবী সেনাসদস্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বেতার ভবনে আসেন জিয়াউর রহমান এবং অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ওসমানী। বিপ্লবী সেনা সদস্যদের নির্দেশে প্রথমে বেতার থেকে জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়। পরে বেতারের আঞ্চলিক পরিচালকের কক্ষে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন খন্দকার মোশতাক, জেনারেল ওসমানী, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং আরও কয়েকজন উর্দ্ধতন সেনা কর্মকর্তা। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খন্দকার মোশতাক আনুষ্ঠানিক-ভাবে পদত্যাগ করেন এবং প্রধান বিচারপতি এএসএম সায়েম প্রেসিডেন্ট এবং সেই সঙ্গে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনা প্রধান এবং উপ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই ক্ষমতা হস্তান্তর ও গ্রহণের বিষয়ে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক এবং নব নিযুক্ত প্রেসিডেন্ট প্রধান বিচারপতি এ এম এস সায়েমের ভাষণ জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশন থেকে একযোগে প্রচার করা হয়।

সেনা প্রধান জিয়াউর রহমান বেশ কিছুকাল উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রেসিডেন্ট সায়েম ছিলেন নামমাত্র প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। সাধারণ সেনা সদস্যদের কল্যাণে তাদের কিছু কিছু অভাব অভিযোগ পূরণ এবং সেইসঙ্গে সেনাবাহিনীতে নিয়ম শৃঙ্খলা, চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠায় জেনারেল জিয়া কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সামরিক বাহিনীর সংস্কার ছাড়াও দেশের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তিনি নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলে ১৯৭৬ সালে তিনি নিজেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। রাষ্ট্রপতি পদে বৈধতার জন্য তিনি ১৯৭৮ সালে জনগণের হ্যাঁ সূচক আস্থা ভোট গ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত একদলীয় বাকশালের পরিবর্তে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, রাজনৈতিক দলসমূহ পুনরুজ্জীবন এবং তাদের

কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি প্রদান করেন। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর তিনি নিজে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন যার নাম দেওয়া হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি। তিনি বাকশাল আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া সকল সংবাদপত্র পুনরায় প্রকাশনার অনুমতি প্রদান করেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে তিনি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দর্শন চালু করেন। তিনি তাঁর পরিকল্পিত উনিশ দফা উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে কিছু কিছু সফলতা অর্জনে সক্ষম হন। তাঁর উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে কৃষিকার্যে সেচসুবিধার জন্য পানি সংরক্ষণে খাল কাটা কর্মসূচী আলোড়ন তুলেছিল। কোদাল, ঝুড়ি নিয়ে সর্বস্তরের লোকজন, ছাত্র-জনতা দলে দলে বিভিন্ন স্থানে তাঁর নেতৃত্বে খাল কাটায় অংশ নিতো। এ সকল কার্যক্রম বেতার, টেলিভিশন থেকে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রচার করা হত। সাদা ক্যাপ, সাদা টি শার্ট, চোখে কালো চশমা পরা প্রেসিডেন্ট জিয়া কোদাল হাতে মাটি কাটছেন এই ভাবমূর্তি এবং দৃশ্য জনগণের মনে একটা বিশেষ ছাপ তৈরি করেছিল। তবে রাষ্ট্রপতি জিয়া শুধু শক্তহাতে কোদাল কোপাননি, শক্ত হাতে তিনি তাঁর বিরোধী সকল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী সেনা সদস্যদেরও কঠোরভাবে দমন করেছিলেন। সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ষড়যন্ত্র, বিশৃঙ্খলা ও সরকার উৎখাতের প্রচেষ্টার অভিযোগে তিনি মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু'র হত্যাকান্ড, ৩ নভেম্বর জেলখানায় জাতীয় চার নেতার হত্যাকান্ড, ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত সেনাবাহিনীর মধ্যে অরাজকতা, তাদের অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। জেনারেল জিয়া লৌহ মানবের ন্যায় তাঁর সুকঠিন নেতৃত্ব, সাহস ও প্রজ্ঞা দ্বারা দেশকে ধ্বংসের প্রান্তসীমা থেকে টেনে তুলেছিলেন। তাঁর একনায়কত্ব সুলভ আচরণে মানুষের মনে যথেষ্ট ক্ষোভ ও অসন্তোষ থাকলেও দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছিল এবং বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কিছুটা উজ্জ্বল হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকেও বঙ্গবন্ধু'র মতো দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির শিকার হতে হয়। যে চট্টগ্রাম থেকে দশ বছর আগে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেছিলেন, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু করেছিলেন সেই চট্টগ্রামেই তাঁর বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটে। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ কোন্দলের বিষাক্ত ছোবলে ১৯৮১ সালের ৩০মে রাত্রে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে মেজর জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বাধীন কিছু বিদ্রোহী অফিসারদের হাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। তাঁর হত্যাকান্ডের খবর বিদ্রোহী অফিসারদের অধিকৃত চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয় এবং চট্টগ্রাম সাময়িকভাবে বাংলাদেশে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রপতি জিয়ার হত্যাকান্ডের খবর ঢাকা পৌছা মাত্র ঢাকা সেনা সদর দপ্তর এই বিদ্রোহদমনে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ ছিলেন তৎকালীন সেনা প্রধান। সাংবিধানিক শূন্যতা পূরণ কল্পে অসুস্থ উপরাষ্ট্রপতি জাস্টিস আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি

হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন এবং বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমনের নির্দেশ দেন। বেতার ও টেলিভিশনের সকল নিয়মিত অনুষ্ঠান বাতিল করে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশের জন্য কোরান তেলাওয়াত, হামদ, নাত প্রচার করা হতে থাকে। অবরুদ্ধ চট্টগ্রাম মুক্ত কল্পে সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে ২জুন তারিখে কোনওরূপ প্রতিরোধ ছাড়াই ১২ জন বিদ্রোহী অফিসার আত্মসমর্পণ করেন। মেজর জেনারেল মঞ্জুর পলায়ন কালে সীমান্তের নিকটবর্তীস্থলে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং বন্দী অবস্থায় সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন। অন্যান্য ধৃত অফিসারগণকে পরবর্তীকালে কোর্টমার্শালের বিচারে ফাঁসি দেওয়া হয়।

শহীদ জিয়ার মরদেহ বিদ্রোহীরা প্রথমে রাউজানে সমাহিত করেছিল। বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের পর রাউজানের কবর থেকে লাশ উঠিয়ে তা কফিনে করে ঢাকায় আনা হয়। মানিক মিয়া এভিনিউতে লক্ষাধিক লোকের শোকার্ত সমাবেশে তাঁর নামাজে জানাজা এবং চন্দ্রিমা উদ্যানে (বর্তমানে জিয়া উদ্যান) তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়। বেতার এবং টেলিভিশন থেকে মর্মস্পর্শী ধারা বর্ণনার মাধ্যমে এই শোক শোভাযাত্রা, নামাজে জানাজা এবং সমাহিত করার দৃশ্য সরাসরি প্রচার করা হয়।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় পুনঃ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জাস্টিস সাত্তার বেশিদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন নি। উচ্চাভিলাসী সেনাপ্রধান হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রথমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সেনাবাহিনীর অংশীদারিত্ব দাবি করেন। প্রেসিডেন্ট সাত্তার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ অব্যাহত চাপ প্রয়োগ এবং সেই সঙ্গে দেশে সন্ত্রাস ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান অবনতির অভিযোগ এনে প্রেসিডেন্ট সাত্তারকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। ১৯৮২ সালে ২৪ মার্চ তারিখে হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারী করে প্রথমে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং পরে স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট হন। তিনিও জিয়াউর রহমানের মতো প্রেসিডেন্ট পদে জনগণের হ্যাঁ সূচক আস্থা ভোট গ্রহণ করেন এবং তার নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং তার দল জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই ভাবে তিনি ১৯৯০ এর ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। বিতর্কিত চরিত্রের এই রাষ্ট্রপ্রধান সাহিত্যানুরাগী এবং রমনীমোহন কবি হিসাবেও বেশ খ্যাতি (!) অর্জন করেন। বেতার ও টেলিভিশনকে তার ও তার স্ত্রী রওশন এরশাদের গুনাগুণ প্রচার ও দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনকে লোকে উপহাস করে সাহেব বিবি গোলামের বাক্স হিসাবে আখ্যা দেয়। একচ্ছত্র ক্ষমতা ব্যবহার করে সেতু, রাস্তাঘাট নির্মাণসহ কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করলেও তার সরকারের লাগামহীন দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের নিপীড়ন ও স্বৈরতন্ত্রের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে জন অসন্তোষ দেখা দেয়।

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এবং রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি সহ বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনসমূহ হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনে ছাত্রদের প্রাণহানী, লাগাতার হরতাল, কারফিউ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে সারা বাংলাদেশে বিশেষ করে ঢাকায় এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সরকারি প্রশাসন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। সামরিক শক্তি প্রয়োগে ব্যর্থ হয়ে হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ অবশেষে ১৯৯০ সালের ৫ ডিসেম্বর পদত্যাগে বাধ্য হন এবং প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতিক্রমেই বিচারপতি শাহাবুদ্দিন ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে পরবর্তী তিন মাস কেয়ার টেকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তিনি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১৯৯১ এর ২২ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জয়লাভ করে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

নির্বাচনে বিজয়ী বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেও ১৯৯১ এর ৬ আগষ্ট সংসদে সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যমতে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে পুনরায় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয় এবং সংসদে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী সে প্রস্তাব পাশ করা হয়। বেগম খালেদা জিয়া প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিচারপতি শাহাবুদ্দিন সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী পুনরায় বিচার বিভাগে ফিরে যান। কিন্তু পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ ' নির্বাচন সুষ্ঠ হয়নি, সূক্ষ্ম কারচুপি করে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করা হয়েছে, সংসদে আওয়ামী লীগের সদস্যদের কথা বলতে দেওয়া হয়না, জনগণের ভোটের অধিকার হরণ করা হয়েছে' এই ধরনের বিভিন্ন অভিযোগ তুলে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে অব্যাহত আন্দোলন শুরু করে এবং তাদের লাগাতার হরতালে দেশে পুনরায় অস্থিতিশীল ও অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে বিএনপি সরকার তাদের মেয়াদ শেষে ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে সংসদে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ করে এবং ১৯৯৬ সালের ৩১ মার্চ বিএনপি ক্ষমতা ত্যাগ করলে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সালের জুনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৭ম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আওয়ামীলীগ জয়লাভ করে এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু তাঁর আমলেও ব্যাপক দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের অভিযোগে বিএনপির সংসদ বর্জন ও লাগাতার হরতালে দেশে আগের মতোই অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করতে

থাকে। এরপর আওয়ামীলীগের শাসনের মেয়াদ শেষে ২০০১ সালে দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের অধীনে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে জামাতে ইসলামী সহ চারদলীয় ঐক্যজোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে এবং বেগম খালেদা জিয়া পুনরায় প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এই নির্বাচনকে 'কারচুপির নির্বাচন' হিসাবে আখ্যা দেন। পরবর্তীতে তিনি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, সন্ত্রাস, দেশ শাসনে সরকারের ব্যর্থতা ও দুর্নীতি এবং বিরোধীদলকে সংসদে কথা বলতে না দেবার অভিযোগ এনে সংসদ বর্জন করেন এবং সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন। বর্তমানে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দল সমূহের মূল দাবি হচ্ছে অবাধ সুষ্ঠ নির্বাচনের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি এবং নির্বাচন কমিশনের সংস্কার।

দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য বিরোধী দলের বিক্ষোভ ও হরতাল ছাড়াও নানা ধরনের দুঃখ জনক ঘটনা ঘটে গেছে। অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় খুলনায় কয়েকজন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। সিলেটের শাহজালালের মাজারে গ্রেনেড হামলায় আহত হয়েছেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী। টঙ্গির জনসভায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন আওয়ামী লীগের এম পি আহসান উল্লাহ মাস্টার। ২০০৪ এর ২১শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের জনসভায় শেখ হাসিনাকে হত্যাকল্পে নিক্ষিপ্ত গ্রেনেডে আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেত্রী আইভি রহমান সহ বেশ কিছু নেতা কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। ২০০৫ সালে ২৭ জানুয়ারি, হবিগঞ্জের বৈদ্যের বাজারে এক জনসভা শেষে গ্রেনেড হামলায় নিহত হয়েছেন আওয়ামী লীগের এম পি, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শাহ এ. এম. এস কিবরিয়া। এরপর গত ১৭ আগস্ট সারাদেশ ব্যাপী এক যোগে চাঞ্চল্যকর বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে 'জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ' নামে এক উগ্র ধর্মীয় জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী। এই সকল বোমাবাজি, গ্রেনেড হামলার মূল পরিকল্পক ও অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা ধরা না পড়ায় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত ও অশান্ত হয়ে উঠছে এবং দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। বেতারের ইতিহাস বর্ণনা করতে যেয়ে দেশের অতীত ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা এ কারণেই উল্লেখ করেছি যে বাংলাদেশ বেতার বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন নয়। সব সরকারের আমলে দেশের মানুষ যে পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস ও জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন বাংলাদেশ বেতারের কর্মীদেরকেও ঐ একই নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে খাপ খাইয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করতে বাধ্য হতে হয়েছে। একারণে জনগণের অর্থে পরিচালিত বেতার-টিভি কখনই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বা শান্তির সুবাতাস বয়ে আনতে পারেনি। সরকারি গণ মাধ্যম হিসেবে বেতার, টিভিকে ব্যবহার করা হয়েছে প্রতিটি ক্ষমতাসীন

সরকারের গুণগানে এবং দলীয় প্রচারে। কখনও সামরিক শাসন, কখনও স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছাত্র-জনতা আন্দোলন করেছে। গণতন্ত্র, বাক-স্বাধীনতা, ভোটের অধিকার, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু বেতার, টিভি রাজপথের এসব আন্দোলন, দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র কখনই তুলে ধরতে পারে নি। কোনও বেতার কর্মীই একাত্তরের মতো আর গর্জে উঠতে পারেন নি। প্রতিটি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছেন এবং সকলেই 'ইয়োর ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট' হিসেবে সরকারের অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছেন।

রাজনৈতিক বিষয়ে কোনও প্রতিবাদ ব্যক্ত না করলেও বেতার কর্মীরা তাঁদের অসন্তোষ আর বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন অন্যভাবে। সরকারকে বিশ্বস্ত সেবা প্রদান সত্ত্বেও সার্বিকভাবে বেতারের কর্মীদের ভাগ্য উন্নয়ন বা কল্যাণের লক্ষ্যে কোনও ব্যবস্থা কখনই গৃহীত হয়নি। সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের কর্মকর্তাদের তুলনায় বেতারের কর্মকর্তারা সবদিক দিয়েই ছিলেন অবহেলিত। একারণে স্বাধীনতার পর থেকে অনুষ্ঠান, প্রকৌশল ও বার্তা বিভাগের কর্মকর্তারা কখনও একত্রে কখনও ভিন্নভাবে তাদের সার্ভিস কন্ডিশন, পে-স্কেল এবং পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দাবি-দাওয়া পেশ করে আসছিলেন। কিন্তু কোনও সরকারই তাদের আবেদনে কর্ণপাত না করায় ১৯৮১ সালের জুন মাসে তৎকালীন রেডিও বাংলাদেশের তিনটি পেশাজীবী সংগঠন অনুষ্ঠান, বার্তা এবং প্রকৌশল শাখা একত্রিত হয়ে পে-স্কেল সহ অন্যান্য সকল ন্যায়সংগত দাবি-দাওয়া পূরণের লক্ষ্যে "কম্বাইন্ড সেন্ট্রাল অ্যাকশন কমিটি" গঠন করে এবং দাবি পূরণের জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানায়। অনুরোধের প্রেক্ষিতে সরকারের সঙ্গে তাদের আলোচনা ব্যর্থ হলে রেডিও'র সেন্ট্রাল অ্যাকশন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি ঘোষণার মাধ্যমে শ্রোতাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সকল বেতার কেন্দ্র থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনুষ্ঠান প্রচার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়। পেশাগত দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য স্বাধীনতার পূর্বে বা স্বাধীনতার পর বেতারের ইতিহাসে এধরনের ঘটনা এই প্রথম। দীর্ঘ ৪৮ ঘন্টা বেতারে অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ থাকার পর সরকারের সঙ্গে সমঝোতার প্রেক্ষিতে বেতার কেন্দ্রসমূহ পুনরায় চালু করা হয়।

কিন্তু পরবর্তীতে সমঝোতা অনুযায়ী বেতার কর্মীদের পেশাগত দাবি-দাওয়া বাস্তবায়িত না হওয়ায় বেতারের অনুষ্ঠান, বার্তা ও প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তারা ১৯৯০ এর ১০ জুলাই থেকে প্রতিবাদ স্বরূপ তাদের কর্মবিরতি ঘোষণা করেন। কর্মবিরতির কারণে বেতারে সকল নির্ধারিত অনুষ্ঠানের পরিবর্তে শুধুমাত্র যন্ত্রসংগীত প্রচারিত হতে থাকে। এই অবস্থা ২৩ জুলাই পর্যন্ত চলতে থাকে। অতঃপর তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি জনাব মওদুদ আহমদের সঙ্গে বেতার কর্মকর্তাদের সম্মিলিত অ্যাকশন কমিটির ফলপ্রসূ আলোচনা এবং তাঁর সুনির্দিষ্ট আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ২৩

জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় এই কর্মবিরতির অবসান ঘটে এবং নির্ধারিত অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়।

বাংলাদেশ বেতারের প্রশাসন ও অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান, বার্তা, প্রকৌশল এবং প্রশাসন এই চারটি বিভাগের সমন্বয়ে বাংলাদেশ বেতারের সকল কর্মকান্ড এ যাবৎ পরিচালিত হয়েছে। তবে বেতার টেলিভিশনকে একই কর্তৃপক্ষের অধীনে একটি সংস্থায় রূপান্তর ও পরিচালনার অভিপ্রায়ে ১৯৮৬ সালে তৎকালীন সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ (ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং অথরিটি) গঠন করেছিল। তবে অর্ডিন্যান্স জারির বহু পূর্ব থেকেই বেতার-টেলিভিশনকে একত্রিত করার প্রাথমিক কর্মকান্ড শুরু হয়েছিল ১৯৮৩ সাল থেকে। প্রশাসনের সুবিধার্থে শাহ্‌বাগে বেতার-এর বর্তমান সদর দফতর ভবনে টেলিভিশন সদর দফতর নিয়ে আসা হয়েছিল। টেলিভিশন ও বেতারে পৃথক-পৃথক ভাবে দু'জন মহাপরিচালক না রেখে একজন মহাপরিচালকের দায়িত্বে বেতার ও টেলিভিশনকে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এনামুল হক। এনামুল হক অল্প কিছুদিন পরেই অন্যত্র বদলি হয়ে যান। বাংলাদেশ বেতারের উপ-মহাপরিচালক (বার্তা) সাইফুল বারী তখন প্রেষণে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব ছিলেন। এনামুল হকের বদলির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালের ২মে থেকে সাইফুল বারী'কে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নিযুক্ত করে বেতার ও টিভির মহাপরিচালকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ (জাসক) গঠন সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সে বেতার ও টেলিভিশনের মহাপরিচালকের পদ বিলুপ্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে অর্ডিন্যান্স সংশোধন করে জাসক'কে সরকারি নিয়ন্ত্রণে স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার পদক্ষেপ হিসেবে কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং দু'টি সংস্থার জন্য দু'জন মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয়। মহাপরিচালক হিসেবে সাইফুল বারী'কে জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন ঘটলে সাইফুল বারী চেয়ারম্যানের পদ থেকে অপসারিত হন। সাইফুল বারী'র পর ড. সাদত হুসাইন ২৪ ডিসেম্বর '৯০ থেকে ৮ জানুয়ারি '৯২ পর্যন্ত এবং তারপর ফয়জুর রাজ্জাক ৮ জানুয়ারি '৯২ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি '৯২ পর্যন্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর থেকে জাসক কার্যত মৃত। ১৯৯২ সাল থেকে দু'টি প্রতিষ্ঠানই দু'জন মহাপরিচালকের অধীনে ভিন্নভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

ঢাকা বেতারের পরিচালক বৃন্দ

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ঢাকা বেতারের অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল ড. অমূল্য চন্দ্রসেনের নেতৃত্বে। তাঁর সর্বশেষ কার্যকাল ছিল ১ ডিসেম্বর ১৯৪২ পর্যন্ত। এরপর

পর্যায়ক্রমে পরিচালক ছিলেন অশোক কুমার সেন ১ ডিসেম্বর '৪২ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর '৪৬, উমাশংকর ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ মে ১৯৪৭ পর্যন্ত। মে ১০ থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিও ঢাকার সর্বশেষ পরিচালক জি. কে. ফরিদ। ১৯৪৭ এর ১৪ আগস্ট দেশ ভাগ হলে রেডিও পাকিস্তান ঢাকার প্রথম পরিচালক হিসাবে জি. কে. ফরিদ ২০ অক্টোবর ১৯৪৭ পর্যন্ত বহাল থাকেন। ঢাকা বেতারের ইতিহাসের অংশ হিসেবে শুধু মাত্র ঢাকা বেতারের পরিচালকদের একটি তালিকা ও কার্যকাল নিম্নে উল্লেখ করছি।

নাম	থেকে	পর্যন্ত
জি. কে. ফরিদ	১০.৫.৪৭	২০.১০.৪৭
জয়নুল আবেদীন	২১.১০.৪৭ ১.৯.৫১ ১১.১০.৫৩	২৮.১.৪৮ ১১.২.৫২ ৩১.৭.৫৫
আহসানুল হক	২৮.১.৪৮ ১২.২.৫২	৩১.৮.৫১ ১০.১০.৫৩
হাসনাইন কুতুব	৫.৯.৫৫	৪.২.৫৬
আনসার নাসরি	১.৫.৫৬	২০.৮.৫৭
এ. এফ. কলিমুল্লাহ	২১.৮.৫৭	৩১.১২.৫৯
শামসুল হুদা চৌধুরী (পরবর্তীকালে তথ্য মন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পীকার)	১.১.৬০	৩০.৪.৬২
* সৈয়দ জিল্লুর রহমান	৮.৬.৬২	৩০.৬.৬৮
আশরাফ-উজ-জামান খান (স্বাধীনতার পর প্রথম মহাপরিচালক)	১২.৭.৬৮	২৮.৪.৭১
এজাজ আহমেদ	২৮.৪.৭১	১১.৫.৭১
* সৈয়দ জিল্লুর রহমান (রেডিও পাকিস্তান, ঢাকার সর্বশেষ পরিচালক, পরবর্তীকালে শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক)	১১.৫.৭১	১৬.১২.৭২
কামাল লোহানী (বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলকাতায় স্বাধীন বাংলা বেতারের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বেতার ঢাকার বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	২৫.১২.৭১	৮.১২.৭২
শামসুল হুদা চৌধুরী (দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক, স্বাধীন বাংলা বেতারের অন্যতম সংগঠক)	৮.২.৭২	৩১.৫.৭২

নাম	থেকে	পর্যন্ত
আলীমুজ্জামান চৌধুরী	১.৬.৭২	১০.১১.৭২
আহমেদ উজ-জামান (দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক)	১১.১১.৭২	১৭.১১.৭৩
* আশফাকুর রহমান খান (স্বাধীন বাংলা বেতারের অন্যতম সংগঠক)	১৯.১১.৭৩	১১.২.৭৭
ইব্রাহিম আখন্দ	১১.২.৭৭	২১.৯.৭৮
এম এন মুস্তাফা (পরবর্তীকালে মহাপরিচালক)	২১.৯.৭৮	১৭.১২.৮০
ফখরুল ইসলাম (পরবর্তীকালে উপমহাপরিচালক)	৯.১.৮১ ৩.৮.৯১	১.৫.৮৩ ১১.১২.৯৪
মোহাম্মদ তাহের (পরবর্তীকালে উপমহাপরিচালক)	৩০.৬.৮৩	১.৮.৮৫
এস. এ. শাহাদত (পরবর্তীকালে উপমহাপরিচালক)	১৫.৮.৮৫	১২.২.৮৭
* আশফাকুর রহমান খান	১২.২.৮৭ ১.১.৯৫	১.৮.৯১ ১২.২.৯৭
এম এ জলিল	১২.২.৯৭	২৮.১১.২০০০
মোহাম্মদ ফারুক	২৯.১১.২০০০	৬.৬.২০০২
দিলরুবা বেগম	৬.৬.২০০২	২৮.২.২০০৩
ফিরোজ ইসলাম অতিরিক্ত দায়িত্ব	১.৩.২০০৩	১২.৭.২০০৩
আব্দুল হাকিম হাওলাদার	১৩.৭.২০০৩	১৪.৭.২০০৩
ফিরোজ ইসলাম অতিরিক্ত দায়িত্ব	২০.৭.২০০৩	৩১.৭.২০০৪
সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী	১.৪.২০০৪	

* [একই ব্যক্তি]

ংলাদেশ বেতারের ট্রান্সমিটার

প্রচার পরিধি বিস্তারের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে সংযু
রা হয়েছিল সাভারের ধামরাইয়ে স্থাপিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ১০০০ কিলোওয়
ধ্যম তরঙ্গের ট্রান্সমিটার। এই ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারে
নুষ্ঠানকে বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চল ছাড়াও ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চিন স
ভিন্ন দেশে পৌঁছে দেয়া সম্ভবপর হয়েছে। চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বেতার কে
া কিলোওয়াট ট্রান্সমিটারের পরিবর্তে স্থাপন করা হয়েছে ১০০ কিলোওয়
ডিয়াম ওয়েভের ট্রান্সমিটার। বর্তমানে বাংলাদেশ বেতারে মিডিয়াম ওয়ে
ন্সমিটারের সংখ্যা ১৫টি, শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটারের সংখ্যা ৪টি এবং এফ এ
ন্সমিটারের সংখ্যা ১৪টি। বাংলাদেশ বেতার তার ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপ
সিলেট কেন্দ্র এবং ঠাকুরগাঁও (দশ কিলেওয়াট), রাংগামাটি (দশ কিলোওয়াট
রিশাল (দশ কিলোওয়াট) এবং বগুড়া (১০০ কিলোওয়াট), কক্সবাজার (দ
লোওয়াট), কুমিল্লা (দশ কিলোওয়াট), বান্দরবন (দশ কিলোওয়াট) প্রেরণ কেন্দ্রে
ধ্যমে প্রতিদিন গড়ে ১৭৪ ঘন্টার বিনোদন, তথ্য ও শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচ
ছে। কুমিল্লা এবং বান্দরবন কেন্দ্র এখনও টেস্ট পর্যায়ে। বগুড়া কেন্দ্র রাজশা
তারের অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। সার্বিক অনুষ্ঠানের ৫৫% সংগীত এবং ৪৫
চনিক। এছাড়া বাংলাদেশ বেতারের দু'টি এফ এম ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে বিবিসি
য়স অব আমেরিকা প্রতিদিন বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার করছে।

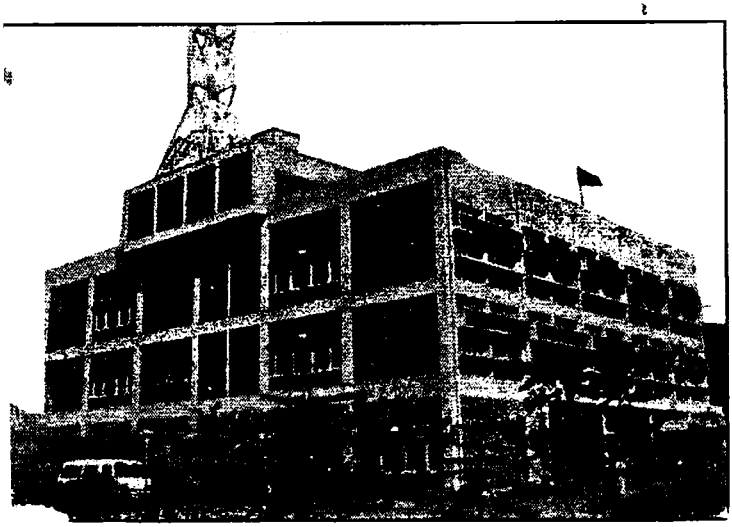

আগারগাঁও জাতীয় বেতার ভবন

বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা কেন্দ্র ১৯৮৩ সালের ৩০ জুলাই শাহবাগ এলাকার ভবন ছেড়ে শেরেবাংলা নগরের আগারগাঁও'র বর্তমান অত্যাধুনিক ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছিল। বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রের স্টুডিও সংখ্যা ১৫টি। এর মধ্যে ন'টি আগারগাঁও জাতীয় বেতারভবনে, ছ'টি রয়েছে শাহবাগে পুরনো বেতার ভবনে। এছাড়া জাতীয় বেতার ভবনে একটি অডিটোরিয়ামও রয়েছে। বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্রের স্টুডিওর সংখ্যা বর্তমানে ৫২টি।

বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার ব্যবস্থা এখনও মূলত: এ এম অর্থাৎ এমপ্লিচুড মডুলেশন পদ্ধতির এবং সীমিতভাবে এফ. এম অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন পদ্ধতিও আছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর বেতার অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে ডিজিটাল সিস্টেমের প্রযুক্তিতে। সেই প্রযুক্তি থেকে বাংলাদেশ বেতার এখনও অনেক দূরে।

বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানমালার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আবহাওয়া বার্তা, রেডিও ম্যাগাজিন (দর্পণ, উত্তরণ, মহানগর), সংগীতানুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠান, কথিকা, আলোচনা, ধর্মীয় ও বার্ষিকী অনুষ্ঠান, সাহিত্যানুষ্ঠান, প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য, শরীর চর্চা ও খেলাধুলা বিষয়ক অনুষ্ঠান। এছাড়া রয়েছে বিশেষ শ্রোতা গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্বেষা, যুবকণ্ঠ (ছাত্র ও যুব সমাজের জন্য অনুষ্ঠান), কলকাকলি (ছোটদের জন্য অনুষ্ঠান), শিক্ষার্থীদের আসর, প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষার আসর, আমার দেশ (গ্রামীণ শ্রোতাদের অনুষ্ঠান), অঙ্গনা (মহিলাদের আসর) এবং সৈনিকদের জন্য অনুষ্ঠান "দূর্বার" এবং গারো উপজাতীয়দের জন্য "সালগিত্তাল"। দৈনন্দিন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রচারিত হয়ে থাকে সংবাদ প্রবাহ অনুষ্ঠান।

কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম থেকে প্রচারিত হয় "দেশ আমার মাটি আমার", "সোনালী ফসল" এবং "কৃষি সমাচার" জনসংখ্যা পরিকল্পনা সেল থেকে সাধারণ শ্রোতা গোষ্ঠীর জন্য পরিবার পরিকল্পনা বিষয় অনুষ্ঠান "সুখী সংসার" এবং "সুখের ঠিকানা"।

ঢাকা কেন্দ্র ছাড়াও বেতারের অন্যান্য কেন্দ্র স্ব-স্ব অঞ্চলের গ্রাম ও শহরের শ্রোতাদের জন্য তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিজস্ব সংগীতানুষ্ঠান, নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠান, শিশু ও মহিলাদের অনুষ্ঠান, বাণিজ্যিক কার্যক্রমের বিজ্ঞাপন তরঙ্গ অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। এসব অনুষ্ঠানমালার পাশাপাশি লক্ষ্যীভূত শ্রোতাদের জন্য আঞ্চলিক বিষয় পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে চাকমা, মুরং, মারমা, রাখাইনদের জন্য পাহাড়িকা ও রাজশাহী কেন্দ্রে সাঁওতালদের জন্যে মাদল অনুষ্ঠান, রংপুর বেতার কেন্দ্র থেকে সাঁওতালদের জন্য মহুয়া অনুষ্ঠান, সিলেট বেতার কেন্দ্র থেকে মনিপুরীদের জন্য মৃদঙ্গ অনুষ্ঠান এবং ঢাকা বেতার কেন্দ্র

থেকে গারো উপজাতীয়দের জন্য সালগিত্তাল অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়ে থাকে। এছাড়া রাঙামাটি কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে পাহাড়ি বিভিন্ন জনগোষ্ঠি ব্যাপকভাবে অংশগ্রহন করে থাকে। বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা এবং সকল জাতি গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করাই হল এই সকল অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। প্রতিটি অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ বেতার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিবেদিত। সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ বেতারের প্রতিটি কেন্দ্র জনগণকে নানারূপ তথ্য দিয়ে সেবা প্রদান করে উৎসাহিত করে থাকে বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যায়, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য চাষে, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে এবং পরিবেশ রক্ষায়। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে সন্ত্রাস দমনে, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়, চোরাচালান দমনে, মাদকাশক্তি প্রতিরোধে, সমবায়-এর মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনে গ্রামীণ উন্নয়নে বিদ্যুতের ব্যবহারে, কুটির শিল্পের প্রসারে, দেশীয় সম্পদ ও দেশীয় পণ্য ব্যবহারে ও শিল্প উন্নয়নে। সারা বিশ্ব এখন নারী ও শিশুদের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার। বাংলাদেশ বেতার ইউনিসেফের সহযোগিতায় বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের কল্যাণে তাদের ভাগ্য উন্নয়নে নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে নারী ও শিশুদের শিক্ষা, নারীদের উপার্জনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ, দায়িত্বশীল পিতৃমাতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারী পুরুষের সমাজে সম দায়িত্বে সমভাবে অংশগ্রহণ, সমাজে নারী ও শিশুদের অধিকার, শিশুদের টিকাদান, শিশুদের স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধ। বাংলাদেশ বেতার তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সরকারি দফতর হলেও সকল মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র, সকল জনগোষ্ঠীর সাহায্য সেবক। নিঃস্বার্থে সেবার মনোভাব নিয়ে এই গণমাধ্যম থেকে বিনোদনের পাশাপাশি শিল্পের প্রসার, কলে-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, শ্রমিকের কল্যাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, রুগ্ন শিল্পের পুনরুদ্ধার, বেকারত্ব মোচন, রফতানি বাণিজ্যের প্রসার, পোষাক শিল্পের উন্নয়ন, ভূমিহীনদের জন্য সরকারি কার্যক্রম, জনশক্তি রফতানি ও উন্নয়ন, কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন, পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়ে থাকে। ঝড়ঝঞ্জায়, বন্যায়, জলোচ্ছ্বাসে প্রতিটি বিপদের মুহূর্তে বাংলাদেশ বেতার সব সময়েই জনগণের বিপদের বন্ধু হিসেবে পরিগণিত। কেননা ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের প্রলয় সম্পর্কে আগাম বিপদ সংকেত এবং নিরাপদ আশ্রয় ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে আগাম পরামর্শ একমাত্র বাংলাদেশ বেতারের পক্ষেই অতি দ্রুত প্রচার সম্ভব হয়ে থাকে।

সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাবে বেতার কর্মীরা বাংলার মুক্ত আকাশে মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা না পেলেও সীমিত সাধ্যে চেষ্টা করেছেন বেতারের মাইক্রোফোনকে স্টুডিও'র ঘেরাটোপ থেকে মুক্তাঙ্গনে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে। নিরলস প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে তারা বেশ কিছু মুক্তাঙ্গন অনুষ্ঠান সাধারণ শ্রোতা-দর্শকদের উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন। এগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হলো, ১৯৭২-'৭৩

সালে বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী কেন্দ্র আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী দু'টি নাট্যোৎসব। ১৯৭৩ সালে ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী জাতীয় লোকসংগীত উৎসব। ১৯৭৪ সালে রাজশাহী কেন্দ্র আয়োজিত তিনদিনব্যাপী লোককৃষ্টি উৎসব। ১৯৭৫ সালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের উপস্থিতিতে আয়োজিত জাতীয় লোকসংগীত ও উচ্চাঙ্গ সংগীত সপ্তাহ। ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম কেন্দ্র আয়োজিত চারদিনব্যাপী সংগীত সম্মেলন। ১৯৭৭ সালের ২৬ এপ্রিল থেকে পাঁচদিন নাট্য উৎসব উপলক্ষে রংপুর টাউন হল থেকে রংপুর কেন্দ্র সরাসরি নাটক প্রচার। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম কেন্দ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন তৎপরতা ও উপজাতীয় আঞ্চলিক সংস্কৃতি শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরার নিমিত্তে রাঙ্গামটি থেকে "গিরিস্পন্দন" শীর্ষক অনুষ্ঠান সরাসরি প্রচার। এক কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার সহ "রাঙ্গামাটি সম্প্রচার কেন্দ্রে"র উদ্বোধনী উপলক্ষে দর্শকদের উপস্থিতিতে বিশেষ অনুষ্ঠান "পাহাড়িকা" রাঙ্গামাটি থেকে চাট্টগ্রাম কেন্দ্র সরাসরি প্রচার করে ১৯৭৮ সালের ২৭ নভেম্বর।

১৯৭৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ঢাকা কেন্দ্রের স্টুডিও'র বাইরে বেতার ভবন প্রাঙ্গণে উদ্বোধন করা হয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিশেষ অনুষ্ঠান "কলকাকলি '৭৮"। ১৯৭৮-এর ৩১ ডিসেম্বর রংপুর টাউন হল থেকে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান "সবুজ মেলা '৭৮" সরাসরি প্রচার করে রংপুর কেন্দ্র। ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৯৭৭ সালে দেশাত্মবোধক গান রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৯৭৮ সালে নাট্য রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

"রেডিও মিটস্ মাসেস" নীতির আওতায় ঢাকা কেন্দ্র স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো ঢাকার বাইরে ময়মনসিংহ, টাংগাইল, ফরিদপুর ও কুমিল্লা থেকে সরাসরি অনুষ্ঠান প্রচারের পরিকল্পনা নেয়। সেই অনুযায়ী ১৯৭৯ সালের ১১ নভেম্বর ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিল্পীদের সমন্বয়ে ময়মনসিংহ পাবলিক হল থেকে আড়াই ঘন্টাব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান "শাল তমালের গান" প্রচার করে।

১৯৭৯ সালে ঢাকা কেন্দ্র তার চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী মুক্তাঙ্গন অনুষ্ঠান এবং ১৯৮৯ সালে ঢাকা বেতারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করে।

১৯৯৫-এর জুলাই মাসে দ্বিতীয় সার্ক রেডিও ও কুইজ দর্শকদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ বেতার এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে বেতার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

১৯৯৬ সালের ১৭ মে বাংলাদেশ বেতার খুলনা বিপুল সংখ্যক দর্শকদের উপস্থিতিতে মংলা বন্দরের অয়্যার হাউজ থেকে সুন্দরবনের সম্পদ, সংগ্রামী জন-মানুষের কথা ও কাহিনী নিয়ে "সুন্দরবন" গীতি আলেখ্য প্রচার করে।

১৯৯৯ সালের ১৪ ডিসেম্বরে শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস স্মরণ উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতার ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে বিপূল সংখ্যক দর্শকদের উপস্থিতিতে শহীদ পরিবারদের স্মৃতি চারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। হৃদয়স্পর্শী স্মৃতি চারণ শেষে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অকুতোভয় এক মুক্তিযোদ্ধার আত্মদানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ নাটক "বধ্যভূমিতে শেষ দৃশ্য" মঞ্চে অভিনীত ও প্রচারিত হয়।

এ ছাড়াও ২০০১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের প্রযোজনায় সুসং দুর্গাপুরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আরজ আলীর জীবন ভিত্তিক "বিজয় গাথা আরজ আলী সব বাউলের একতারাতে" নাটকটি সুসং দুর্গাপুর কলেজ প্রাঙ্গন মঞ্চে সহস্রাধিক দর্শকদের উপস্থিতিতে অভিনীত ও প্রচারিত হয়।

দীর্ঘকাল পর বাংলাদেশ বেতার ঢাকার উদ্যোগে ২০০৫ সালের ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে দু'দিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য লোকগীতি উৎসবের আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বরেন্য লোক সংগীত শিল্পীগণ এই লোকগীতি উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন এবং ঐতিহ্যবাহী লোক সংগীত, লোকনৃত্য পরিবেশন করেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ বেতার জাতীয় ফুটবল, ক্রিকেট, হকি খেলার ধারা বিবরণী স্টেডিয়াম থেকে নিয়মিতভাবে সরাসরি প্রচার ছাড়াও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিদেশে যে সকল স্থানে বাংলাদেশের ফুটবল বা ক্রিকেট টিম অংশ নিয়েছে সে সকল খেলার ধারাবিবরণী খেলাস্থল থেকে সরাসরি বাংলাদেশ প্রচার করে শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা চলতি ২০০৫ সালের ২৬ মে থেকে রেডিও ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করেছে। রাস্তায় যানবাহন শৃঙ্খলার সাথে পরিচালনা, ট্রাফিক আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে গণসচেতনতা সৃষ্টি এই ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রমের লক্ষ্য। এই সম্প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে ঢাকা শহরের বিভিন্ন যানবাহনের মালিক, আরোহী, চালক ও পথচারীদের দু'টি নির্দিষ্ট সময় রেডিওর মাধ্যমে (এফ এম ১০৩.২০ মেগাহার্টজ) নগরের যানবাহন চলাচল, ট্রাফিক আইন, যানজট পরিস্থিতি, ট্রাফিক সিগনালিং, গাড়ি চালানোর সতর্কতা ও চলাচলের নিয়মকানুন সম্পর্কে আগাম তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বেলা এগারোটা এবং বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত প্রচার করা

হচ্ছে। তবে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য বেতারে যে সকল সুযোগ সুবিধা বা লজিস্টিক সাপোর্ট প্রয়োজন তা ছাড়াই প্রায় শূন্য অবস্থা থেকেই বাংলাদেশ বেতারকে এই অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করতে হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি শুভ উদ্যোগ। তবে অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে গনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি ঢাকা শহরের সকল রাস্তাঘাটের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আরও বেশি সংখ্যক ফ্লাইওভার ও বিকল্প রাস্তা নির্মাণ প্রয়োজন। অন্যথায় যানজটের বর্তমান দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভ এবং ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জন দুষ্কর হয়ে পড়বে বলে অনুমিত হয়।

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

অন্যান্য সরকারি দফতরের মতো বাংলাদেশ বেতার একটি রাজস্ব আয়করী প্রতিষ্ঠানও বটে। বাংলাদেশ বেতারের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন তরঙ্গ অনুষ্ঠান বিপুল সংখ্যক শ্রোতার প্রিয়। ঢাকা বেতারের বাণিজ্যিক কার্যক্রম দৈনিক গড়ে দশ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। বিজ্ঞাপন প্রচার বাবদ বার্ষিক আয় প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট কেন্দ্র থেকে পৃথকভাবে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে। এই সকল কেন্দ্রের বার্ষিক আয় প্রায় আড়াই কোটি টাকা।

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচিতি, মর্যাদাসম্পন্ন ভাবমূর্তি তুলে ধরার প্রয়াসে বাংলাদেশ বেতারের বহির্বিশ্ব কার্যক্রম প্রতিদিন আরবি, উর্দু, হিন্দি, নেপালি, ইংরেজি ও বাংলা এই ছ'টি ভাষায় ন'টি অধিবেশনের মাধ্যমে সংবাদ সহ বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। ১৯৮৪ সালে ঢাকার কবিরপুরে স্থাপিত দু'টি ২৫০ কিলোওয়াট শর্টওয়েভ এবং একটি ১০০ কিলোওয়াট শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটারের সাহায্যে প্রেরিত অনুষ্ঠানসমূহ পশ্চিম ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, আফ্রিকার কোনও-কোনও এলাকায় এবং বিশেষ গ্লোবাল এরিয়েলের মাধ্যমে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, এমনকি আমেরিকা ও কানাডা'র পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল থেকে শোনা যায়। বাংলা অনুষ্ঠান সাধারণত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্যই প্রচারিত হয়ে থাকে।

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস বাংলাদেশ বেতারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট। এই ইউনিটের রয়েছে নিজস্ব ছয়টি স্টুডিও, আধুনিক প্রযুক্তির স্বয়ং-সম্পূর্ণ রেকর্ডিং

ব্যবস্থা এবং অনুষ্ঠান সংরক্ষণ ভান্ডার। ইউনিটের কাজ হচ্ছে কেন্দ্রীয়ভাবে বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের অনুষ্ঠান উৎপাদন, গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সংরক্ষণ এবং দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের পরিচিতি ও প্রতিনিধিত্বমূলক অনুষ্ঠান সরবরাহ। এর সুসংগঠিত টেপ লাইব্রেরিতে বর্তমানে প্রায় ৩৩ হাজার ঐতিহ্যবাহী লোকগীতি ও আঞ্চলিক গান সংগৃহীত ও সংরক্ষিত রয়েছে। আরও সংরক্ষিত রয়েছে বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রপ্রধানের ভাষণ, সাউন্ড এফেক্টস এবং যন্ত্রসংগীত।

আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা

এশিয়া প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ বেতার প্রতি বছরই এশিয়ান ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন এর লোকগীতি উৎসব সহ আন্তর্জাতিক এ বি ইউ বেতার অনুষ্ঠান পুরস্কার প্রতিযোগিতা, হোসো বাংকা ফাউন্ডেশন প্রতিযোগিতা, জাপান প্রাইজ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে আসছে। আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠান প্রযোজনায় বাংলাদেশ বেতার সবসময়েই কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছে। বাংলাদেশ বেতার প্রযোজিত যেসকল অনুষ্ঠান আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছে তা হচ্ছে ঃ

অনুষ্ঠানের শিরোনাম	প্রযোজক	পুরস্কার পরিচিতি	বছর
মাটির গান	প্রযোজনা ঃ আবদুর রউফ গ্রন্থনা ঃ ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	প্রথম পুরস্কার ঃ এশিয়া প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন হোসো বাংকা ফাউন্ডেশন রেডিও প্রাইজ।	১৯৮২
ছ'টি পাখির গল্প	প্রযোজনা ঃ ফিরোজ ইসলাম রচনা ঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল	বিশেষ পুরস্কার ঃ এশিয়া প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন প্রাইজ (শিশুদের জন্য)	১৯৮২
ব্যাঙের গাথা	রচনা ও প্রযোজনা ঃ কাজী মাহমুদুর রহমান	এ. আই. বি. ডি. এবং আই. ডি. আর. সি আন্তর্জাতিক পুরস্কার।	১৯৮৪
জল রঙের গান	প্রযোজনা ঃ নবিদুর রহমান গ্রন্থনা ঃ আবিদ আজাদ	প্রথম পুরস্কার ঃ এশিয়া প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন হোসো বাংকা ফাউন্ডেশন রেডিও প্রাইজ।	১৯৮৫

অনুষ্ঠানের শিরোনাম	প্রযোজক	পুরস্কার পরিচিতি	বছর
গৌরবময় সোনারগাঁ	প্রযোজনা ঃ শামীমা খান গ্রন্থনা ঃ লুৎফে জাহান খান চৌধুরী	বিশেষ পুরস্কার ১৫তম জাপান প্রাইজ প্রতিযোগিতা।	১৯৮৫
রূপালি নদীর দেশ	প্রযোজনা ঃ দিলরুবা খানম গ্রন্থনা ঃ লুৎফে জাহান খান চৌধুরী	প্রথম পুরস্কার ঃ এশিয়া প্যাসিফিক ব্রডকাস্টিং ইউনিয়ন প্রাইজ (শিশুদের জন্য)।	১৯৮৬
চির সবুজের আহ্বান	প্রযোজনা ঃ রফিকুল হাসান, গ্রন্থনা ঃ ড. বেগম জাহান আরা	বিশেষ পুরস্কার ঃ ১৬তম জাপান প্রাইজ প্রতিযোগিতা	১৯৮৭
প্যানোরমা	প্রযোজনা ঃ মোবারক হোসেন খান গ্রন্থনা ঃ জাহিদুল হক	দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ এ বি ইউ রেডিও প্রাইজ	১৯৮৯
বিবাহ বন্ধন	প্রযোজনা ঃ সিরাজুল হক চৌধুরী	প্রথম পুরস্কার ঃ এ বি ইউ এক্সটারনাল প্রাইজ	১৯৯৫
পানির দেশে পানি সঙ্কট	প্রযোজনা ঃ এস এম আবুল হোসেন	এবিইউ পুরস্কার	২০০০
অনুষ্ঠানের শিরোনাম	**প্রযোজক**	**পুরস্কার পরিচিতি**	**বছর**
জাতির ভবিষ্যত নিরাপদ মাতৃত্ব (সেভ মাদার)	প্রযোজনা ঃ শেখ রেফাত আলী	সিবিএ এলিজাবেথ আর অ্যাওয়ার্ড	২০০০
ইনোভেশন ইন ব্রডকাস্টিং ম্যানেজমেন্ট	প্রযোজনা ঃ ফারোহা সোহরাওয়ার্দি	সিবিএ রোলস রয়েস পুরস্কার	২০০১
আর্সেনিক ফ্রি ওয়াটার ইজ নেসেসারি	প্রযোজনা ঃ মোহাম্মদ শামসুল হক	এ বি ইউ পুরস্কার	২০০২

নাটক

পাকিস্তানি আমলে দেশি-বিদেশি সাহিত্যিকদের কিছু কিছু ব্যতিক্রমী নাটক ছাড়া অধিকাংশ বেতার নাটকই ছিল সনাতনী প্রথার। তা হয়তো কখনও সামাজিক, কখনও লোক সাহিত্য নির্ভর, কখনও বা মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, শৌর্য-বীর্যের ধারক। ১৯৬৮ সাল থেকে বেতার নাটকের গতিধারা গণমুখী হতে শুরু করে এবং সমাজ জীবনের আশা-আকাঙ্খা, দুঃখ-আনন্দের বাস্তবতা নিয়ে ভিন্নধর্মী আঙ্গিকে বেতার নাটক প্রযোজনা ও পরিবেশনার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। ১৯৭১ এর মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের সময় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ রচিত 'এবারের সংগ্রাম' নাটক প্রচার করে দুঃসাহসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এরপর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কল্যাণমিত্র রচিত হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক ধারাবাহিক নাটক "জল্লাদের দরবার" ছিল সেই সময়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যতিক্রমধর্মী নাটক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে সময়ের অধিকাংশ নাটকই রচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে।

নাট্যকার কাজী জাকির হাসান সম্পাদিত "বেতার নাটক ঃ বিবর্তনের ধারা" (প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ২০০৩) গ্রন্থটিতে ঢাকা সহ অন্যান্য সকল বেতার কেন্দ্রের বেতার নাটকের সূচনা, গতিপ্রকৃতি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে (১৯৩৯–২০০২) বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। নানাবিধ কারণে তথ্য সমূহ পূর্ণাঙ্গ না হলেও ভবিষ্যৎ গবেষণা কল্পে এই গ্রন্থটি মূল্যবান সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হবে বলে আশা করা যায়। বেতার নাটকের ইতিহাস প্রসঙ্গে কাজী জাকির হাসান উল্লেখিত গ্রন্থের সূচনাপত্রে লিখেছেন :

".....১৯৩৯-১৯৪৭ সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সুষ্ঠু নাট্যচর্চার অনুকূলে ছিল না। বিশেষ করে বেতার নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিষয়গত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তৎকালীন কিছু কর্মকর্তা ও নাট্যকারের সাহসী পদক্ষেপে বিনোদনের পাশাপাশি স্বাধীনতাকামী মানুষের আকাঙ্খা তাৎক্ষণিক পূরণ করতে সমর্থ হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই উপমহাদেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে রচিত হয়েছিলো ১৯২৮ সালে চট্টগ্রামের অত্যাচারি জেলা প্রশাসক ডেভিড হত্যাকারী স্বাধীনতা সংগ্রামী কাজী বজলুর রহমান, ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অগ্রনায়ক মাষ্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসিতে আত্মত্যাগের কাহিনী সম্বলিত ঐতিহাসিক নাটক। প্রচারিত হয়েছে টিপু সুলতান, সিরাজউদ্দৌলা, মীর কাসিম, তিতুমীর, মজনু শাহের (নবাব নূরউদ্দিন মোহাম্মদ বাকের জঙ্গ) মত বীরযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধার' পাশাপাশি প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'কালের কপোল

তলে' তারাশঙ্করের 'দীপান্তর, পথের ডাক' নাজির আহমেদের ' চেঙ্গিস খান' ইত্যাদি। বেনিয়া শাসনের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণাধীন সত্ত্বেও তখনকার বেতার নাটক রাজনৈতিক বিপ্লব, আমাদের জীবন সংগ্রামের সূত্র-উৎস ও প্রকৃত মানব কল্যাণকামী হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। ১৯৫১ পর্যন্ত এই ধারা অক্ষুন্ন থাকে এবং উত্তরোত্তর তা শৈল্পিক আঙ্গিকে বিকাশ লাভ করে।

.....২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রঞ্জিত হলো ঢাকার রাজপথ সালাম, বরকত, সফিউরের খুনে। স্বাধীন দেশের মাটিতে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলো এদেশের প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহকরা। স্বাধীন চিন্তা-চেতনার বিকাশ ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রিত হতে লাগলো। এই নিয়ন্ত্রণ যারা মেনে নিতে পারলেন না তারা বিদায় নিলেন নিরবে। এই সময়ে তথাকথিত প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার অনেকেই রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে গেলেন অনুপ্রবেশকারী সংস্কৃতির আগ্রাসনের কবল থেকে পাকিস্তানি স্টাইলের সংস্কৃতিকে সুসংহত করার তাগিদে। সূচিত হলো রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক কলংকিত অধ্যায়।

বাঙালি জাতিসত্তার তথা আমাদের রাজনীতি ও সাহিত্যে বায়ান্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই বিষয়ে প্রচুর কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখা হলেও একমাত্র মুনীর চৌধুরীর "কবর" নাটক ব্যতিত জানামতে ৭১ পূর্ব ভাষা আন্দোলনের উপর দ্বিতীয় কোন নাটক লেখা হয়নি। তাও এই নাটকটি ঢাকা কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার পূর্বে প্রচার করা সম্ভব হয়নি।

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে পরিচিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, স্বাধীনতা যুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মনোবল ও প্রেরণা যোগাতে যে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রচার করতো তার মধ্যে কল্যাণ মিত্র রচিত "জল্লাদের দরবার" নাটকটি আমাদের বেতার নাটকের ক্ষেত্রে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই নাটকটি একদিকে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিবেককে আঘাত করেছে অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা যুগিয়েছে বাংলার মানুষকে। নাট্যকারের অপূর্ব কাহিনী সৃষ্টি, শানিত সংলাপ এবং সার্থক চরিত্র চিত্রায়নই ছিল নাটকের উপস্থাপনার প্রধান সহায়ক। এটি একটি রাজনৈতিক ব্যাঙ্গাত্মক নাটক। নাটকের সামগ্রিক গুণগতমান নির্ণয়ে "জল্লাদের দরবার" কতটুকু শিল্প উত্তীর্ণ সে আলোচনায় না গিয়ে বলা যায় 'জল্লাদের দরবার' সময়ের চাহিদাকে পূরণ করেছে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাই 'জল্লাদের দরবার' নাটক মাইল ফলক হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকবে।

ন' মাস যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর' ১৯৭১ বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। বিজয় উল্লাস আর দেশ গড়ার দৃপ্ত শপথ নিয়ে যাত্রা শুরু হলো

নতুন জীবনের। বিজয়ী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের দায়িত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত করে ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি প্রচারিত হয় আশীষ কুমার লোহের লেখা নাটক "প্রথম পদক্ষেপ"।

নাটকে আবেগের প্লাবনে ভেসে গিয়েছিলো বিষয় নির্মাণ। কাহিনীতে ন'মাস যুদ্ধের কষ্ট ছিলো না-ছিলো শুধু জয়ের আনন্দ। মুক্তিযোদ্ধাদের শরীরের গন্ধের মতোই নাটকের সর্বাঙ্গ জুড়ে ছিল শুধু বারুদের গন্ধ। সেই সময়ে রচিত নাটকগুলোতে (বিশেষ করে ১৯৭২–১৯৭৩) বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছিলো প্রধানত যুদ্ধ জয়, হত্যা, লুণ্ঠন এবং হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর কর্তৃক নারী নির্যাতনের বীভৎস চিত্র। ছিলো কারণে-অকারণে গোলা-গুলির ব্যবহার একটা নেশার মতো। প্রায় নাটকই ছিলো শিল্পমান বিবর্জিত এবং অনভিজ্ঞ হাতের লেখা। অবশ্য এই ধারাটি স্তিমিত হয়ে আসে ৭৩' এর শেষ দিকে। শুরু হয় অন্য আরেকটি ধারা, যে ধারার মধ্য দিয়েই সাধিত হয় প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা উত্তর বেতার নাটকে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

মৌলিক চিন্তা-চেতনায় রীতিমত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় বেতার নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে। নাটকের প্রয়োগ রীতি, শব্দ ও আবহসঙ্গীতের ব্যবহার, উপস্থাপনায় নতুনত্ব, বিষয় বিবেচনা সবকিছু মিলিয়ে সূচিত হলো একটি নতুন অধ্যায়। সনাতনি প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন। যে আন্দোলনের জন্য সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছিলো আমাদের নব জীবনবাদী নাট্যকর্মীরা। আমাদের নাট্যকর্মীরা অস্ত্র ফেলে তুলে নিল হাতে কলম-অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। প্রতিবাদ জানাল তারা তথাকথিত সমাজপতি ও সুবিধাভোগী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে। প্রচন্ড ক্ষোভে ফেটে পড়ল তারা বর্ণচোরদের বিরুদ্ধে। এসময় রচিত হলো দিক চিহ্নহীন, প্রেক্ষিত ঃ শাহজাহান ও একাল, অশ্রুত গান্ধার, রক্তের আঙ্গুর লতা, বর্ণচোরা, রাজা অনুস্বরের পালা, কি চাহ শঙ্খচিল ইত্যাদি নাটক। উঠে আসতে লাগলো কাহিনীতে একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক চেতনা, মুক্তিযোদ্ধাদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতার চিত্র। এমনি এক ভয়ঙ্কর চিত্র ফুটে উঠলো "ফলাফল নিম্নচাপ" নাটকে।

মৌলিক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের বরেণ্য নাট্যকার, সাহিত্যিকদের ভাষান্তর, বেতার নাট্যরূপ আমাদের বেতার নাটককে করেছে সমৃদ্ধ। এছাড়াও সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর রচিত যেমন যৌতুক প্রথা, মনিষীদের জীবন ভিত্তিক নাটকও প্রচারিত হয়েছে। প্রচারিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যাত্রা।"

'বেতার নাটক ঃ বিবর্তনের ধারা' গ্রন্থে ঢাকা বেতারে প্রচারিত নাটকের নিম্নরূপ পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	প্রচার সময়	প্রচারিত নাটকের সংখ্যা	সর্বমোট সংখ্যা
০১.	১৯৩৯ (১৬ ও ৩১ ডিসেম্বর)	০০২	–
০২.	১৯৪০–১৯৪৭ (বাংলা ও উর্দু মিলে)	৩৭৮	–
০৩.	১৯৪৭–১৯৭১	১,৩০০	–
০৪.	১৯৭২–১৯৯৪	২,৩৯২	–
০৫.	১৯৯৫–২০০২	১,০১৬	৫,০৮৮টি

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে গত ৩৪ বছর ধরে যে সকল কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকারের নাটক, কাব্যনাটক, ছোটো গল্প অবলম্বনে নাটক আমাদের বেতার নাটককে জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ করেছে তারা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, কবি জসীম উদ্দীন, কবি বন্দে আলী মিয়া, কবি ফররুখ আহমেদ, মুনির চৌধুরী, কবির চৌধুরী, নূরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, কবি হাবিবুর রহমান, সায়ীদ সিদ্দিকী, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, ফতেহ লোহানী, আলী মনসুর, আশরাফ-উজ-জামান, নাজমুল আলম, কাজী মকবুল হোসেন, জহির রায়হান, আতিকুল হক চৌধুরী, আনিস চৌধুরী, মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, মবজুলুল হোসেন মিজরাব, আহমেদ-উজ-জামান, আব্দুল্লাহ আল মামুন, জিয়া হায়দার, রশিদ হায়দার, আমিনুল হক, হাসনাত আব্দুল হাই, কল্যাণমিত্র, আ.ন.ম বজলুর রশিদ, সেলিম আল-দীন, সেলিনা হোসেন, হুমায়ূন আহমেদ, মামুনুর রশিদ, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, কাজী জাকির হাসান, শফিকুল কবির, আব্দুস সাত্তার, মুশতারি শফী, মকবুলা মঞ্জুর, রাবেয়া খাতুন, রাজিয়া মজিদ, মাকিদ হায়দার, জুবাইদা গুলশান আরা, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ ইউসুফ ইমাম, আশীষ কুমার লোহ, ড. ইনামুল হক, বদরুন্নেসা আব্দুল্লাহ, লাকী ইনাম, শাহান আরা পারভীন, বেগম মমতাজ হোসেন, শেখ আকরাম আলী, এহসান চৌধুরী, সৈয়দ সিদ্দিক হোসেন, মনিরুল ইসলাম বাদল, শামসুদ্দোহা মাহমুদ, মুহাম্মদ শাহ আলমগীর, ফজলুল করিম, শহীদুল হক খান, আবিদ আজাদ, নাসরিন মুস্তাফা, ফাল্গুনী হামিদ, আব্দুল মুত্তালিব, রবিউল আলম, মোস্তফা মোহাম্মদ আব্দুর রব, সিরাজউদ্দিন আহমেদ, মোজাম্মেল হোসাইন খান, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিদ্যুৎ কর, অচিন্ত্যকুমার ভৌমিক, কাজী মাহমুদুর রহমান প্রমুখ।

হাসনাত আব্দুল হাইয়ের 'সিসিফাসের একদিন' বেতার নাটকে (সামনের সারিতে বাঁ দিক থেকে) গোলাম মুস্তাফা, সাদিয়া চৌধুরী, ফেরদৌসী মজুমদার, রাশিদুল হাসান বিরু ও প্রযোজক, পরিচালক কাজী মাহমুদুর রহমান। (পিছনে বাঁ দিকে) প্রযোজনা সহকারী গোলাম হাক্কানী এবং (সর্ব ডাইনে) সহকারী পরিচালক বাহরাম সিদ্দিকী।

প্রতি সপ্তাহে একটি করে নাটক প্রচার করতে হলে একটি কেন্দ্রের মাসে ৪টি এবং বছরে গড়ে ৫২টি নাটকের প্রয়োজন হয়। এই বিপুল সংখ্যক নাটক বা নাট্যকার বাস্তবত কখনই পাওয়া সম্ভব নয়। তাই নাট্য প্রযোজকদের কিছু নতুন, কিছু পুনঃ প্রচার অথবা পুরনো পাণ্ডুলিপি পুনঃ প্রযোজনা করে নাটকের স্লট পূরণ করতে হয়। বেতার নাটকের মান উন্নয়নে ভালো পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নাট্য প্রতিভা অন্বেষণে উৎসাহব্যাঞ্জক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। বেতার নাটকের ভালো পাণ্ডুলিপি পাবার আশায় ১৯৫৬ সালে ঢাকায় বেতার নাটক পাণ্ডুলিপি রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৭ সালের মে মাসে এই প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

বিচারকমন্ডলীর বিচারে প্রথম পুরস্কার পান সৈয়দ মকসুদ আলী, তাঁর লেখা 'আলাদীনের প্রদীপ' নাটকের জন্য এবং দ্বিতীয় পুরস্কার পান নাট্যকার হরলাল রায় তাঁর 'নাট্য নিকেতন' নাটকের জন্য। বিচারক মন্ডলীতে ছিলেন, বাংলা একাডেমীর তৎকালীন ডিরেক্টর প্রবীণ শিক্ষাবিদ ড. এনামুল হক, দৈনিক আজাদ সম্পাদক জনাব

আবুল কালাম শামসুদ্দিন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা কেন্দ্রে নাট্য সপ্তাহ উদযাপিত হয় তাতে এ দু'টি নাটক প্রচারিত হয়। নাট্য সপ্তাহের প্রথম নাটক 'দেওয়ানা মদিনা' স্টুডিওর বাইরে একটি মঞ্চে অভিনীত হয় ১৯৫৮ সালের ৭ আগষ্ট এবং তা সরাসরি বেতারে সম্প্রচারিত হয়। 'দেওয়ানা মদিনার' নাট্যরূপ দেন আসকার ইবনে শাইখ এবং পরিচালনা করেন আশরাফ-উজ-জামান খান। ৮ আগষ্ট প্রচারিত হয় সৈয়দ মকসুদ আলী রচিত 'আলাদীনের প্রদীপ', প্রযোজনা করেন নাজমুল আলম। ৯ আগষ্ট প্রচারিত হয় ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যা বিনোদের 'আলিবাবা'। এর সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়ে ছিলেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু, নাটকটি প্রযোজনা করেন রণেন কুশারী। ১০ আগষ্ট প্রচারিত হয় নাট্যকার হরলাল রায়ের 'নাট্য নিকেতন' প্রযোজনা করেন শরফুল আলম। ১১ আগষ্ট প্রচারিত হয় নাটক সৈয়দ ইমতিয়াজ আলী তাজের 'আনারকলি', প্রযোজন করেন কলিমউল্লাহ। ১২ আগষ্ট প্রচারিত হয় সেকস্‌পিয়ারের 'হ্যামলেট' এর বেতার নাট্যরূপ। বেতার নাট্যরূপ ও পরিচালনায় ছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের ক্লড কলডিন। এরপর ১৯৭৭ সালে আবার বেতার নাটক পান্ডুলিপি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রথম পুরস্কার পান আবদুল মুত্তালিব তাঁর 'জলোচ্ছ্বাস' নাটকের জন্য। এতে বিচারক মন্ডলীতে ছিলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, খান আতাউর রহমান, সৈয়দ হাসান ইমাম, রণেন কুশারী ও নাজমুল আলম। শেষ পান্ডুলিপি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে। এতে বিচারক মন্ডলীতে ছিলেন সভাপতি, সাইফুল বারী, সদস্য, সাঈদ আহমদ, রণেন কুশারী, নাজমুল আলম, আতিকুল হক চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল মামুন ও কাজী মাহমুদুর রহমান। ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ঢাকার রিয়াজুল ইসলাম মিলন (নাটক 'কুমারীর মন')। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন সিলেটের নাসরীন চৌধুরী (নাটক 'নিভৃত যতনে') এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন নোয়াখালীর মোজাম্মেল হুসেইন (নাটক 'ওরা আছে বলেই')।

তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান আমলে স্টুডিওর বাইরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জেলা শহরের খোলা মঞ্চে বিশেষ বেতার অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। তাতে নাটকও পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খুলনা থেকে প্রচারিত 'সুন্দরী' ১৯৬০ সালের ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর স্থানীয় করনোশান হল থেকে দু'দিনের এই অনুষ্ঠান ঢাকা কেন্দ্র থেকে জাতীয় অনুষ্ঠানে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। গ্রন্থনায় ছিলেন জিয়া হায়দার, সঙ্গীত পরিচালনায় সমর দাস। নৃত্য পরিচালনায় গহর জামিল, প্রযোজনায় আশরাফ-উজ-জামান খান ও নাজমুল আলম। অনুরূপভাবে চট্টগ্রাম থেকে ১৯৬০ সালের ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর প্রচারিত হয় 'কর্ণফুলী'। এর সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন আবদুল আহাদ, সার্বিক প্রাযোজনায় ছিলেন আমিরুজ্জামান খান, নাজমুল আলম ও

শরফুল আলম। অনুরূপভাবে সিলেট কেন্দ্র থেকেও 'সুরমা' নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। স্টুডিওর বাইরে ঢাকা ষ্টেডিয়ামে প্রায় চল্লিশ হাজার দর্শকের সামনে ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে মঞ্চায়িত হয় জসীম উদ্দীনের 'বেদের মেয়ে' গীতি নৃত্য নাট্য এবং তা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। এর সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রণেন কুশারী ও নাজমুল আলম। কলকাতার ষ্টেটসম্যান পত্রিকা এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করে।

চট্টগ্রাম বেতারের উদ্যোগে ১৯৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে বহিরাঙ্গন মঞ্চে নাট্য সপ্তাহ উদযাপিত হয়েছিল। সাতদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে সাতটি নাটক বিপুল সংখ্যক দর্শকদের উপস্থিতিতে প্রদর্শিত হয়েছিল। এবং চট্টগ্রাম বেতার সরাসরি তা প্রচার করেছিল। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন জনাব আবুল ফজল। সার্বিক প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন মাহবুব হাসান। পরবর্তীকালে খুলনা ও সিলেট কেন্দ্রেও এ ধরনের নাট্য সপ্তাহ উদযাপিত হয়েছিল।

ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রে অসংখ্য বেতার নাটক পরিবেশিত হয়ে থাকে। এইসব অঞ্চলের বিশিষ্ট নাট্যকার ও নাট্য প্রযোজকের একটি তালিকা এখানে দেয়া হল।

চট্টগ্রাম কেন্দ্র ঃ নাট্য প্রযোজক, মাহবুব হাসান, এ কে, এম আসাদুজ্জামান, গোলাম মোস্তাফা, নাট্যকার সুচরিত চৌধুরী, জিয়া হায়দার, চৌধুরী জহুরুল হক, রবিউল আলম ও মুশতারি শফী।

রাজশাহী কেন্দ্র ঃ নাট্য প্রযোজক,—আবুল খায়ের মুহম্মদ সাঈদ, মুহম্মদ ফজলুল হক, আবুল হাসান সাঈদ ও তোফাজ্জল হোসেন। নাট্যকার,—হাসান আজিজুল হক, নাজিম মাহমুদ, মোস্তাফা মুহম্মদ আবদুর রব ও মোহাম্মদ ফজলুল হক।

খুলনা কেন্দ্র ঃ নাট্য প্রযোজক, এস, এম সানোয়ার হোসেন, শামসুদ্দীন আহমেদ, আবুল হোসেন ফকীর, আব্দুস সবুর খান চৌধুরী ও মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। নাট্যকার অসিতবরণ ঘোষ, অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক, এস, এম. সারোয়ার হোসেন, মুহম্মদ জাকারিয়া, বিমল মজুমদার, আব্দুল মান্নান, সুকান্ত সরকার, কামরুন্নাহার মুন্নী, রমা পাল, শেখ আফজাল হোসেন, কামরুজ্জামান লিটন, হাজারী লাল নাগ।

রংপুর কেন্দ্র ঃ নাট্য প্রযোজক, ডাক্তার আশুতোষ দত্ত, এম, এ হাদি, শামসুজ্জোহা বাবলু ও খোন্দকার আবুল মাহমুদ। নাট্যকার, আবদুল মোত্তালেব, মানস সেনগুপ্ত ও ডাক্তার আশুতোষ দত্ত।

সিলেট কেন্দ্র ঃ নাট্য প্রযোজক, শিবু ভট্টাচার্য ও আনোয়ার মাহমুদ। নাট্যকার বিদ্যুৎকর, রুহুল আজাদ চৌধুরী ও সরদার মমতাজ উদ্দীন।

ঢাকা বেতারের কিছু উল্লেখযোগ্য বেতার নাটক ও নাট্যকার (১৯৩৯-২০০৫)

নাট্যকার	নাটক
বুদ্ধদেব বসু	কাঠ-ঠোকরা (ঢাকা বেতারের প্রথম নাটক)।
সুদেব বোস	মিলির বিয়ে।
প্রভাত মুখোপাধ্যায়	কালের কপোল তলে।
সুধীর সরকার	দুয়ে দুয়ে পাঁচ।
শামসুর রহমান	চাঁদের আলো।
কবি জসিম উদ্দীন	বেদের মেয়ে, মধুমালা, পল্লী বধু, পদ্মাপার, সোজন বাদিয়ার ঘাট।
কাজী এমদাদুল হক	আব্দুল্লাহ।
বন্দে আলী মিয়া	চাঁপাফুল, কুমারের গল্প।
আবুল ফজল	চৌচির, রাহু, প্রগতি।
কবি শাহাদৎ হোসেন	আনারকলি, মসনদের মোহ্, অভিসার।
তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়	দুই পুরুষ, কালিন্দী, পথের ডাক, রাইকমল, দ্বীপান্তর।
ডা. বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়	ল্যাঠা, অবাস্তব, কাবা, অন্তরীক্ষ।
মাহবুবুল আলম	আবহাওয়া, তাজিয়া।
পরিমল রায়	সন্ত্রাস রাজা।
কবি ফররুখ আহমদ	নৌফেল ও হাতেম, দিওয়ানা, তৈমুর লং।
নুরুল মোমেন	নেমেসিস, অশরীরী, রূপান্তর, আলোছায়া, দুটি সুরে একই গান।
মোহাম্মদ কাশেম	শতাব্দীর আলো, সোহ্রাব রুস্তম, মনসুর ডাকাত, যারা কাঁদে (ধারাবাহিক)।
কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস	প্রতিবাদী, নটির প্রেম।
মুনীর চৌধুরী	কবর, রক্তাক্ত প্রান্তর, দণ্ড ও দণ্ডধর, মহারাজ, জমা খরচ ইজা।
সায়ীদ সিদ্দিকী	মুক্তধারা, দারাশিকো, শহীদে কারবালা, নির্জন।
সিকান্দর আবু জাফর	মহাকবি আলাওল, সিরাজ-উদ্দৌলা।
জহির রায়হান	আরেক ফাল্গুন, হাজার বছর ধরে, বরফ গলা নদী।
মোহাম্মদ নেজামতুল্লাহ	সিরাজ-উদ্দৌলা।

নাট্যকার	নাটক
নাজির আহমেদ	চেংগিস খান।
মোজাম্মেল হক	হাতেম তাই, জোহরা, টিপু সুলতান।
ফতেহ লোহানী	সাগর দোলা, নিভৃত সংলাপ, বিলাপে বিলীন, দূর থেকে কাছে।
কবি হাবিবুর রহমান	বিপরীত বৃত্তে, এই মোহনায়, নাগ-কেশর, ঈদের চাঁদ, সন্ধ্যামণি, তোমার পতাকা যারে দাও।
সুনীল চন্দ্র দাস	ভবিষ্যতের জন্য, বেদুইন।
আ ন ম বজলুর রশীদ	মেহের নিগার, রক্তের রং নীল।
মঞ্জুলা অধিকারী	যুদ্ধ প্রলয় জল্লাদের কল্যাণ।
কবি আহসান হাবীব	অরণ্য নীলিমা ও ছায়ানীড়।
কাজী মকবুল হোসেন	সরাইখানা, মেঘদূত, লতা কাঞ্চন, মাসুম আলী মেহের জান, হীরামতি পঞ্চ কন্যা, সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী।
সৈয়দ মোহাম্মদ শাজাহান	প্রিয়জন।
আজিম উদ্দীন আহমেদ	মহুয়া।
মোঃ আশরাফ আলী	খনি।
কমলা দত্ত	ফাগুয়া।
দুর্গেশ চন্দ্র দত্ত	শ্রমিক জীবন।
কে. এম. ওয়াহিদুল্লাহ	পূর্ণাবৃত্তি।
কিউ. এইচ. এম কামালুদ্দিন	ওমরখৈয়াম।
আশরাফ-উজ-জামান খান	নতুন বাড়ি, গ্রাণ্ড ফাদার ক্লক, বিস্মৃত বিলাপ, সমুদ্রের সীমানায়, বিধি লিপি, সমুদ্র, অভিনয় নয়, একটি আপেলের কাহিনী, আকাশ অনেক উঁচু, স্মরণ সংঘ, যার যেমন দাবি।
আসকার ইবনে শাইখ	বিদ্রোহী পদ্মা, বাঁশের কেল্লা, প্রতিধ্বনি, সূর্য-মুখী, পদক্ষেপ, আগ্নেয়গিরি, ফকির লালন শাহ, শেষ অধ্যায়, কর্ডোভার আগে, প্রচ্ছদপট, রাজপুত্র, সাগরের ঢেউ, বকুল গন্ধ ভোরে, শেষ রাতের ডাক গাড়ি, অশান্ত বায়ু, আলো অনির্বান, শান্তির পথে।
আশরাফ সিদ্দিকী	গলির ধারের ছেলেটি।
ওবায়দুল হক	সূর্যের ঠিকানা
মহিউদ্দিন আহমদ	রাতের পাহাড়।
রণেন কুশারী	মুখোশ, মুক্তি, পিশাচ শিল্পী।
দেলোয়ার হোসেন	দীপ তবু জ্বলে।

নাট্যকার	নাটক
আবু ইসহাক	সূর্য দীঘল বাড়ী, প্রতিষেধক।
নাজমুল আলম	সারেং, আগুন, নায়ক, খুন, ফুলমতি, অথচ পবিত্র, মরা মানুষের পাঠশালা, উপরে উঠার সিঁড়ি, একটি অচল আনি, মোরগ, পাণ্ডুলিপি ও গয়নার বাক্স, শকুন, এলো ফিরে, নিরুক্ত, ধুতুরা ফুল, অলৌকিক, ধুপি পিঠা, কোঁচ, ফুল্লরা অপেরা, উপস্থিত সুধী মণ্ডলী, খাগড়াই, হিসাবের শেষ পাতা, মল্লার, সার্টিফিকেট, আঁধারে আলো (সিরিজ নাটক), আগামী দিন (সিরিজ নাটক), যাব কি যাব না, নিজের বাড়ি, সনাক্ত।
ম. ন. মুস্তফা	সবই ভুল।
নুরুন্নাহার	জঙ্গলের মেয়ে।
আনিস চৌধুরী	অ্যালবাম, মানচিত্র, বলাকা, অনেক দূর, যেখানে সূর্য, যখন সুরভী।
সৈয়দ শামসুল হক	নুরুলদীনের সারা জীবন, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়।
মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ	সাগর থেকে এলাম, ঝরা পাতা, এবারের সংগ্রাম, ফলাফল নিম্নচাপ, রাজা অনুস্বারের পালা, কি চাহ শংখ চিল, বর্ণচোরা, স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা, প্রতিদ্বন্দ্বী, হৃদয় ঘটিত ব্যাপার স্যাপার, যামিনীর শেষ সংলাপ, পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ, চয়ন তোমার ভালবাসা, বিবাহ, তখন মধুমাস, দহন, বিবাহবৃত্তান্ত, একী লজ্জা, কেউ নেই, জমিদার দর্পন, যোগাযোগ, রাক্ষুসী, দৃষ্টি, সকালের সুখ দুঃখ।
আতিকুল হক চৌধুরী	নেপথ্যের নায়িকা, নিঝুম দ্বীপের সন্ধানে, কেন্দ্র বিন্দু, দূরবীন দিয়ে দেখুন, যদিও কালো ধোঁয়া, জুলেখার ঘর, জলের রং-এ লেখা, ঢাকার আকাশে অনেক রাত, সূর্য দীঘল বাড়ী, (নাট্যরূপ) শেষের কবিতা (নাট্যরূপ) দেবদাস (নাট্যরূপ)।
আবদুল্লাহ্ আল মামুন	মেক আপ, শাহজাদীর কালো নেকাব, সুবচন নির্বাসনে, ক্রস রোডে ক্রস ফায়ার, জীবন বারে বারে আসে, কুমুর নিজের জীবন, আয়নায় বন্ধুর মুখ, রাজার গাড়ি আসে, আকাশের রং কালো, ঘুম, কোকিলারা।
মামুনুর রশীদ	ইটের পর ইট, আপন ঠিকানা।

নাট্যকার	নাটক
আলী মনসুর	হায়দার আলী, অন্তরাল, নিশাবসান, ফিরে চলো আপন ঘরে ও কালো দীঘির গাঁ।
গোলাম রব্বানী খান	নেকলেস, হীরের হার।
ফরিদ উদ্দীন আহমেদ	রাভী থেকে রূপসা, পথের সাথী।
ড. ইনামুল হক	নির্জন সৈকতে, দেয়াল, চোখের বাহিরে, প্রতিধ্বনি প্রতিদিন, সুদূরে দিগন্ত, শ্রাবণে বসন্ত, না বলা কথা, সেই সব দিনগুলো, রবি ও আমরা, হঠাৎ দেখা।
ফররুখ শিয়র	সামনের পৃথিবী, ব্লাক মার্কেট, শান্তির নীড়, ঝড় যখন উঠলো।
সেলিম আলদীন	রক্তের আঙুর লতা, অশ্রুতগান্ধার, নীল শয়তান, তাহিতি ইত্যাদি, যৈবতী কন্যার মন।
জোবেদা খানম	অগ্নিশিখা, কালো মেঘ, ওরে বিহংগ, পাষাণের কান্না, ঝড়ের স্বাক্ষর, আমি যে সূর্যমুখী।
হরলাল রায়	নাট্য নিকেতন।
হুমায়ূন খান	তাজমহল, সুলতান মাহমুদ।
নীলিমা ইব্রাহিম	স্মৃতি দুয়ারে, খেলা ঘর, যে অরণ্যে আলো নেই।
শামসুদ্দীন আবুল কালাম	কাশবনের কন্যা।
সুচরিত চৌধুরী	সুতরাং।
হুমায়ুন আহমেদ	শংখনীল কারাগার, সৌরভ, নন্দিত নরকে, কল্যাণীয়েষু, আমার আছে জল, প্রথম প্রহর।
মবজুলুল হোসেন (মিজরাব)	প্রান্তরের পারে, রাজা সাহেব, কালো গোলাপ, নেপথ্য নাটক, রূপসী বাংলা, মোনালিসা আমার।
কল্যাণ মিত্র	সূর্যমহল, পলাতকা, পাথর বাড়ি, অজগর, দায়ী কে, জল্লাদের দরবার, একটি জাতি একটি ইতিহাস।
সৈয়দ মকসুদ আলী	আলাদীনের প্রদীপ।
খান আতাউর রহমান	মেহেদীর রং।
আব্দুল হক	অদ্বিতীয়া, কবি ফেরদৌসী।
আব্দুর রহমান	সুখের অপর নাম, সেই দিন।
আলাউদ্দিন আল আজাদ	নরকে লাল গোলাপ, জোয়ার থেকে বলছি, নিঃশব্দে যাত্রা, হিজল কাঠের নৌকা, জ্যোৎস্নার ভিতরে।

নাট্যকার	নাটক
আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী	নাম না জানা ভোর।
রাজিয়া মাহবুব	ভয়, অভিনয়।
আবু জোহা নূর মোহাম্মদ	গাজী সালাহউদ্দীন।
মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	জন্মদিন।
মোহাম্মদ নূরুল্লাহ	সংঘাত।
দৌলতুন্নেসা খাতুন	বধূর লাগিয়া।
রাবেয়া খাতুন	যে নায়িকা নয়, বলাকা মন।
মোহাম্মদ রওশন আলী	আক্কেল সেলামী, কলা বনাম কয়লা, গোধূলির শেষ সংলাপ, বাদলবিধূর রাতে, একটি গল্পের মৃত্যু, ক্ষুধার আবর্তে পৃথিবী, মেবারবিজয়, শের আফগান।
এনায়েত মওলা	গ্রন্থি, ইতিহাস, সন্ধ্যা পাড়ের রূপ কথা, ঘটকালী।
সৈয়দ মহম্মদ শাজাহান	প্রিয়জন।
সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন	তমিস্রা, মুখর অতীত, আমীর সওদাগর, রক্ত সন্ধ্যা, সিংহাসন, শেষ নেই, উত্তরণ।
জিয়া হায়দার	শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ, পংকজবিভাস-১৯৯৫, সাদা গোলাপে আগুন, বৃষ্টি এলে পরে।
আমজাদ হোসেন	এই যে দুনিয়া-কিসের লাগিয়া, দু'পয়সার আলতা, নদী ও মানুষ, বাত্তি নাই কব্বরে।
সাদেকীন	মন ও মানুষ, প্রবাল দ্বীপের মৃত্যু, মুক্তি।
মাহবুব তালুকদার	ঘোড়ার গাড়ী।
আমিনুল হক	শিকারী, সংকল্প, আলমগীর, আনারকলি, কর্তব্য।
রশীদ হায়দার	তৈল সংকট, বসন্তে আষাঢ়ের মেঘ, অন্য ভূবন।
কাজী মাহমুদুর রহমান	স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নের ঘর, বাজী, রাজা, জ্যোৎস্নায় নিষিদ্ধ সংলাপ, আজ মৃগয়া, অংগার, শেষ বিকেলের গান, একটি নাটকের জন্ম।
আহমদ-উজ-জামান	নিঃসঙ্গ এ যাত্রা পথে, তরঙ্গ উদ্বেল, এইদিন প্রতিদিন, আরণ্যক, নেশা, ফিরে এসো।
রাজিয়া মজিদ	ভ্রান্তি লগ্ন, দোলা।
হাসনাত আব্দুল হাই	সামনে যাই থাক ট্রেন চলবেই, সিসিফাসের একদিন।

নাট্যকার	নাটক
সেলিনা হোসেন	গাংগে ডুবা সুরুজ, হাংগর নদী গ্রেনেড (সিরিজ)।
লায়লা সামাদ	বসন্তে ফেরা।
নাজমা জেসমীন চৌধুরী	শেষ পরিচয়, সাগর থেকে ফেরা, অংগীকার।
দিলারা হাশেম	ত্রিবর্ণ ও তৈলচিত্র।
আব্দুল্লাহ ইউসুফ ইমাম	দীর্ঘশ্বাস, বণ্য ব্যথা, মারিয়া আমার মারিয়া, নায়িকার জন্য, বাংকার, করিমন ছমিরন।
শহীদুল হক খান	আঁধারে আলোর বন্যা, সমুদ্রের স্বাদ, বন্ধ দুয়ার, শেষ থেকে শুরু, তোমাদের জন্য ভালবাসা।
জালাল উদ্দিন রুমী	সংগ্রামী বাংলা, লিপির শেষ লিপি, নিখোঁজ সংবাদ।
আল মনসুর	একদা এক দুঃস্বপ্নে, অনেকজনের একজন।
সৈয়দ সিদ্দিক হোসেন	ওভারকোট, নিরংকিত পথ, পরগাছা।
হেমায়েত হোসেন	অনন্ত অন্বেষা, আরশীনগর।
আশরাফুল আলম	গ্রাম ও শহরের গল্প, পুরনো পথের রেখা।
মোখলেছা খাতুন	মনের নোংগর নেই, প্রেম এক নীল আকাশ, অসমাপ্ত কাহিনী, অব্যক্ত বেদনা, রুপোর হার।
মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান	নট।
কাজী জাকির হাসান	হীরের আংটি, খেয়া ঘাটের মাঝি, প্রতীক্ষা, কি পেলাম, পাষাণ অতিথি, সুরের পাখি, ধূলির মেঘ, জাল, পুতুল নাচের কাহিনী, রাজায় রাজায়, প্রেক্ষিত শাহজাহান ও একাল, সুরের পিপাসা, অরণ্য কাঁদে, বিবর্ণ ইতিকথা, মধুমন্তী কথা, কূহক, একটি অপ্রকাশিত কাব্য, উত্তর পুরুষ, প্রাকৃতিক চোখ।
আশীষ কুমার লোহ	একটি ছোট্ট জিজ্ঞাসা, ভবের নাট্যশালায়, নিজগুণে ক্ষমা করবেন, শেষ মিলন, মানসিক।
সুলতান আহমেদ	গোধূলীর সুর।
আব্দুন নূর	নির্জন সূর্য, অন্বেষা।
কবীর আনোয়ার	পাথরের চোখ, মেক আপ, ছায়া অনুক্ষণ।
আবিদ আজাদ	মানুষ ও কৃষ্ণ চূড়ার গল্প, যদিও দূরের পথ, পথ বেঁধে দেই, করাত, বন তরুদের মর্মর, অন্তপারের জ্যোৎস্না, একটি লাল রুমালের জন্য, ভোর বেলা, কালো কোকিলের স্বরগ্রাম।

নাট্যকার	নাটক
তা. ম. আসাদুজ্জামান	কেন এমন হয়, কিন্তু কেন, বক্ষ জোড়া মাটি, অভিমান, দুয়ে দুয়ে চার, এক নদী রক্ত, জল্লাদের পতন, ফাগুনের সংলাপ।
মাহবুব হাসান	উপল উপকূলে।
মুস্তাফিজুর রহমান	ম্যাসাকার, ক্যালিগুলা, নিঃশব্দ নরকে, যে নদী এখনো কাঁদে।
শামসুল ইসলাম	জলপরী, শাড়ি।
আব্দুল লতিফ	রাত্রি শেষ।
খান জয়নুল	পিনিস।
কবির আনোয়ার	পাথরের চোখ, মেকআপ, ছায়া অনুক্ষণ।
মোস্তফা আনোয়ার	কোনও ডাকঘর নেই।
দিলারা জামান	অনেক আঁধার একটি তারা।
এহসান চৌধুরী	আমি খুনী হবো না, মন নামক শত্রু, অপরাজিতা, রুমার্গের হত্যাকাণ্ড, রোকেয়ার নিজের বাড়ি।
জুবাইদা গুলশান আরা	প্রত্যাশিত রমনীর মুখ, প্রতিদিন, সূর্যোদয়, মধ্য রাতের বাতাস, মানব মানবী, আঁধারে নক্ষত্র জ্বলে।
জিয়া আনসারী	আগর বাতির ধোঁয়া, মোহনায় ভোর নামে, কিছু দিনের খেলা, দুঃখে দুঃখে দু'জনা, জল্লাদের ফাঁসি, স্বপ্নের জানালা।
লাকী ইনাম	নির্জন প্রহর, নিঃশব্দে নীরবে, রেশমী সুতার টান, একটি বিশ্বাসের জন্য, কাপুরুষ, এ লগনে অনুক্ষন।
টি, এইচ, শিকদার	অন্য ফালগুন।
ফালগুনী হামিদ	অনামিকা, দূরের সমুদ্র, সেই দিনগুলি, অন্য রকম।
চৌধুরী জহরুল হক	কল্পিত কল্পনা, জ্বীন, শাড়ীর রঙে রং।
মকবুলা মঞ্জুর	অচেনা নক্ষত্র, ভিজে মেঘের দুপুর, নীল কণ্ঠি, নদীর নাম ফুলজোড়, আঁধার পেরিয়ে, সূর্য প্রহরী, কাঁচ কাটা হীরে, করুণ ধারায় এসো, বৈশাখের শীর্ণ নদী, মাটির মা।
ফখরুজ্জামান চৌধুরী	টাকা আনা পাই, পরাণ সখা।

নাট্যকার	নাটক
হাবিব আহসান	মনে রবে কিনা রবে, যাওয়া আসা পথের ধারে, এক বিকেলের দুঃখ।
আব্দুস সাত্তার	ঢেউয়ের পর ঢেউ, সখের রাজা, দু টাকার আইস ক্রীম, নদীর অনেক নাম, ভূঁইয়া প্রিন্টিং প্রেস।
মাকিদ হায়দার	আয়নায় পৃথিবী, মুমুর নিজস্ব নিয়মে, স্বরবর্ণ।
শফিকুল কবির	আগ্নেয় গিরি, জীবন ও নাটক, নোনা পানির ঢেউ।
কালিপদ দাস	প্রতিশোধ, ওমর খৈয়াম, পলাশীর পরে, চাঁদ সুলতানা।
মনিরুল ইসলাম বাদল	নাটক নিয়ে নাটক, যখন জেনেছি, নতুন আলোকে, একটি মন একটি আশা, এক মিনিট নীরবতা, ফুলজান, মেঘলা ভাংগা রোদ, নায়িকা।
মোস্তফা মোঃ আব্দুর রব	নাদির শাহ, সূর্যের চোখে জল, অন্ধকার তৃষ্ণা, প্রভাতে সন্ধ্যার গান, এ আলো সূর্যকে নয়, হারমাসিস।
রফিকুল ইসলাম	বিদ্রোহী বুল বুল, চোখের পানি।
আব্দুল মতিন	সকাল সাতটার ট্রেন, ইনসাফ, ক্যানসার।
জহুরুল ইসলাম	কখন আসবে তুমি, সাংবাদিক, রক্তমাখা আংটি।
বেগম মমতাজ হোসেন	পিছল পথ, ফাটা দেয়াল প্রত্যাশা, আম্র মুকুলের ঘ্রান, দাদুমণি, জীবনের রং (সিরিজ), বিনি সুতোর বন্ধন, শোধ, শেষ বিকেলের প্রান্তে।
সিরাজ উদ্দীন আহমেদ	সমুদ্র কাছে নয়, শেষ রোববার, আমরা আলোর অভিযাত্রী, ট্রেন।
রবিউল আলম	সমাপ্তি অন্য রকম, কখনও সৈকতে, জননীর মৃত্যু চাই, এক যে ছিল দুই হুজুর, কাঙ্ক্ষিত একজন।
হুমায়ুন খান	তাজমহল, সুলতান মাহমুদ।
ফরিদ আলী	কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
আব্দুল মোমেন	জীবন মানেই তৃষ্ণা।
মোঃ তোহা খান	কলমদীঘি, দুখাই চম্পার কেচ্ছা।
আজমেরি জামান	যন্ত্রণার ফুল।
হাবিবুল হাসান	বারবার রোববার।
আকরাম হোসেন	ঘুণ পোকার গল্প, হে সংসার হে লতা।

নাট্যকার	নাটক
মানিক জামান	বিধ্বস্ত যন্ত্রণা।
রফিকুল হক	নিধুয়া পাথার কাঁদে।
জামান আক্তার	ভাঙন, একদিন বসন্তে।
অরুণ চৌধুরী	কালো গোলাপের কাব্য, এক জীবনে।
ফয়েজ আহমেদ	শাস্তি।
জহির চৌধুরী	ফুল ঝরা রাত।
নেয়ামুল ওয়াকিল	জীবন বৃত্তি।
মহিউদ্দীন আহমেদ	রাতের পাহাড়।
দেলোয়ার হোসেন	দীপ তবু জ্বলে।
আবুল কালাম	বুনিয়াদ।
শাহান আরা পারভীন	পরান বন্ধুয়া, সিন্ধু বিজয়, রবিবার, উদয় অস্ত, কালো নেকাব, ডাক হরকরা।
শামসুদ্দোহা মাহমুদ	বিবর্ণ বসন্ত, পূর্ণিমার প্রয়াস, স্বপ্নের ঘর, সোনালি সুখের স্বাদ, বনেদী বাড়ি ও শিল্পীর গল্প, জ্বালা, ক্রান্তি, সুন্দর ভোর এবং একটি বিশ্বস্ত লাইটার, সিঁদুর, ক্রমশ অন্তরালে।
রাজীব হুমায়ুন	নীল পানিয়া, যুদ্ধ নিরন্তর।
বিপ্রদাস বড়ুয়া	দাবাড়ে বা শ্বেত হস্তী, ভালবাসার দুই কদম।
মতলুব আলী	কক্ষপথের বাসিন্দা, জ্যোৎস্না রাতের কুয়াসা, সূর্যপারুলদের দিনক্ষণ, অন্ধকারে একা।
ফজলুল করিম	কষ্টি পাথর, জীবনের কালো রং, শেষ দেখা, নুপুর নিককন, প্রতিনিধি।
মজিবুর রহমান মঞ্জু	প্রত্যাশা, মুখোমুখি, আরশীতে সাদা চোখ, কৃষ্ণচূড়ার রং হলুদ।
মোস্তফা কামাল হোসেন	আঁধার আকাশ জুড়ি, অরণ্য হৃদয় বিশাল, অনন্ত নির্ঝর।
পুলক হাসান	উদ্বাস্ত আগুন, যাত্রা, সযতন নীরবতা, গাঙ পাড়ি।
রুহুল আজাদ চৌধুরী	চারণভূমি, উদাসী চাচার আখড়া, ঝিনুক তুলিয়া।
শরীফ রাজা	বেগুন ফুল।
আহমেদ মুসা	তাই তাদের ফিরে যাওয়া।
সরকার মমতাজ উদ্দীন	কালের ধারাপাত।
আব্দুল মুত্তালিব	জলোচ্ছ্বাস।

নাট্যকার	নাটক
রিয়াজুল ইসলাম মিলন	কুমারীর মন, জলছবি, বাদশা বেগম।
নাসরিন চৌধুরী	নিভৃত যতনে।
মোজাম্মেল হুসেইন	ওরা আছে বলেই, কাক জ্যোৎস্নার রাজ্যে, সৈনিক।
নাসরিন মুস্তাফা	অলৌকিক বৃক্ষ, কুটে কাহার, বকুল বিথিতে উৎসব।
নূর ই হাফজা	আমারই চেতনার রঙ, কেঁদে গেল দখিন হাওয়া।
সুধাময় কর	আনন্দ।
শফিউদ্দিন সরদার	লালপরী।
মাহমুদুল হোসেন	হেমন্তের দিন রাত্রি, ঘাস মাটির জীবন, খেলাঘর, এই জীবন অন্যজীবন।
মুহাম্মদ শাহ আলমগীর	ভরা জোয়ারের গাঙ, হাল ভেঙে যে নাবিক, প্রজন্ম প্রত্যয়, স্বাধীনতার নীল আকাশ, একটি ভালো বাসার গল্প, ভাঙনের খেলা, অনাগত সেইদিন, একবাড়ি দুই ঘর।
মিরণ মহিউদ্দিন	আগামী দিনের পালা।
প্রণব ভট্ট	আরও একটি প্রেমের গল্প।
জাহানারা আহমেদ	ন্যায়দণ্ড, প্রভাতের শুকতারা, অতিথি।
আফতাব আহমেদ	ভালোবাসার রঙধনু, আমাগোর বউ।
সৈয়দা শামীম আরা বেগম	নীল নির্জন নিলয়, প্রিয় আনন্দ প্রিয় বেদনা।
কামরুন্নাহার মুকুল	চেনাজন চেনামন, আনন্দের প্রান্ত জানালায়।
মহিউদ্দিন ছড়া	বিদেশি জামাই, লাবণী, কবি, রং নাম্বার।
সুশান্ত ঘোষাল	তীর্থ যাত্রা, একই বৃন্তে, সুরমা মেল।
রশিদ নিউটন	নগরে অনাগরিক, অন্তপারের যাত্রী।
মীর্জা সাখাওয়াত হোসেন	হৃদয় নামের নদী থেকে।
জাহিদ হোসেন বাবুল	জরুরি নিয়োগ।
দোলন রহমান	ঘূর্ণন।
তৃপ্তি চক্রবর্তী	বসন্তে গোলাপ।
ডা. সাইফুল আলম	ঝরাপাতা।
মিল্টন আশরাফ	প্রত্যাশার সীমান্তে।
মোহাম্মদ ইয়াসিন	বিকল্পে পথে, বিদগ্ধ ভালোবাসা।
শাজাহান কবির	যাত্রা যবনিকা।

নাট্যকার	নাটক
দেলওয়ার হোসেন দুলাল	নিঃশ্বাসে তুমি।
ড. মোহাম্মদ নাজমুল হুদা	অতিথি মেজবান, চির জনমের সাথী।
কাজী জাহানারা	সেতুবন্ধন।
এম এ মান্নান	অন্যদিনের প্রতিক্ষায়।
আশরার মাসুদ	নিছক প্রেম।
ফৌজিয়া হালিম অনু	অভিমানের বদলে।
লায়লা নাজনীন হারুন	ফুটলো যখন কেয়া।
ফজলুল হক	বয়স।
সোলাইমান খোকা	যোদ্ধা, সালোমি।
বিধুভূষণ চক্রবর্তী	জনৈক লেখকের মৃত্যু, জটায়ূ।
আলেয়া ফেরদৌসী	কাশবনের কন্যা, রেবেকা।
কবি মাহবুব হাসান	কবি।
রাধা মাধব বণিক	ইজারা, জহুরা আনন্দ আহলাদি কিসসা।
আফজাল হোসেন	কুশল ফেরেনি।
তন্ময় চৌধুরী	স্বপ্ন আহত।
মানস সেন গুপ্ত	থেটার বাবু।
খায়রুল বাসার	জীবন এখানে কোরাস গান।
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল	কাছে থেকেও দূরে, এইদিন সেইদিন।
মাহমুদুল হোসেন	এই নগরী এই অরণ্য, প্রজাপতি মানুষের মন।
সেলিম চৌধুরী	হয়তো দুঃস্বপ্ন, প্রত্যাশায় ক্যান্সার, ভুলের বালুচরে।
এস এম হুদা	এর নাম নাটক।
শরিফুল ইসলাম	ঘরে ফেরার পদশব্দ।
মুহসীনুল হাসান	ঢঙ্গী মেয়ে।
নরেশ ভূঁইয়া	যেখানে তারার আলো।
শুভংকর দাস	ফেরা।
খায়রুল আলম সবুজ	শ্বেত পারাবত।
আব্দুল হাই দুর্বার	এরফান বাওয়ালীর কবর।
সৈয়দ নাজাত হোসেন	সম্প্রতি।
মাহমুদ উল্লাহ	পাণ্ডুলিপির নেপথ্যে।
মোঃ তালেবর আলী	ঠিকানা।
তরুণ কান্তি রায়	একটি ভালোবাসার গল্প, উপবাসী মন, আপন বৃত্ত, হে আমার ভালোবাসা।

নাট্যকার	নাটক
সৈয়দ সহিদুল ইসলাম	গর্বিত সম্রাট।
মিজানুর রহমান	কাকাতুয়া।
কাজী আসাদ	সন্ধান, অভিনয়।
আশুতোষ দত্ত	হাসি, নেপেন দারোগার দায়ভার।
সরদার মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	অলৌকিক লোকালয়।
কাজী ইনসানুল হক	অথবা অরিন্দম।
কাজী সিরাজ	অতিক্রান্ত শরতে।
মুজিবর রহমান খান	ইশা খাঁ।
শফিকুল আলম	সোহেলী যেওনা।
আব্দুর রহমান	বনভোজন।
আমিনুল ইসলাম	অপরাজিত, রিটার্ন টু হাইফা।
এফ করিম	রায়, বাবুর্চি।
ভাস্কর তমিজ	মন বধূয়া কাঁদে।
বদরুন্নেসা আব্দুল্লাহ	নিরুত্তর, বরবর্নিনী।
আব্দুল মতিন খান	গিল গামেশ।
ওবায়দুর রহমান	মীর কাশিম।
আব্দুল কাদের	প্লেটনিক।
দিলওয়ার হাসান	ঘরে বাইরে।

* উল্লেখিত নাট্যকার এবং তাদের রচিত নাটকের তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয়। প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে অনেক নাট্যকার এবং নাটকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হলো না বলে দুঃখিত।

নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীদের মধ্যে অনেকেই আজ প্রয়াত। প্রয়াতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে নাট্যশিল্পীদের তালিকায় প্রয়াত ও জীবিত বিশিষ্ট শিল্পীদের নাম উল্লেখ করছি। এরা হচ্ছেন–রণেন কুশারী, কাজী খালেক, ফতেহ লোহানী, আলী মনসুর, ওবায়দুল হক সরকার, রবিউল হোসেন, ইনাম আহমেদ, এম. এ সামাদ, মোহাম্মদ জাকারিয়া, গোলাম মুস্তাফা, হাসান ইমাম, খলিলুল্লাহ খান, সাইফুদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, মুজিবর রহমান খান, অমলেন্দু বিশ্বাস, আমিনুল হক, মাসুদ আলী খান, কাজী আব্দুল ওয়াদুদ, আব্দুল মালেক খান, আশীষ কুমার লোহ, মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ, আবুল হায়াত, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সিরাজুল ইসলাম, সৈয়দ আহসান আলী সিডনী, মামুনুর রশিদ, অমল বোস, জামালুদ্দিন হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার এম. এ. কাশেম, মঞ্জুর হোসেন, আরিফুল হক,

আসাদুজ্জামান নূর, রাইসুল ইসলাম আসাদ, হুমায়ূন ফরিদী, পীযুষ বন্দোপাধ্যায়, আফজাল হোসেন, মাজহারুল ইসলাম, মুস্তাফা কামাল সৈয়দ, নাজমুল হুদা বাচ্চু, বুলবুল আহমেদ, আব্দুল আজিজ, আবুল বজল তুলিপ, আমিরুল হক চৌধুরী, আনিসুর রহমান আনিস, সৈয়দ সিদ্দিক হোসেন, এস. এম. মহসীন, ভাস্কর বন্দোপাধ্যায়, ফিরোজ ইফতেখার, ম. হামিদ, নওয়াজেশ আলী খান, রিয়াজুদ্দিন বাদশা, দেলুওয়ার হোসেন দিলু, শফি কামাল, ব্লাক আনোয়ার, চাঁদ প্রবাসী, ফরিদ আলী, সিরাজুল হক মন্টু, আব্দুল আলী লালু, আব্দুল কাদের, রামেন্দু মজুমদার, ড. ইনামুল হক, এ কে কোরেশী, রাজু আহমেদ, কাজী আলমগীর, জিয়াউল হুদা উজ্জ্বল, মনোজ সেনগুপ্ত, শামসুল আলম, শামসুল ইসলাম, ত. ম. আসাদুজ্জামান, আবু নওশের, শহীদুজ্জামান সেলিম, মাহবুবুর রহমান, রাশিদুর রহমান প্রধান প্রমুখ। মহিলা শিল্পীরা হচ্ছেন– মাধুরী চট্টোপ্যাধায়, সুমিতা দেবী, রানী সরকার, লিলি চৌধুরী, আজমেরি জামান, ফেরদৌসী মজুমদার, আয়েশা আখতার, জাহানারা আহমেদ, মাজেদা মল্লিক (শর্মিলী) ওয়াহিদা মল্লিক, নাজমা আনোয়ার, লাকি ইনাম, মিরানা জামান, দিলারা জামান, রওশন আরা হোসেন, আলেয়া ফেরদৌসী, দিলশাদ খানম, ডলি আনোয়ার, ফাল্গুনী হামিদ, সুবর্না মুস্তাফা, ডলি জহুর, নূর-ই-হাফজা, ডেইজী আজিজ, আফরোজা বানু, কাজী তামান্না, প্রজ্ঞা লাবনী, লুৎফুন্নাহার লতা, কেয়া চৌধুরী, রুবি আফরোজ, শিরীন বকুল, লায়লা হাসান, নাসিমা খান মজলিশ, বিপাশা হায়াত, কাজী তামান্না, তাহিরা দিল আফরোজ, রোজী সিদ্দিকী এবং আরও অনেকে।

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের পুরোনো আমলের কিছু গুণী শিল্পীর কথা মনে পড়ছে। এরা হচ্ছেন ডা. কামাল এ খান, ডা. শামসুল আজম, সি.এম. রোজারিও, মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ, শেখ মতিউর রহমান, সাদেক নবী, মাহবুব হাসান, সাদেক আলী, ইঞ্জিনিয়ার এম. এ. কাশেম, দানিউল হক, মলয় কর চৌধুরী আবু বকর সিদ্দিক, এহসানুল গনি, আসাদুজ্জামান, হাবিবুর রহমান জালাল, তন্দ্রা ইসলাম, রাশিদা গনি, মনোয়ারা বেগম, রেহানা বেগম, দিলরুবা আজম, খুরশিদা আজম, গীতাঘোষ, দিলারা আলো, মাসুদা নবী, সুরাইয়া বেগম, মায়া চক্রবর্তী প্রমুখ। বিশিষ্ট নাট্যকার অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের নাট্য জীবনের হাতেখড়ি স্বাধীনতা পূর্ব চট্টগ্রাম বেতারে। ১৯৬২ সালে তাঁর প্রথম লেখা বেতার নাটক 'সাগর থেকে এলাম' প্রচারিত হয় চট্টগ্রাম বেতারের প্রথম নাটক হিসাবে। তাঁর রচিত এবং মুস্তাফা আনোয়ার প্রযোজিত 'বর্ণচোরা' নাটকটি স্বাধীনতার পর ১৯৭২ এর ফেব্রুয়ারিতে (সম্ভবত) ঢাকা বেতারের প্রথম নাটক হিসাবে প্রচারিত হয় বলে তিনি জানান। এ নিয়ে অবশ্য দ্বিমত রয়েছে। রণেন কুশারী ১৯৮৯ সালে বেতার বাংলায় প্রকাশিত এক স্মৃতিচারণমূলক লেখায় উল্লেখ করেছেন যে তাঁর প্রযোজিত নাটক 'একটি জাতি একটি ইতিহাস' দেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকা বেতারে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল।

চট্টগ্রাম বেতারের ষাট দশকের সংগীত শিল্পীদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হচ্ছেন শিখা রানী দাস, অলকা দাস (কুমিল্লার) আরতি ধর (সিলেটের) বেলা ইসলাম, সোহেলি রহমান, রাজিয়া শহীদ, রোখসানা আহমেদ, হাসিনা হোসেন মমতাজ, কল্যাণী ঘোষ, শেফালী ঘোষ, দিলারা আলো, সালমা আহমেদ, রীতা বনিক, দিলরুবা আজম, জুলিয়া মান্নান, বেলা খান, এ. কে. মান্নান, রফিকুল ইসলাম, প্রবাল চৌধুরী, সৈয়দ আনোয়ার মুফতি, মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, মোঃ নাসিরুদ্দিন, নাসির আহমেদ, মিয়া মোঃ বদরদ্দিন, নাজমুল আবেদীন, শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব, মলয় ঘোষ দস্তিদার প্রমুখ। সংগীত পরিচালক ছিলেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, মোহনলাল দাস, আনোয়ার পারভেজ, এ. কে. মান্নান, সৈয়দ আনোয়ার মুফতি, হেনরি গিলবার্ট প্রমুখ। আঞ্চলিক গানে সুকণ্ঠী শেফালী ঘোষ ছিলেন সবচাইতে সম্ভাবনাময়। বিশিষ্ট গায়ক শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব এবং শেফালী ঘোষের "শ্যাম শেফালী সংগীত জুটি" পরবর্তী কালে তাঁদের ব্যতিক্রমধর্মী সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে দেশে বিদেশে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যান। শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব কিছুকাল আগে পরলোক গমন করেছেন।

ষাট দশক থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত যে সকল সংগীত শিল্পী রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের সংগীত বিভাগকে সমৃদ্ধ করার জন্যে অবদান রেখেছেন তাঁরা হচ্ছেন ওস্তাদ হরিপদ দাস, ওস্তাদ মোজাম্মেল হোসেন, আব্দুল আজিজ বাচ্চু, আব্দুল জব্বার, রবিউল হোসেন, আলতাফ হোসেন, এ এইচ এম রফিক, সারোয়ার জাহান, আব্দুল মালেক খান, জান্নাতুল ফেরদৌস, বিজয়া রায়, অনিমা রায়, মঞ্জুশ্রী রায়, ফারুক নাজ, ফরিদা পারভীন, ইফফাত আরা নার্গিস, মনোয়ারা বেগম, আফরোজা বেগম, রফিকুল আলম, এন্ড্রুকিশোর, আব্দুল খালেক, হাবিবুর রহমান, আবু জাফর, কাজী বাচ্চু, এম. এ. গফুর, মামুনুল হক, দেলওয়ার হোসেন, মকবুল হোসেন প্রমুখ। রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী হিসাবে বেতার নাটকে যাদের অবদান ও খ্যাতি তাঁরা হচ্ছেন তোফাজ্জেল হোসেন মল্লিক, নাসিরুদ্দিন আহমেদ, তালেবুর রহমান, আবুল হাসান মোঃ সাঈদ, বদিউল আলম ভুলু, রশিদ খান গজনভী, আব্দুল আজিজ, ফজলুল হক, গোলাম হাবিবুর রহমান মধু, নিয়াজ আহমেদ, আতাউর রহমান, আনোয়ারুল ইসলাম, মাজেদা মল্লিক (শর্মিলী) নূর-ই-হাফজা, জেবুন্নেসা জামান, শেরিনা সরকার, শেলিনা সরকার প্রমুখ।

ধারাভাষ্যকার

দেশ-বিদেশের খেলার মাঠ থেকে ক্রিকেট এবং ফুটবল প্রতিযোগিতার সজীব ধারাভাষ্য প্রচার বেতার অনুষ্ঠানের একটি অন্যতম জনপ্রিয় বিষয়, যারা ধারাভাষ্য দিয়ে খেলাকে শ্রোতাদের সামনে জীবন্ত আর উপভোগ্য করে তোলেন তাঁদের খ্যাতি নাট্য বা সংগীত শিল্পীদের তুলনায় কম নয়।

ঢাকা বেতারে ইংরেজি ধারাভাষ্যে জনপ্রিয় ছিলেন অধ্যাপক আতিকুজ্জামান খান, তৌফিক আজিজ খান, অধ্যাপক আব্দুল মোমেন চৌধুরী। বাংলা ধারাভাষ্যে মোহাম্মদ শাজাহান, আব্দুল হামিদ, বদরুল হুদা চৌধুরী এবং মঞ্জুর হাসান মিন্টু। পরবর্তীকালে এদের সঙ্গে যুক্ত হন আতাউল হক মল্লিক, মুসা আহমেদ, আলফাজ আহমেদ, খোদা বখশ মৃধা, শামিম আশরাফ চৌধুরী (ইংরেজি), মাহমুদুর রহমান (ইংরেজি) প্রমুখ।

আবৃত্তিকার

আবৃত্তিও বেতার অনুষ্ঠানের অন্যতম একটি আকর্ষণীয় বিষয়। পুরনো আমলের ঢাকা বেতারে বিশিষ্ট আবৃত্তিকার হিসাবে যারা সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন রণেন কুশারী, ফতেহ লোহানী, আলী মনসুর, কাফি খান, পাঠক মুজিবুর রহমান, ইকবাল বাহার চৌধুরী, গোলাম মুস্তাফা, হাসান ইমাম, সেলিনা বাহার চৌধুরী, খুরশেদী আলম, মাধুরী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। একালের বাংলাদেশ বেতারে আবৃত্তিকার হিসাবে যারা শ্রোতাদের প্রীতি অর্জন করেছেন তাঁরা হচ্ছেন আশরাফুল আলম, ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়, আসাদুজ্জামান নূর, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, কাজী আরিফ, শফি কামাল, শফিকুল ইসলাম বাহার, প্রজ্ঞা লাবনী, নাসিমা খান মজলিশ, নূর-ই-হাফজা, আঞ্জুমান আরা প্রমুখ।

সংগীত

বেতারের সংগীত ভুবনে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সংগীতে যারা স্বমর্যাদায় উচ্চাসীন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ আজ বেঁচে নেই। তবু ঐতিহাসিক প্রয়োজনে শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের নাম উল্লেখ করছি। এরা হচ্ছেন ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু, ওস্তাদ মুনশী রইস উদ্দীন, ওস্তাদ গুল মহম্মদ খান, ওস্তাদ ইউসুফ খান কোরেশী, ওস্তাদ বারীন মজুমদার, ওস্তাদ কাদের জামেরী, ওস্তাদ আখতার সাদমানী, ওস্তাদ পিসি গোমেজ, ওস্তাদ মিথুন দে, আভা আলম, ইলা মজুমদার, নিলুফার ইয়াসমীন প্রমুখ। বর্তমানে ঢাকা বেতার থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করে থাকেন ওস্তাদ ইয়াসিন খান, ইয়াকুব আলী খান, ওমর ফারুক খান, সালাউদ্দিন আহমেদ, নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী, সুমন চৌধুরী, ফেরদৌসী রহমান, অলকা দাস, রওশন আরা মুস্তাফিজ প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পী বৃন্দ।

উচ্চাঙ্গ বাদ্য যন্ত্রসংগীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতিমান ছিলেন ওস্তাদ আয়াত আলী খান। ঢাকা বেতারের সঙ্গে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এবং ওস্তাদ আয়াত আলী খানের সম্পর্কে শেকড়ের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। তাঁদের সুযোগ্য বংশধরেরাই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শিতার দ্বারা বেতারের সংগীত বিভাগের সকল শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শিতা ছাড়াও এরা সংগীত পরিচালক হিসাবেও তাঁরা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এরা হচ্ছেন, মীর কাশেম খান

খাদেম হোসেন খান, আবেদ হোসেন খান, মোবারক হোসেন খান (বেতারের পরিচালক এবং পরে শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক) রাজা হোসেন খান, শেখ সাদী খান। এরা ছাড়াও উচ্চাঙ্গ যন্ত্র সংগীতে খ্যাতিমান ওস্তাদ মতি মিয়া, আফজালুর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঢাকা বেতারে বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক হিসাবে যারা স্বনামধন্য তাঁরা হচ্ছেন আব্দুল আহাদ, সমর দাস, ধীর আলী মিয়া, আব্দুল লতিফ, আব্দুল হালিম চৌধুরী, ওস্তাদ কাদের জামেরী, দেবু ভট্টাচার্য, সত্য সাহা, খান আতাউর রহমান, খন্দকার নুরুল আলম, আজাদ রহমান, এ এইচ এম রফিক, সুবল দাস, সুজেয় শ্যাম, শেখ সাদী খান, আলাউদ্দিন মিয়া, আনোয়ার পারভেজ, ওমর ফারুক খান, আলতাফ হোসেন, আলাউদ্দিন আলী, অজিত রায়, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, লাকি আখন্দ, আলী হোসেন, শওকত হোসেন, আজাদ মিণ্টু, নিজামুল হক প্রমুখ।

বেতারে কণ্ঠ শিল্পী হিসাবে যারা জনগণের মন জয় করেছিলেন সঙ্গীত পিপাসুদের হৃদয়ের মনি কোঠায় আসীন হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আব্দুল আলীম, আব্দুল লতিফ , মাহমুদুন্নবী, খন্দকার ফারুক আহমেদ, আনোয়ার উদ্দীন খান, জাহেদুর রহিম, নিলুফার ইয়াসমীন, আঞ্জুমান আরা বেগম পরলোকগত। প্রয়াত উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী, সংগীত পরিচালক এবং কণ্ঠশিল্পীদের তালিকা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে শুধু ঢাকা বেতারেই নয়, বাংলাদেশের সংগীত জগতেও এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পীদের মধ্যে যারা এখনও জীবিত, উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দীপ্যমান তারা হচ্ছেন ফেরদৌসী রহমান, ফিরোজা বেগম, রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন, রওশন আরা মুস্তাফিজ, সুধীন দাস, আব্দুল জব্বার, সৈয়দ আব্দুল হাদী, অনূপ ভট্টাচার্য, খুরশিদ আলম, অজিত রায়, বশির আহমেদ, নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী, রফিকুল আলম, শাহনাজ রহমাতুল্লাহ, শবনম মুশতারী, ইয়াসমীন মুশতারী, ফেরদৌস আরা, শাম্মি আখতার, কনক চাপা, শাকিলা জাফর, আবিদা সুলতানা, বেবী নাজনীন, ফাতেমাতুজজোহরা, ফাহমিদা নবী, সামিনা চৌধুরী, রিজিয়া পারভীন, উমাখান, এম. এ খালেক, রবি চৌধুরী, আপেল মাহমুদ, এন্ড্রু কিশোর, সুবীর নন্দী, কুমার বিশ্বজিত, মনির খান। রবীন্দ্র সংগীতে কলিম শরাফী, সনজিদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, অজিত রায়, পাপিয়া সারোয়ার, তপন মাহমুদ, সাদী মোহাম্মদ, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, ইফফাত আরা দেওয়ান, মিতা হক, ফাহিম হোসেন ও মহিউজ্জামান চৌধুরী। পল্লীগীতি ও লোক সংগীতে মুস্তাফা জামান আব্বাসী, নীনা হামিদ, রথীন্দ্র নাথ রায়, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, কিরণচন্দ্র রায়, ফরিদা পারভীন, দিলরুবা খান, মীনা বড়ুয়া, আকরামুল ইসলাম, আব্দুল কুদ্দুস বয়াতী, আব্দুর রহমান বয়াতী, কাঙ্গালিনি সুফিয়া, খবিরুদ্দিন দেওয়ান, আরিফ দেওয়ান, দেওয়ান আবুল কালাম এবং আরও অনেকে।

বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ মোবারক হোসেন খান বেতারে গীতি-কবিদের অবদান প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"... বাংলাদেশের গীতি কবিদের প্রথম পর্যায়ে যাঁরা গীতি-কবিতা রচনা করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জসীম উদ্দীন, বন্দে আলী মিয়া, আশরাফুজ্জামান খান, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, কাদের নেওয়াজ, মফাখখারুল ইসলাম, সিকান্দর আবু জাফর, তালিম হোসেন, সাঈদ সিদ্দিকী, হাবীবুর রহমান, আজিজুর রহমান, আবদুল লতিফ, মোহাম্মদ ওসমান খান, শমসের আলী, খালেক দেওয়ান প্রমুখ। তাঁদের রচনা গীতি-কবিতার নানা শাখায় বিচরণ করে বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা গানের ভুবনকে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমন্ডিত করেছে। কবি হৃদয়ের প্রেম-ভালোবাসা, ব্যথা-বেদনা, বিষাদ-হরষ, আশা-আকাঙ্খা, প্রকৃতির অপরূপ রূপ, স্বদেশের গাথা রূপায়নের মাধ্যমে তারা গীতি-কবিতার জগতকে অতুলনীয় রূপৌশ্বর্যে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। তাঁদের পাশাপাশি এবং পরবর্তী সময়ে যে সকল গীতি-কবি নিজেদের রচনা সম্ভারে গীতি-কবিতার ভূবনকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে শামসুর রহমান, আনিসুল হক চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, আলাউদ্দিন আল আজাদ, ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডক্টর আবু হেনা মোস্তফা কামাল, খান আতাউর রহমান, আবদুল করিম, জিয়া হায়দার, রাহাত খান, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, আলিমুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আধুনিককালের অন্যান্য গীতি-কবির মধ্যে আল কামাল আবদুল ওহাব, আবুবকর সিদ্দিক, নাজিম মাহমুদ, জাহিদুল হক, আনোয়ার উদ্দিন খান, আলমগীর জলিল, মাসুদ করিম, গাজী মাযহারুল আনোয়ার, আহমদ জামান চৌধুরী, কুটি মুনসুর, নজরুল ইসলাম বাবু, মনিরুজ্জামান মনির, আশফাকুর রহমান খান, মুহাম্মদ মুজাক্কের, মোঃ আবু তাহের, খন্দকার আব্দুল হান্নান, কুদরত-এ-খোদা, মাহবুবুর রহমান, খন্দকার নূরুল আলম, হেমায়েত হোসেন, আমিনা মাহমুদ, মোঃ আশরাফ হোসেন, ফজলুর রহমান মান্না, মুহম্মদ নূরুল হুদা, এস, এম, হেদায়েত, মাকিদ হায়দার, জীবন চৌধুরী, মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, আবদুল হাই আল হাদী, মুকুল চৌধুরী, মাহমুদুল হক, লায়লা চৌধুরী, খাজা সুজন, ইমরান নূর, আবুল হায়াত মোহাম্মদ কামাল, কাজী মাহমুদুর রহমান, ফজলুল হক সরকার, তৌহিদুর রহমান, জাহাঙ্গীর হাবিবুল্লাহ, শামসুল আলম, ফজল-এ-খোদা, শামসুল ইসলাম, মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, নয়ীম গহর, শহীদুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হুদা, কাজী লতিফা হক, জেবুন্নেসা জামাল, সায়মা চৌধুরী, কাজী রোজী, মাহমুদ শফিক, নাসির আহমেদ, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে অনেক গীতিকবিই আছেন যাঁদের গান বেতারে নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে।"

[সূত্র : আমাদের গীতি কবিতা : মোবারক হোসেন খান, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, রেডিও বাংলাদেশ পঞ্চাশ বছর পূর্তি ডিসেম্বর-১৬,১৯৮৯]

বেতার প্রকাশনা

বাংলাদেশ বেতারের মুখপত্র পাক্ষিক "বেতার বাংলা" পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়েছিল ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে। বেতার বাংলার প্রথম সম্পাদক কবি, গীতিকার ফজল-এ-খোদা। পাকিস্তানি আমলে বেতারের পাক্ষিক অনুষ্ঠানসূচী সংবলিত এই পত্রিকার নাম ছিল "এলান"। "এলানে"র প্রকাশনা শুরু ১৯৫১ সালের ১৪ আগস্ট থেকে এবং সমাপ্তি ১৯৭১-এর ডিসেম্বর। "এলানে"র প্রথম সম্পাদক ছিলেন কবি শাহাদৎ হোসেন, শেষ সম্পাদক হাসান ইমাম। "বেতার বাংলা" প্রকাশনা এবং তা দেশ-বিদেশের শ্রোতাদের কাছে আগাম পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব বেতার প্রকাশনা দফতরের। "বেতার বাংলা" সকল বেতার কেন্দ্রের পাক্ষিক অনুষ্ঠানের সূচীসহ প্রকাশিত হয়েছে দীর্ঘকাল। বৈচিত্র্য এবং অর্থ সাশ্রয়ের জন্য কখনও মাসিক কখনও ত্রৈমাসিক সংখ্যা হিসেবেও প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উৎসব উদযাপন উপলক্ষে "বেতার বাংলা" প্রতি মাসে দু'টি আকার ও আঙ্গিকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। পাক্ষিক "বেতার বাংলায়" ছিল অনুষ্ঠানসূচী, বেতারের অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ছবি ও শিল্পী পরিচিতি। মাসিক "বেতার বাংলা" ছিল অনুষ্ঠানসূচী বর্জিত। এটি ছিল সম্পূর্ণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক। ১৯৯৬ সালে বেতার প্রকাশনা দফতর দু'টি উল্লেখযোগ্য "বেতার বাংলা" প্রকাশ করেছিল। এর মধ্যে একটি ছিল বঙ্গবন্ধু সংখ্যা (আগস্ট প্রথম পক্ষ, বাংলা শ্রাবণ ১৬-৩১), অন্যটি রজত-জয়ন্তী সংখ্যা ডিসেম্বর '৯৬। দু'টি সংখ্যাই বর্ণাঢ্য, মূল্যবান রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। অর্থ সাশ্রয়ের জন্য বেতার বাংলা বর্তমানে শুধুমাত্র মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

বার্তা বিভাগ

বেতারের বার্তা বিভাগ প্রতিদিন ১৮টি জাতীয় সংবাদ বুলেটিন প্রচারের দায়িত্বে নিয়োজিত। ১৮টি বুলেটিনের মধ্যে ১৪টি বাংলায় এবং ৪টি ইংরেজিতে। এছাড়া বহির্বিশ্ব কার্যক্রম থেকে প্রতিদিন ছ'টি ভাষায় আটটি বুলেটিন প্রচার করা হয়ে থাকে। ঢাকা ছাড়া ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্র চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর ও সিলেট থেকে স্থানীয় সংবাদ প্রচার করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য সংসদের প্রতিটি অধিবেশনের কার্যক্রম কোনওরূপ সম্পাদনা ছাড়াই সংসদ থেকে বাংলাদেশ বেতার সরাসরি প্রচার করে থাকে।

বঙ্গবন্ধুসহ শহীদ চার জাতীয় নেতার উপর অনুষ্ঠান

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু'র হত্যা ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বেতারে বঙ্গবন্ধু'র নাম এবং স্বাধীনতার প্রসঙ্গে তাঁর অবদান উল্লেখ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলের আন্দোলনের ফসল হিসেবে

১৯৯৬ সালের মার্চে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়। একুশ বছর পর ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস উদযাপন উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। সেই সকল অনুষ্ঠানসমূহে বঙ্গবন্ধু এবং শহীদ চার জাতীয় নেতার অবদানকে তুলে ধরা হয়।

১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালিত প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে এবং দীর্ঘ একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এরপরই একুশ বছর ধরে অভিহিত "রেডিও বাংলাদেশ" মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনে পুনরায় "বাংলাদেশ বেতার" হিসেবে নামাঙ্কিত হয়। সত্যকে উদ্ভাসিত করার লক্ষ্যে ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ডের ওপর, ৩ নভেম্বরে জেলখানায় জাতীয় চার নেতার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ওপর মর্মস্পর্শী অনুষ্ঠান প্রচার করে বাংলাদেশ বেতার। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা-চেতনায় জনগণকে উজ্জীবিত করতে এবং দেশকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পুনর্গঠন ও পরিচালনার ব্যাপারে সরকারকে সহায়তা করতে বাংলাদেশ বেতার বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিশেষ করে ১ ডিসেম্বর '৯৬ থেকে ১৬ ডিসেম্বর '৯৬ বিজয় দিবস পর্যন্ত রজত-জয়ন্তীর বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে।

উল্লেখ্য যে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বেতার—টেলিভিশন থেকে সে সময়ের বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কোনও কার্যক্রম বা ৩০ মে শহীদ জিয়ার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কোনও অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় নি। ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করে বেগম খালেদা জিয়া যখন জোট সরকার গঠন করলেন তখন থেকেই সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার-টিভিতে বঙ্গবন্ধু'র স্মৃতিচারণ, ১৫ আগস্ট শোক দিবস উদযাপন এবং বিরোধী দলীয় নেত্রীর কার্যক্রম প্রচার স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ হয়ে গেল। এর কারণ প্রধান এই দুইটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য ছাড়াও পারস্পরিক বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা। আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু'র নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার একক কৃতিত্বের দাবিদার। তারা শহীদ জিয়াকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষক হিসাবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। অন্যদিকে বিএনপি বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা, স্বাধীনতার স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে মানতে নারাজ। আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুসারী, বিএনপি শহীদ জিয়ার দর্শন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগের রাজনীতি ধর্ম নিরপেক্ষতা, বিএনপির রাজনীতি ধর্মভিত্তিক। আওয়ামী লীগের শ্লোগান জয় বাংলা, বিএনপি'র শ্লোগান বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। উভয় দলের বিভেদ, বিদ্বেষের তালিকা আরও দীর্ঘ, শেকড় আরও গভীরে প্রথিত। এই সকল বিভেদের কারণেই এই দু'টি দলের অবস্থান দুই মেরুতে। তাই আওয়ামী লীগের সময়ে বেতার টেলিভিশন থেকে ভুলেও যেমন শহীদ জিয়ার নাম বা তাঁর অবদানকে স্বীকার করা হয় না, তেমনি বিএনপি আমলেও

সরকারি বেতার-টিভিতে বঙ্গবন্ধু'র নাম উচ্চারিত হয় না। কিন্তু বেসরকারি সেটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলি এর ব্যতিক্রম। চ্যানেল আই, এ টি এন বাংলা এবং এন টি ভি নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উভয় দলকে সমান প্রাধান্য দিয়ে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত ভারসাম্য বজায় রেখেছে। কিন্তু বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন সরকারি প্রতিষ্ঠান বিধায় তাদের পক্ষে এই নিরপেক্ষতা প্রদর্শন আদৌ সম্ভব হয়নি।

বেতারের স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি ও প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা ও কমিশন

বেতারের বেশিরভাগ শ্রোতার চাহিদা এবং প্রধান আকর্ষণ হল সংগীত, নাটক এবং খবর। শ্রোতারা গান এবং নাটক শোনে মনোরঞ্জনের জন্য, খবর শোনে দেশে-বিদেশে কোথায় কী ঘটছে তা জানার জন্য। গান, নাটকের মধ্যে সরকারের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা দলীয় প্রচারের ততটা সুযোগ নেই বলে এসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে শ্রোতাদের অভিযোগ সীমিত। কিন্তু তারা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বাংলাদেশ বেতার থেকে পরিবেশিত খবরের বিষয় ও সত্যতা সম্পর্কে দেশের অভ্যন্তরে যখন কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে থাকে তখন সেই সব ঘটনার খবরাখবর আগ্রহভরেই বেতার-টিভিতে শুনতে চায়। জানতে চায় কোথায় ঘটছে, কেন ঘটছে, কীভাবে ঘটছে। কিন্তু এসব ঘটনা প্রকাশিত হলে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে, জাতীয় স্বার্থ বা দলীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে– এই আশঙ্কায় প্রায় ক্ষেত্রেই আসল ঘটনা সম্পূর্ণ চেপে যাওয়া হয়, অথবা তথ্যগত ভুল খবর প্রচার করা হয়, সঠিক খবরের পরিবর্তে একতরফাভাবে হ্যান্ড আউট বা প্রেস নোট জারি করা হয় যা আরও বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। দিনাজপুরে ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা– এ ধরনের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এভাবেই বেতার তার ভাবমূর্তি ও নিরপেক্ষতার প্রশ্নে সবসময়েই জর্জরিত। শ্রোতারা বাংলাদেশ বেতার বা রেডিও বাংলাদেশ থেকে কোনও সময়েই বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ সংবাদ জানতে পারেনি বলে তারা বাংলাদেশ বেতার-টিভি'র ওপর আস্থা হারিয়ে বিবিসি এবং ভোয়া'র পরিবেশিত সংবাদের ওপর নির্ভরশীল হয়েছে। নির্ভরশীল হতে তাদের বাধ্য হতে হয়েছে। কারণ, প্রায় প্রতিটি সরকারই ক্ষমতায় আসার পর বেতার-টিভিকে নিরপেক্ষভাবে জনস্বার্থে ব্যবহার না করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচারণা ও নিজস্ব দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছে। ফলে এক সরকার পরিবর্তনের পর আর এক সরকার যখন ক্ষমতায় এসেছে তখন সব অপবাদের বোঝা বইতে হয়েছে বেতার কর্মীদের। তাদেরকে অমুকপন্থী, তমুকপন্থী, দালাল ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করে মানসিকভাবে নিপীড়িত করা হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে কোনও-কোনও শুভানুধ্যায়ী শ্রোতা প্রশ্ন করেছেন, আপনারা কেন বিবিসি'র মতো সংবাদ বা অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারেন না? এধরনের প্রশ্নে আমাদের উত্তর, আমাদেরকে যুক্তরাজ্যের মতো গণতান্ত্রিক পরিবেশ দিন, বিবিসি'র মতো প্রচার স্বাধীনতা দিন, বিবিসি'র অনুষ্ঠান নির্মাতারা অনুষ্ঠান নির্মাণে যে ধরনের

লজিস্টিক সাপোর্ট ও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে তা আমাদের জন্যও নিশ্চিত করুন, আমরা অবশ্যই বিবিসি'র মতো সংবাদ ও অনুষ্ঠান আপনাদের উপহার দেব।

বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশে যুক্তরাজ্যের মতো গণতান্ত্রিক পরিবেশ, বিবিসি'র মতো প্রচার স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধার আশা করা আমাদের জন্য দিবাস্বপ্ন হলেও শ্রোতাদের ওই প্রশ্নের অন্য উত্তর আমাদের জানা নেই। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে প্রবাসী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র যে ভূমিকা পালন করেছিল, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে আমরা সেই ভূমিকা পালন করতে পারিনি। পারিনি স্বাধীন বাংলা বেতারের ঐতিহ্য, স্বাধীনতা চিন্তা-চেতনাকে ধরে রাখতে। অলিখিত বিধি-নিষেধের জালে প্রতিপদে আমরা নিয়ন্ত্রিত, চাকরিচ্যুতি অথবা শাস্তিমূলক বদলির ভয়ে আমরা সদা শঙ্কিত থেকেছি।

১৯৯০ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের সময়ে বেতার-টিভি'র স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার হয়ে উঠেছিল। গণআন্দোলনে হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের পতন ঘটলেও তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী বেতার-টিভিকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৯১-এর নির্বাচনে বেতার-টিভিকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল বিএনপি। নির্বাচনে বিজয় লাভ এবং ক্ষমতায় পাঁচ বছর অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তারা বেতার-টিভিকে প্রতিশ্রুত স্বায়ত্তশাসন দিতে পারেনি। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার ছিল, তারা বেতার-টিভিকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করবেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির আলোকে নতুন চিন্তা-ভাবনা এবং একটি স্বায়ত্তশাসন নীতিমালা প্রণয়ন কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন দেশের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক সহ বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সকলের মতামত, পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করে বেতার, টেলিভিশনের স্বায়ত্ত শাসনের পক্ষে একটি সুপারিশ মালা প্রণয়ন করে এবং বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে পেশ করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও স্বায়ত্ত শাসন কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকে এবং কালক্ষেপণ করে বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। এরপর ২০০১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকার বেতার-টিভি স্বায়ত্ত্বশাসন বাস্তবায়নের প্রশ্নে কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকৃতি জানান। কোনও সরকারই এই শক্তিশালী দুটি গণমাধ্যমকে হাতছাড়া করতে নারাজ। অথচ বেতার-টিভির স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে জনগণের একটা বিরাট প্রত্যাশা ছিল। সেই প্রত্যাশার সাথে স্বায়ত্তশাসনের প্রক্রিয়া নিয়ে মানুষের মনে নানা দ্বিধা ও সংশয়ও ছিল।

সবার প্রশ্ন সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে বেতার-টিভিকে মুক্ত করে স্বায়ত্তশাসন কীভাবে দেয়া হবে? কতটুকু দেয়া হবে? স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেতার-টিভি কীভাবে তাদের আয়-ব্যয় নির্বাহ করবে? জবাবদিহিতার জন্য কার কাছে দায়বদ্ধ

থাকবে? এতদিন যারা সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী হিসেবে পরিগণিত ছিলেন, সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগে অভ্যস্ত ছিলেন স্ব-শাসিত বেতার-টিভিতে তাদের ভবিষ্যৎ, তাদের চাকরি কাঠামো কী পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হবে? অনুষ্ঠান ও বার্তা প্রযোজক কতটুকু স্বাধীনতা পাবেন? তাদের নিরপেক্ষতার, বেতার-টিভি'র নিরপেক্ষতার সংজ্ঞা কী হবে?

অনেকেরই ধারণা ছিল স্বায়ত্তশাসন দেয়া হলে বেতার-টিভি মাধ্যম স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারবে এবং গণমুখী ও জনপ্রিয় অনুষ্ঠান প্রচারের নিশ্চয়তা দিতে পারবে। কিন্তু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলেই যে বেতার-টিভি সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হবে, অনুষ্ঠান নির্মাতারা কাজের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা পেয়ে যাবে, সবদলের খবর সমানভাবে প্রচারিত হতে থাকবে এই ধারণা বোধ হয় ভুল। বিশ্বের ১৮৫টি দেশের মধ্যে মাত্র ৪৩টি দেশের বেতার এবং টেলিভিশন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে ঘোষিত। এগুলোর মধ্যে বিবিসি (লন্ডন), সিবিসি (কানাডা), এনএইচকে (জাপান), এবিসি (অস্ট্রেলিয়া) উল্লেখযোগ্য। এসকল প্রতিষ্ঠান সরকারকে অগ্রাহ্য করে নয় বরং রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন মেনেই চলে। শুধু ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা সংস্থার নিজস্ব। ভয়েস অব আমেরিকা বিবিসি'র মতো স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান নয়। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক সরাসরি শাসিত একটি গণমাধ্যম। ভারতের আকাশবাণী ও দূরদর্শন সরকার নিয়ন্ত্রিত হয়েও জনপ্রিয়। কেননা তাদের আছে মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের অনুষ্ঠান ও সংবাদে নেতা-নেত্রীদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচারের পরিবর্তে ঘটনা এবং ইস্যুকেই তারা প্রাধান্য ও গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে থাকে। পাকিস্তান, ঘানা, তাইওয়ান, সুদান, নাইজেরিয়া'র বেতার-টিভি স্বায়ত্তশাসিত হলেও তারা সামরিক সরকারের কুক্ষিগত। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও তথ্য পরিবেশনে তাদের কোনও ক্ষমতা নেই। ফ্রান্সের বেতার-টেলিভিশন সরকার নিয়ন্ত্রিত হলেও তারা নিরপেক্ষ। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে তাদের কোনও বাধা নেই। সুতরাং স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে স্বায়ত্তশাসনের দাবিদারদের মধ্যেও ছিল নানা দ্বিধা এবং সংশয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহ্‌মদের "বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন নিয়ে কথা" নিবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"..... বাংলাদেশের দু'টি প্রচার মাধ্যম, শোনা ও দেখার প্রতিষ্ঠান বেতার ও টেলিভিশনকে সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, না তাকে মুক্ত করে দেবেন?

মুক্ত যদি করবেন, তবে মুক্ত করে কার কাছে যেতে দেবেন? বাংলাদেশের বার কোটি মানুষের নিয়ন্ত্রণেই কি চলে যাবে মাধ্যম দু'টি? যে বার কোটির মধ্যে দশ কোটি মানুষের কোনও শিক্ষা, দীক্ষা, আবাস-নিবাস, খাদ্য, স্বাস্থ্য, আশা, স্বপ্ন ও সম্বিৎ বলে কিছুই নেই, যারা মানবেতর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের হাতে বেতার-টেলিভিশনকে ছেড়ে দিলে অবস্থাটি কেমন হবে ভাবতেও গা ছম ছম করে ওঠছে।"

ছোট্ট একটা দেশ। অনেক তার লোক। অসংখ্য তার সমস্যা। তাতে আছে নানা শ্রেণী বিন্যাস। আছে অর্থ ও দর্শনের মতভেদ। আছে ধর্ম নিয়ে নানা রকম জটিলতা। ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে এখানে যে জাতির স্বচ্ছ ও স্পষ্ট কোনও ধারণা স্থির হয়নি, সে জাতির হাতে বেতার-টেলিভিশনকে ছেড়ে দিতে তো মহাপ্রলয় ঘটে যাবে।

অথচ সেই স্বায়ত্তশাসন আমি চাই। এক শ'বার চাই। সরকারকে জবাবদিহিমূলক করতে চাই, সরকারের খারাপ কাজের সমালোচনা করতে চাই। আবার ভাল কাজের জন্য বাহবাও দিতে চাই। একতরফাভাবে সরকার খালি হাততালি নেবেন, তেমন হাতের মালিক আমি নই। কিন্তু যে কোনও লোভী, স্বার্থপর ও অদূরদর্শী সরকার তো ঘন ঘন হাততালি পাওয়ার জন্য এবং চাটুকারদের চাটাচাটির জন্য খুব ব্যস্ত থাকে। সে রকম সরকার কখনও নিজের সমালোচনা ও বদনাম সহ্য করবে না।

এমনধারা কাজ-কর্ম দুনিয়ার নানা দেশে হচ্ছে। যেখানে সরকার স্বার্থপর ও অসৎ, সেখানেই স্বায়ত্তশাসনের ঝামেলা হয়ে গেছে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার একটি রাজনৈতিক দল ও মতের পরিপোষক। সেই দলই যখন সরকার হবে, তখন সে নিজের মতো জাহির করবেই। তাহলে তো কোনও কালেই কোনও সংসদীয় সরকার স্বায়ত্তশাসন ছেড়ে দেবে না, নিজের কুক্ষিতে ভরে রাখবে সব। নিজের কথা, আর নিজেরে ছবি নানাভাবে ও বিচিত্র কৌশলে প্রচার করতেই থাকবে।

স্বায়ত্তশাসন নিয়ে আমার মধ্যে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু নানা রকম প্রশ্ন আছে। প্রশ্ন হচ্ছে পদ্ধতিতে। আর তার প্রয়োগ নিয়েও ভাবনা আছে। দেশের সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত। কিন্তু আসলে কি সরকারের আদেশ নির্দেশ, অনুরোধ আবদার ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে? বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী স্বায়ত্তশাসিত। কিন্তু এ দু'টো একাডেমী কি কোনও একটি মাত্র কর্মসূচী নিতে পারবে সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে? না পারবে না। সরকার আলোতে নেই, কিন্তু অন্ধকারে আছেন। অনেকটা ঈশ্বরের মতো। অদৃশ্য তিনি, কিন্তু অদৃশ্য থেকেও সব কলকাঠি তিনি নাড়ছেন।

আবার বলছি, বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন আমি চাই। আমি মুক্ত বাতাস চাই। মাছ যেমন জলে সাঁতার দিতে চায়, শিশু যেমন মাতৃদুগ্ধ পান করতে চায় এবং পাখি যেমন আকাশে উড়তে চায়–আমি তেমনই স্বায়ত্তশাসন চাই।

সরকার ঠিক করুন, তিনি কতখানি ছাড়বেন আর তাতে কতখানি আমি পাব। সরকার আমার খাঁচার মুখ খুলে দেবেন, কিন্তু আমার পাখা ভেঙে রাখবেন, তাতে তো উড়ে যাওয়ার উপায় আমার থাকবে না। আমি উড়তে চাই আনন্দের সঙ্গে। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য আমার বিদ্যা, সচেতনতা এবং হৃদয় কতখানি স্বচ্ছ এবং

সংস্কৃত, তা যদি নিরূপণ করা না থাকে, তবে অসহায় আমি আকাশে ছেড়ে দিলে, আমারই বিপদ হবে। স্বায়ত্ত নিতে গিয়ে গোলামি নিয়ে ফিরব তাহলে। তেমন স্বায়ত্ত আমি কোনও দিন চাইব না।"

এ ধরনের সংশয় এ ধরনের অভিমত শুধু অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের একার নয়–আরও অনেকের। সুতরাং বেতার-টিভিকে স্বায়ত্তশাসনে অথবা সরকারি নিয়ন্ত্রণে যেভাবেই রাখা হোক না কেন এর নিরপেক্ষতা নির্ভর করে সরকার ও প্রতিষ্ঠানের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন এবং সদিচ্ছার ওপর। আমার ক্ষুদ্র ধারণায় শুধু এইটুকু বলতে পারি, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলগুলোর রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া বেতার-টিভি'র নামমাত্র স্বায়ত্তশাসন হবে অর্থহীন। দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা না থাকলে, সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি না হলে, বেতার-টিভি'র কর্মীরা নির্ভয় চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা না পেলে বেতার-টিভি যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই থাকবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স এখন চৌত্রিশ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঐতিহ্য নিয়ে বাংলাদেশ বেতারের বয়সও চৌত্রিশ। কিন্তু যারা বেতারের সুখ-দুঃখ, ব্যর্থতা সাফল্যের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে জড়িত ছিল তাদের অনেকেই এই পৃথিবী থেকে, আমরা যারা এখনও জীবিত তাদের অনেকেই এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নিয়েছি বয়সের নিষ্ঠুর ঘণ্টাধ্বনিতে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি আছে, আছে একটি ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যতের পানে প্রতিষ্ঠানটি চলতে থাকবে তার নিজস্ব নিয়ম আর গতিতে। আমরা বেতারের স্মৃতি থেকে ক্রমশ বিস্মৃতিতে চলে যাচ্ছি। চলে যাওয়ার আগে আমাদের শুধু এইটুকু কাম্য, ভবিষ্যতের বেতার হোক সত্যভাষী, মিথ্যার বিরুদ্ধে হোক সোচ্চার, সাধারণ মানুষের স্বার্থে হোক আপসহীন শব্দসৈনিক। সেই প্রত্যাশা নিয়ে অসম্পূর্ণ এই স্মৃতি কথা শেষ করছি একটি প্রিয় উদ্ধৃতি দিয়ে—

Fear not if the pearls are scattered unstrung, they only await to be restrung in better order.

তথ্যসূত্র ঃ

[নিজস্ব স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা ছাড়াও "বেতার বাংলায়" আশরাফ-উজ-জামান, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, নাজমুল আলম, বেলাল মোহাম্মদ, শামসুল হুদা চৌধুরী, আশফাকুর রহমান খান, সাবেক প্রকৌশলী ও সম্প্রচার গবেষক মনোরঞ্জন দাস, কাজী জাকির হাসান রচিত নিবন্ধসমূহ, "নিরীক্ষা" ও "বেতার বাংলা" পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।]

প্রথম রচনাকাল ঃ ডিসেম্বর ১৯৯৬ নিরীক্ষা পত্রিকার ৭৮তম সংখ্যায় প্রকাশিত। এই গ্রন্থে সংকলনের জন্য নিবন্ধটিতে কিছু কিছু তথ্য সংযোজন সহ পরিমার্জন করা হয়েছে।

বেতারে নারী

"আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছো দান
তুমি জানো নাই, তুমি জানো নাই
তুমি জানো নাই তার মূল্যের পরিমাণ।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেতার আমার দুর্বলতা, বেতার আমার রক্ত, মাংস, মজ্জায়। সেই ১৯৬৫ সালের ৭ আগস্ট থেকে ১৯৯৯ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত আমার দীর্ঘ বেতার জীবন, যেখানে অনেক স্মৃতি, অনেক শিল্পী সহকর্মীদের মুখ আমার চোখের পর্দায় এখনও ভেসে ওঠে। তাদের কথা, আনন্দের শব্দগুলো যেন আমার বুকের দরজায় বাতাসের মতো ছুটে আসে আর ধাক্কা দিয়ে চলে যায়।

১৯৬৫ সালের ৭ আগস্টে আমি অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে চট্টগ্রাম বেতারে যোগ দিয়েছিলাম। এম এ পাশ করবার পর চাকরির জন্য প্রথম দরখাস্ত, প্রথম সাক্ষাৎকার এবং প্রথম চাকরি ছিল সেটা। শিল্প-সংস্কৃতির বিচরণক্ষেত্র হিসেবে বেতারের প্রতি আমার মোহমুগ্ধতা ছিল। কিন্তু অনুষ্ঠান প্রযোজনার কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না আমার। আমি তখন তরুণ, অবিবাহিত। চাকরিতে যোগদানের পর আমাকে দেওয়া হল মহিলাদের জন্য সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও প্রযোজনার দায়িত্ব। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, চট্টগ্রাম বেতারের তখন কোনও মহিলা প্রযোজক ছিলেন না। মহিলাদের আসর প্রযোজনা করতে গিয়ে অনুষ্ঠানের স্বার্থেই চট্টগ্রামের অনেক বিশিষ্ট মহিলা, সাধারণ গৃহবধূ, স্কুল-কলেজের শিক্ষিকা, ছাত্রী, মহিলা শিল্পী, কথকদের সাথে আমাকে পরিচিত হতে হয়েছিল। সে সময়ে চট্টগ্রামের নারী সমাজ এ সময়ের মতো এতটা উদার বা সহজ ছিল না। মহিলারা বেতার অনুষ্ঠান শুনতে পছন্দ করলেও নিজেরা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আগ্রহী ছিলেন না। বেতার অনুষ্ঠানে তাদেরকে আগ্রহী করতে, উৎসাহিত করতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। আমার বিরামহীন প্রচেষ্টার কারণেই সম্ভবত তারা আমার প্রতি

সদয় হয়েছিলেন, বেতার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আগ্রহী হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের সাথে আমার হৃদ্যতা গড়ে উঠলেও অনুষ্ঠানের বাইরেও আমি ছিলাম তাদের বন্ধুর মতো। সে কারণেই বিভিন্ন সময়ে তাদের আন্তরিক আতিথেয়তা, আপ্যায়ন উপভোগ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই অনুষ্ঠান করতে গিয়েই মেয়েদের সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা ও আড়ষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছিল। আমার সময়ের মহিলাদের আসর পরিচালনায় যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন তারা হলেন—সাজেদা চৌধুরী (প্রাক্তন মন্ত্রী), শামসুন্নাহার আজিজ (জাহানারা ইমামের বোন) এবং আজমত আরা আলম (একজন গৃহবধূ)। তাদের সহযোগিতা, আমার প্রতি তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সরল আচরণ আমার চাকরির প্রথম জীবনে একটা মূল্যবান সংযোজন। তাদের সহযোগিতার কারণেই আমি সমাজের বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন শ্রেণীর মেয়েদের পারিবারিক, সামাজিক জীবনযাত্রার সমস্যাগুলো অনুধাবন করতে শিখেছিলাম এবং আমার জানাশোনা অভিজ্ঞতাগুলো অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছিলাম।

আমার যতদূর মনে পড়ে সেই সময়ের মহিলা অনুষ্ঠানে গতানুগতিকভাবে মহিয়সী মহিলাদের জীবনী পাঠ, ঘরকন্না, আচার তৈরি শেখানোর পরিবর্তে মেয়েদের লেখাপড়া, খেলাধুলা ও সব্জী বাগান তৈরিতে উৎসাহিত করা হত। মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও রোগবালাই প্রতিরোধে নানা রকম তথ্য পরামর্শ দেয়া হত। জীবনকে শুধুমাত্র ঘরকন্নায় আবদ্ধ না রেখে তাদেরকে বিভিন্ন ব্যবসা বা চাকরিক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্যে আত্মবিশ্বাস ও প্রেরণা যোগানো হত।

মহিলাদের আসর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান প্রযোজনার অভিজ্ঞতা ও কলাকৌশল আয়ত্তের পর আমাকে মহিলাদের আসরের পরিবর্তে অন্যান্য আরও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রযোজনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে যেখানেই যে ধরনের অনুষ্ঠান হোক না কেন, মহিলা শিল্পী, কথক, উপস্থাপকগণ সব সময়েই তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আমার প্রযোজিত অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এতো গেল আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে চট্টগ্রাম বেতার জীবনের সামান্য কিছু কথা। বেতারের প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের চলমান অনুষ্ঠান প্রবাহে ও বেতারের বিশাল কর্মযজ্ঞে মেয়েদের ভূমিকা, তাদের অংশগ্রহণ ও উপস্থাপন প্রসঙ্গে এবার কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

বেতারে নারী কতটুক অংশগ্রহণ করতে পারছে বা কীভাবে তারা উপস্থাপিত হচ্ছে বিষয়টি উত্থাপন করার আগে কবে, কখন, বাংলাদেশ বেতারের যাত্রা শুরু হয়েছিল তার উল্লেখ করতে চাই। কেননা বেতারের ইতিহাসের সাথেই সেকালের বা পরবর্তী কালের কিছু মহিলা শিল্পী কলাকুশলীদের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বেতারের সম্প্রচার ধারায় তাদের ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ইউরোপের চরম সংকটকালে বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে বৃটিশদের প্রয়োজন

মেটাতেই ঢাকার নাজিম উদ্দিন রোডে একটি ভাড়া করা বাড়িতে (বর্তমানে বোরহানুদ্দিন কলেজ) দু'টি স্টুডিও নিয়ে বেতার অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়। এর নামকরণ করা হয়, "অল ইন্ডিয়া রেডিও ঢাকা"।

অনুষ্ঠান সম্প্রচারের শুরুতে ছিল নানান বিপত্তি। হাতে গোনা দু'চারজন শিল্পী ছাড়া সে সময়ে ঢাকায় সংগীত বা নাটকের জন্যে মহিলা শিল্পী পাওয়া ছিল দুষ্কর। মহিলা শিল্পী জোগাড় করতে বেতারের প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্টদের প্রানান্তকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কলকাতা বেতারের প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট শামসুর রহমান (পরে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডাইরেক্টর হিসাবে পদত্যাগ করেন) ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁর তিন সহকর্মী প্রভাত মুখার্জী, সুদেব বোস, আর সুনীল বোসের সঙ্গে ঢাকায় বদলী হয়ে আসেন। তাঁদের উপরে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ঢাকা বেতার কেন্দ্র চালু করার প্রারম্ভিক যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা। শামসুর রহমান ঢাকা বেতারের জন্যে মেয়ে শিল্পী খুঁজে বের করার ব্যাপারে এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন ঢাকা বেতারের চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে (১৯৭৯ সাল) বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে। তাঁর স্মৃতিচারণের অংশ বিশেষ এখানে তুলে ধরছি

"... কিন্তু দু'চারজন মহিলা ছাড়া অন্যান্য সম্ভাব্য ভদ্র শ্রেণীর মহিলা শিল্পীদের নিয়ে সমস্যা দেখা দিলো। এদের অভিভাবকরা বেতারে তাদের মেয়ে পাঠাতে নারাজ। শুধু নারাজ নয়, তারা বেতারের উপর সম্পূর্ণ বিরূপ। তার কারণ, ঢাকা কলকাতা নয়। তখনকার ঢাকা অন্যান্য জেলা সমূহের মতো একটা জেলা শহরই ছিলো। তাই দেখা গেল ঢাকার অধিবাসীরা অতি রক্ষণশীল, সমাজের অসংখ্য বিধি নিষেধের গণ্ডিতে বাঁধা। তারা নানা রকম সংস্কারে আচ্ছন্ন। বেতার সম্পর্কে তাঁদের মন ভ্রান্ত ধারণায় বিভ্রান্ত। বেতারকে তারা মনে করে ফিলম্ লাইনের মতো উশৃঙ্খলতার আর নৈতিক অধঃপতনের এক সর্বনাশা সোপান। তাই বেতারের উপর তাদের বদ্ধমূল বিরূপতা, বৈরীতা। অতএব, তারা তাদের মেয়েকে বেতারে পাঠাবে না, কদাচ নৈব, নৈবচ।

তাহলে উপায়? ইতিমধ্যে এই সমস্যা-সংকুল অবস্থায় আমাদের কয়েকজন উৎসাহী স্থানীয় বন্ধু নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়ে শিল্পীদের নিয়ে এক গানের জলসার বন্দোবস্ত করলেন। জনসন রোডের মিউজিক্যাল মার্টের উপরে দোতলার একটা ঘরে, যেখানে এইচ, এম, ভি, রেকর্ডিং-এর জন্য রিহার্সেল করতো, সেই ঘরে গানের জলসা হলো। সেই জলসা থেকে পাওয়া গেল খুব উঁচুমানের গানের শিল্পী গীতা দেবী, প্রমোদ বালা, ঝরণা রাণী ইত্যাদিকে।

এদিকে ঢাকার ভদ্র শ্রেণীর সম্ভাব্য মহিলা শিল্পীদের অভিভাবকদের বুঝানোর জন্য আমরা নিজের এবং আমাদের স্থানীয় বন্ধুবান্ধবরা সবরকম কৌশল ও চেষ্টা করতে লাগলাম। অবশেষে, আমরা প্রস্তাব দিলাম, আপনারা আপনাদের মেয়ে না পাঠান, না পাঠাবেন। আপনারা, নিজেরা আপনাদের জন্য যে স্টুডিও গড়া হচ্ছে, সেটা অন্ততঃ দেখে যান। তারা আমাদের নির্মীয়মাণ স্টুডিও দেখতে এলেন একে একে।

মনে হলো বরফ একটু একটু গলছে। তারপর, তারা পাল্টা প্রস্তাব দিলেন, গান ও নাটকের সময় মেয়ের সঙ্গে আমাদেরও ওই স্টুডিও ঘরে থাকতে দিতে হবে। আমরা বললাম, বেশতো থাকবেন আপনারা। এতে অভিভাবকদের সব সংশয়, সব দ্বিধা দূর হলো। ফলে আমরা পেয়ে গেলাম ভদ্র শ্রেণীর সব রকম অনুষ্ঠানের জন্য পর্যাপ্ত শিল্পী যেমন সুপ্রভা ব্যানার্জী, হাসনু হেনা, সাবিত্রী ঘোষ, প্রতিমা ঘোষ, নীলিমা ঘোষ, শেফালী দাস, সরমা দাস, স্বর্ণময়ী পাল, নালিমা দত্ত, তপতী দাস, মায়া বোস, মায়া দে, মায়া আচার্য, মায়া ভট্টাচার্য, শোভন গাঙ্গুলী, সবিতা বসু, সংযুক্তা সেন, পারুল দেবী, সুজাতা বোস, অঞ্জলী বোস, রীনা দে, মনিকা চ্যাটার্জী, অরুণ প্রভা চ্যাটার্জী, অনিমা বোস, ইত্যাদি এবং আরও অনেক যাদের নাম তখন আর মনে পড়ছে না। এইভাবে আমাদের শিল্পী সন্ধানের যে দীর্ঘ অভিযান চলেছিল আপাততঃ সেই পর্ব সাঙ্গ হলো।

এবার আর এক পর্ব- শিল্পীদের বিশেষ করে সম্ভাব্য মহিলা শিল্পীদের মাইকভীতি ভাঙ্গাবার মহড়া পর্ব। আমাদের মনে রাখতে হবে ৪০ বছর আগে শিল্পীরা, বিশেষ করে মহিলারা এখনকার মতো মাইক-ফ্রি ছিল না। মাইককে তখন তারা জুজুর মতো ভয় পেতো। তখনো কোন স্টুডিও তৈরি হয় নি। তাই বিল্ডিং-এর নিচ তলার দক্ষিণদিকের হল ঘরটা খালি করিয়ে নেয়া হলো। চেয়ার টেবিল নেই। চেয়ে চিন্তে সতরঞ্জি-বনে বসবার ব্যবস্থা হলো। তারপর একটা মাইক্রোফোন কাঠের বাক্সের উপর ফিট করে কানেকশন তারটা একটা ফোকরের মধ্য দিয়ে চালিয়ে দেয়া হলো। যেন সত্যি মাইক সচল রয়েছে। এই বলে শিল্পীকে মাইকের সামনে বসিয়ে বলা হতো, হাত উঁচু করে ইশারা করলেই গান শুরু করবেন। বাদ্যযন্ত্র নেই। চেয়ে আনা একটা হারমোনিয়াম আর এক জোড়া বায়া তবলা রাখা হতো। শিল্পীকে তারপর হারমেনিয়াম বাজিয়ে গান করবার জন্য ইশারা করা হতো। কিন্তু তাদের মুখ দিয়ে স্বর, সুর কিছু বের হয় না-কেবল গলা পরিষ্কার করবার খুক খুক শব্দ। সেও অনেকক্ষণ ধরে। এদিকে হাসির দমকে আমাদের ঠোঁটে খিল লাগার অবস্থা। না পেরে মুখে রুমাল চেপে আমরা বাইরে এসে একচোট হেসে পেট খালি করে গম্ভীর হয়ে আবার ঘরে ফিরে যেতাম। এইভাবে আমরা দিনের পর দিন সমস্ত শিল্পীদের মাইকের সামনে এনে তাদের এইরকম মহড়া দিয়ে মাইকভীতি দূর করেছি।"

১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ঢাকা বেতারের যাত্রা শুরু। প্রথম দিনের সংগীতানুষ্ঠানে কয়েকজন প্রতিথযশা শিল্পী অংশ নেন। সেসময় নারী শিল্পীদের মধ্যে যাদের নাম জানা যায় তাঁরা হলেন, উৎপলা ঘোষ ও কল্যাণী দাস। এঁরা দু'জনেই পরবর্তীতে জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

প্রথম দিন সুধীর সরকার রচিত একাংকিকা 'দুয়ে দুয়ে পাঁচ' অভিনীত হয়েছিল। এতে আমোদ দাস গুপ্ত, বিপুল দত্ত গুপ্ত, নির্মল সেন, সুধীর রায়-এর সঙ্গে একমাত্র মেয়ে শিল্পী ছিলেন সংযুক্তা সেন। ঢাকা বেতারের প্রথম দিনের 'খেলাঘর' আসরে গান করেন সে সময়ের শিশু শিল্পী লায়লা আর্জুমান্দ বানু, অঞ্জলি এবং রেবা।

বিশিষ্ট বেতার ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ বেতারের প্রথম মহাপরিচালক আশরাফ-উজ-জামান তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন-"সে যুগে ঢাকার একটি বেতার স্টেশন গড়ে তোলার কাজ খুব সহজ ছিল না। বাদ্যযন্ত্রীদের অনেকে এসেছিলেন কলকাতা থেকে। সুধীর সরকার নাটক নিয়ে বিপদে পড়লেন। মেয়ে শিল্পীরা কেউ নাকি নাটক করতে এগিয়ে আসছে না। নানা রকম সামাজিক বাধা অনুশাসন ছিল ঢাকায়। ঢাকার স্টেজে তখনও ছেলেরা মেয়ে সেজে অভিনয় করত। মাধুরী চ্যাটার্জি এবং তাঁর বোন অনুরাধাকে নিয়ে ঢাকার প্রথম বেতার নাটক অভিনীত হয়েছিল। সংগীতে উৎপলা ঘোষ (উৎপলা সেন), গিরীন চক্রবর্তী, গোপাল দাস গুপ্ত, অঞ্জলী রায়, চামেলী দত্ত সকলে মিলে একটি সংগীত চক্র গড়ে তুলেছিলেন।"

ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠানকে শ্রোতাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্যে কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হত ঢাকা বেতারে। ঢাকা বেতার চালু হবার কিছুদিনের মধ্যেই বিশিষ্ট অভিনেত্রী যমুনা দেবী এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডের সেই অপরিসর অবরুদ্ধ স্টুডিও থেকেই শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। ঢাকা বেতারের সংগীতের ইতিহাসে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হল বেতার কেন্দ্রে কবি কাজী নজরুল ইসলামের উপস্থিতি। ১৯৪০ সালের ১২ ডিসেম্বর নজরুল ইসলামের রচনা ও পরিচালনায় সংগীত বিচিত্রা 'পূর্বানী' প্রচারিত হয়েছিল। এতে সংগীতে অংশ নিয়েছিলেন চিত্ত রায়, শৈল দেবী, এবং ঢাকার কিছু শিল্পী। সেই গীতি আলেখ্যয় কবি নজরুল লিখেছিলেন তাঁর একটি বিখ্যাত গান-'আমি পূরব দেশের পূরনারী/গাগরি ভরিয়া এনেছি গো অমৃত বারি।' এই গানের বাণীর মধ্য দিয়েই তিনি সে কালের ঢাকা বেতারে এদেশের নারীদের সৌন্দর্য্য ও মর্যাদাকে তুলে ধরেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের সাথে সাথে ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালের আগস্টে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা একটি প্রদেশ হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তানের একটি আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা বেতারের প্রথম নামকরণ হয় 'পাকিস্তান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস' এবং ১৯৪৮ সালে পুনরায় নামকরণ হয় 'রেডিও পাকিস্তান', ঢাকা। দেশ বিভাগের সময় হিন্দু শিল্পী এবং স্টাফ বাদ্যযন্ত্রীদের ব্যাপক দেশত্যাগের ফলে ঢাকা বেতারে চরম শিল্পী সংকট সৃষ্টি হয় এবং অনুষ্ঠান প্রচার দূরূহ হয়ে পড়ে। তখন মুসলমান শিল্পী ছিল হাতেগোনা কয়েকজন। মুসলমান সমাজের বেশিরভাগ পরিবারে গান-বাজনা, নাটক, শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা নাজায়েজ হিসেবে বিবেচিত হত। এরকম পরিস্থিতিতে বেতারের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মেয়েদের অংশগ্রহণ করাটা ছিল আরও দুষ্কর। অধিকাংশ মুসলিম পরিবারের মেয়েদের কড়া পর্দাপ্রথা ও সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলতে হত। একটি নির্দিষ্ট

বয়সের পরে মেয়েদের ভালো ঘরে বিয়ে হবে—এটাই ছিল তাদের অভিভাবকদের একমাত্র প্রত্যাশা।

চল্লিশ দশকে ঢাকা বেতারের তিনজন শিল্পী—তিন বোন লায়লা আর্জুমান্দ বানু, লুলু বিলকিস বানু এবং মালেকা পারভীন বানু।

এসময় বেতারের কর্মকর্তাদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হয়। কলকাতার মুসলমান শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা জনপ্রিয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে আব্বাস উদ্দিন, আবদুল হালিম চৌধুরী, আবদুল আহাদ সহ আরও কয়েকজন ঢাকায় ফিরে আসেন। এসময় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বংশধররা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকায় চলে আসেন। পরবর্তীকালে এদের সাথে ঢাকা বেতারে যোগ দেন আব্দুল লতিফ, সমর দাস ও ধীর আলী মিয়া। এই সকল গুণীজনের প্রচেষ্টা, শিক্ষা ও প্রভাবে সামাজিক বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যেসব মহিলা সংগীত শিল্পী প্রতিভা ও সাধনা বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে লায়লা আর্জুমান্দ বানু, মালেকা পারভিন, শামসুন্নাহার করিম, আফসারী খানম, ফিরোজা বেগম, ফরিদা ইয়াসমিন, মাহবুবা রহমান, মালেকা আজিম খান, ফরিদা বারী মালিক, হুসনা বানু খানম, নীলিমা দাস, আঞ্জুমান আরা বেগম, সানজীদা খাতুন, ফেরদৌসী রহমান, রওশন আরা মাসুদ, ফৌজিয়া খান, নীরু শামসুন্নাহার-এর নাম পাওয়া যায়। বেতার নাটকে অভিনয় করতেন লতিফা রশীদ, লুলু বিলকিস বানু, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, হুসনে আরা, নুরুন্নাহার, লিলি চৌধুরী, নাদিরা চৌধুরী, আমেনা খাতুন, ডলি সুরাইয়া, খুরেশদী আলম, সাবেরা মুস্তাফা, আয়েশা আখতার, জোহরা

তারা, রানী সরকার প্রমুখ। এছাড়াও যে সব স্বনামখ্যাত নারী মহিলাদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন, অংশগ্রহণ করতেন তাঁরা হচ্ছেন বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, বেগম সুফিয়া কামাল, নূর জাহান মুর্শেদ, সেলিনা বাহার জামান প্রমুখ। এরা ছাড়াও ষাট ও সত্তর দশক থেকে মহিলা ও শিশুদের অনুষ্ঠান, শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন জোবেদা খানম, জাহানারা ইমাম, নুরুন্নাহার ফয়জুননেছা, লায়লা সামাদ, জুবাইদা গুলশান আরা, কাজী মদিনা, ড. বেগম জাহানারা, রশিদা জামান প্রমুখ।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবরে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করেন এবং মৌলিক গণতন্ত্র নামে রাজনৈতিক দর্শন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ মানুষের নেতিবাচক মনোভাব, অবিশ্বাস এবং বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের কঠোর সমালোচনার মোকাবিলা করতে আইয়ুব সরকার সুকৌশলে বেতারকে ব্যবহার করেন। সরকারী নির্দেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বেতার কেন্দ্র থেকে গ্রামবাংলার শ্রোতাদের অনুষ্ঠান 'বুনিয়াদী গণতন্ত্রের আসর" চালু করা হয়েছিল। ঢাকা কেন্দ্রের বুনিয়াদী গণতেন্ত্রর আসরে 'মজিদের মা' হিসেবে যিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তাঁর নাম ছিল আয়েশা আখতার।

বেতারের সব কেন্দ্রেই পুরুষ ঘোষকদের পাশাপাশি মহিলা ঘোষিকারা অনুষ্ঠান ঘোষণা বা উপস্থাপনায় সম্ভব অংশ নিয়েছেন এবং তাদের কণ্ঠ মাধুর্য ও উপস্থাপনা কৌশলে শ্রোতাদের প্রীতি অর্জন করেছেন। ষাট/সত্তর দশকের অনুষ্ঠান ঘোষিকাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হাসিনা মওলা, আজমেরী জামান রেশমা, রোকেয়া আব্বাস, রাজিয়া হোসেন চৌধুরী, বিলকিস বেগম, কাজী হোসনে আরা, হেনা কবির, আফরোজা বানু প্রমুখ।

সারা পাকিস্তানব্যাপী বাংলা সংবাদ পাঠিকা হিসেবে সাহিত্যিক দিলারা হাশেমের খ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। প্রথমে অনুষ্ঠান ঘোষিকা হিসেবে এবং পরে অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে দিলারা হাশেম রেডিও পাকিস্তানে চাকরিও করেছেন কিছুকাল। এরপর তিনি ভয়েস অব আমেরিকায় চলে যান।

ঢাকা বেতার কেন্দ্রে হাতে গোনা দু'তিন জন মহিলা অনুষ্ঠান প্রযোজক ছিলেন। তাদের মধ্যে হামিদা খানম ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে যোগ দেন এবং পরে উপ-পরিচালক হিসেবে অবসর নিয়ে ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে সদস্যপদ লাভ করেন। পাকিস্তানি আমলে ঢাকা বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক বিশিষ্ট বেতার ব্যক্তিত্ব সৈয়দ জিল্লুর রহমানের বোন সৈয়দা হাসিনা রহমান প্রথমে অনুষ্ঠান প্রযোজক এবং পরে স্কুল ব্রডকাস্টিং অফিসার হিসেবে ১৯৬৪ সালে বেতারে যোগ দেন। ১৯৭২ সালে তিনি বেতারের পরিচালক, শিক্ষা হন এবং পরবর্তীকালে উপ-মহাপরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। উপ-মহাপরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ বেতারে তিনিই একমাত্র প্রথম মহিলা কর্মকর্তা। সুফিয়া খানম

সম্ভবত ১৯৬৬ সালে বেতারে শ্রোতা গবেষণা অফিসার হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৭২ সালে লিয়াজোঁ ও রেফারেন্স শাখার পরিচালক হন। পরে অবশ্য তিনি স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে বিদেশ চলে যান এবং বিদেশেই মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে ঢাকা বেতারে যোগদান করেন দিলরুবা বেগম। শামসুন্নাহার বেগম, ইসমত আরা, আমাতুজ জোহরা, হোসনে আরা, মনোয়ারা বেগম ১৯৭০ সালে যোগদান করেন।

প্রযোজক হিসেবে সে সময়ে বা পরবর্তী সময়ে আরও কয়েকজন মহিলা যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু পারিবারিক কারণে অনেকেই চাকরি ছেড়ে চলে যান। আমাতুজ জোহরা উপআঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে শামসুন্নাহার বেগম আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে এবং দিলরুবা বেগম আঞ্চলিক পরিচালক ও পরিচালক হিসেবে বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের পর ঢাকা কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নারীর অবদান

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে চট্টগ্রাম কালুরঘাট ট্রান্সমিটার থেকে যখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রথম যাত্রা শুরু হয়েছিল তখন এই ভূ-খণ্ডে বাঙালি জাতির অস্তিত্বের সংগ্রাম, বাঁচার সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার ছিল বেতার। সে সময়ে বেতারে নারীর অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত দুরূহ। তথাপি সেই বিপদসঙ্কুল অবস্থায় কালুর ঘাটের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন অধ্যাপিকা তমজিদা বেগম, অনুষ্ঠান ঘোষিকা কাজী হোসনে আরা, ডা. মঞ্জুলা আনোয়ার ও বেগম মুশতারি শফী। কলকাতা থেকে স্বাধীন বাংলা বেতারের কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ে অনেক মহিলাই দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে কাজ করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে হানাদার শত্রুদের পরাজয় আর মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্য নিয়ে সে সময় যারা সংবাদ পাঠ করতেন তাঁদের মধ্যে পারভীন হোসেন ও জেরীন আহমেদ (নাসরিন আহমদ) উল্লেখ্য। সাহস ও আত্মত্যাগের সঞ্জিবনী ধারায় বাঙালি জাতিকে উদ্দীপ্ত করতে পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে অগ্নিঝরা কথিকা পাঠ করতেন ডা. নুরুন্নাহার জহুর, আইভি রহমান, মুশতারি শফী, জলি জাহানুর, মাহমুদা খাতুন, বাসনা গুণ, দীপ্তি লোহানী, রেবা আখতার, শওকত আরা আজিজ ও পারভীন আখতার। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কবিতা লিখে যারা পাঠ করতেন তাঁদের মধ্যে কবি কাজী রোজী অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধের সংগীত, পুঁথি পাঠ ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন সানজিদা খাতুন, কল্যাণী ঘোষ, শেফালী ঘোষ, হেনা বেগম, স্বপ্না রায়, মালা খান, মাধুরী আচার্য, নমিতা ঘোষ, মঞ্জুলা দাশগুপ্ত, উমা চৌধুরী, ঝর্ণা ব্যানার্জি, কল্যাণী মিত্র, মঞ্জুশ্রী নিয়োগী. লীনা দাশ, সকিনা বেগম, অনীতা বসু, নীনা, কণা, রিজিয়া সাইফুদ্দিন,

রেহানা বেগম, অমিতা সেনগুপ্ত, মিনু রায়, রীতা চ্যাটার্জি, শান্তি মুখার্জি, ভারতী ঘোষ, শেফালী স্যান্নাল, অরুণা সাহা, গীতশ্রী সেন, মলিনা দাশ, জেরিন আহমদ, শাহীন মাহমুদ, মিতালী মুখার্জি ও আফরোজা মামুন। নাট্যকার, নাট্য প্রযোজনা ও নাট্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা দেবী, করুনা রায়, মাসুদা নবী, অমিতা বসু, লায়লা হাসান, নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়, কাজী তামান্না, উম্মে কুলসুম, সুফিয়া খাতুন, তাজিন শাহনাজ মুর্শিদ ও দিলশাদ বেগম।

বাংলাদেশ বেতারে কর্মী নারী

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। সেদিন থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নামকরণ করা হয় "বাংলাদেশ বেতার"। ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ বেতারের পুনর্গঠনের কাজে পুরুষের পাশাপাশি কিছু সংখ্যক নারীও অংশগ্রহণ করেন। কেউ যোগ দেন অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে কেউবা নিজস্ব শিল্পী হিসেবে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সাল থেকে অনুষ্ঠান প্রযোজক বা অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যারা বেতারে যোগ দিয়েছিলেন তারা হচ্ছেন—ফাতেমা রহমান, দুররে বেগম, ফাতেমা বেগম, মোখলেসা খাতুন, কামরুন্নাহার, শামিমা খান, নূর-এ-গুলশান হাবিব, রোকসানা সাদ, রওশন আরা চৌধুরী, সুরাইয়া বিলকিস, রাজিয়া সুলতানা, আলতাফুন্নেসা, সাজেদা খাতুন, ফাতেমা খায়রুন্নেসা, শাহানা পারভীন, দিলরুবা খানম, জাকিয়া বেগম, ইয়াসমিনুল হুদা, হাসিনা বেগম, শেরিনা সরকার ও রওশন আরা কবির প্রমুখ। বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান অধ্যক্ষ কামরুন্নেসা হাসান (মেনকা হাসান) স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই ছিলেন বেতারের অনুষ্ঠান ঘোষিকা। পরে তিনি অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে বেতারে বেশ কিছুকাল চাকরি করার পর বিটিভিতে যোগদান করেন। নব্বই সালের পরে বিসিএস তথ্য ক্যাডারে বেশ কয়েকজন মহিলা কর্মকর্তা অনুষ্ঠান সংগঠক হিসেবে যোগদান করেন। এরা হচ্ছেন নিলুফার নাজনীন, মর্জিনা বেগম, শাম্মি আরা চৌধুরী, শাহনাজ বেগম, তৌহিদা চৌধুরী, রওনক জাহান, বদরুন নাহার সালাম ও সামিয়া রুবাইয়াত হোসেন (বর্তমানে টেলিভিশনে বার্তা প্রযোজক)। বিসিএস তথ্য ক্যাডারে বার্তা বিভাগে সহকারী বার্তা পরিচালক হিসেবে যারা কাজে যোগ দিয়েছিলেন তারা হচ্ছেন বেগম হোসনে আরা তালুকদার, শাহীন ইসলাম, কোহিনূর বেগম, আখতার জাহান এবং পরবর্তীতে তানিয়া নাজনীন, সুহেলিয়া খান ও নাহিদ নাজ। বার্তা বিভাগে বর্তমানে সর্বমোট ৭ জন মহিলা কর্মকর্তা নিযুক্ত আছেন। বেতার সাংবাদিকতায় ইতোমধ্যেই তারা তাদের প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৌশল বিভাগে মহিলা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সংখ্যা নগণ্য। আঞ্চলিক প্রকৌশলী শরীফা বানু, দিলরুবা

সিদ্দিকা ও ফারজানা আফরোজ সহ সর্বমোট তিনজন মহিলা বেতার প্রকৌশলী বর্তমানে কর্মরত। প্রশাসন শাখায় কোনও মহিলা কর্মকর্তা নেই। হাতে গোনা দু'চারজন মহিলা স্টেনোগ্রাফার, করণিক এবং কিছু চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছেন। বেতারের সব কেন্দ্রে নিজস্ব শিল্পী হিসেবে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা আছেন। প্রায় চারশো নিজস্ব শিল্পীর মধ্যে মহিলা শিল্পীর সংখ্যা মাত্র ৭০ জন। এদের মধ্যে কেউ নাট্য প্রযোজক, কেউ নাট্যশিল্পী, কেউ প্রযোজনা সহকারী, কেউ অনুষ্ঠান ঘোষিকা বা অনুষ্ঠান উপস্থাপক, কেউ টেপ রেকর্ড লাইব্রেরিতে কাজ করেন। বেতনভুক্ত নিজস্ব শিল্পী ছাড়াও মাসিক চুক্তির ভিত্তিতে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা কর্মী সকল বেতার কেন্দ্রেই অস্থায়ীভাবে কাজ করে থাকেন। পারফর্মিং আর্টিস্ট হিসেবে সব বেতার কেন্দ্রেই নারী ও পুরুষ শিল্পীদের সংখ্যা সমানুপাতিক বলা যায়। সঙ্গীত বিভাগে কোনও মহিলা সঙ্গীত পরিচালক বা মহিলা বাদ্যযন্ত্রী নেই। কখনই কোনও মহিলা সঙ্গীত শিল্পী বা বাদ্যযন্ত্রী বেতারে নিজস্ব সঙ্গীত পরিচালক বা নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রী হতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

সংগীত ও নাট্যশিল্পী

স্বাধীনতা পূর্বকাল অর্থাৎ পাকিস্তানী আমলে ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বেতারের নাট্যশিল্পী হিসেবে যারা খ্যাতি অর্জন করেছেন তারা হচ্ছেন—মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, জাহানারা আহমেদ, আয়েশা আখতার, আজমেরী জামান রেশমা, নাসিমা খান, মিরানা জামান, দিলারা জামান, রওশন জামিল, সুমিতা দেবী, মাজেদা মল্লিক শর্মিলী, আলেয়া ফেরদৌসী, ফেরদৌসী মজুমদার, ডলি আনোয়ার, নূর-ই-হাফজা, সুবর্ণা মুস্তাফা, ডলি জহুর, লুৎফুন নাহার লতা, লাকী ইনাম, কেয়া চৌধুরী, রুবি আফরোজ, আফরোজা বানু, তরু মোস্তফা, নাজমা আনোয়ার, তাহিরা দিল আফরোজ, রীনা সুলতানা, শিরীন বকুল, কাজী তামান্না, লায়লা হাসান ও নাসিমা খান মজলিস। সংগীতে অবদান রেখেছেন প্রথিতযশা ফেরদৌসী রহমান, সানজিদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, আঞ্জুমান আরা বেগম, ফিরোজা বেগম, রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমিন, শাহনাজ রহমাতুল্লাহ, হাসিনা মমতাজ, নীনা হামিদ, ফরিদা পারভীন, জিনাত রেহানা, রওশন আরা মুস্তাফিজ, শবনম মুশতারী, নিলুফার ইয়াসমীন, শাকিলা জাফর, আবিদা সুলতানা, শাম্মী আখতার, সামিনা চৌধুরী, বেবী নাজনীন, ফাতেমাতুজ্জোহরা, ফেরদৌস আরা, শিখা রানী দাস, আরতি ধর, ইফফাত আরা দেওয়ান, পাপিয়া সারোয়ার, মীনা বড়ুয়া, কনক চাঁপা, শাহীন সামাদ, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, মিতা হক, দিলরুবা খান ও শেফালী ঘোষ। সংবাদ পাঠে আসমা আহমেদ, উর্মী রহমান (বর্তমানে উভয়েই যুক্তরাজ্য প্রবাসী) শ্রোতাদের কাছে নিজেদের সুনাম প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলাদেশ বেতারে অনেক জনপ্রিয় গানের সফল গীতিকার জেবুন-নেসা-জামাল, কাজী লতিফা হক, আমিনা চৌধুরী, লায়লা চৌধুরী, সায়মা চৌধুরী, কাজী রোজী ও খোশনুর আলমগীর প্রমুখ। এরা

ছাড়াও আরও অনেক মহিলা কবি ও গীতিকার গানের বাণী রচনায় তাঁদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

বর্তমানে বেতারে কর্মী হিসাবে নারীর অংশগ্রহণ

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র সংখ্যা বেড়েছে। একটি বেসরকারী বেতার কেন্দ্রও চালু হয়েছে। তবে সে অনুযায়ী বেতার কেন্দ্র সমূহে মহিলা কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। বেতারের অনুষ্ঠান, বার্তা, প্রশাসন বিভাগে কর্মকর্তা পর্যায়ে যে সকল পদ আছে তাতে নিয়োগ পেতে হলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হলে মেধা অনুসারে নিয়োগ পাওয়া সম্ভব। আগের মতো সরাসরি নিয়োগের কোনও সুযোগ নেই। পুরুষের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার হার কম, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বিসিএস ক্যাডারে মেয়েদের পাশের হারও কম। মেয়েরা যারা বিসিএস ক্যাডারে উত্তীর্ণ হন নানাবিধ কারণে বেতারের চাকরি তাদের কাছে আকর্ষণীয় নয়। পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য তারা প্রশাসন বা অন্য সার্ভিসের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করে থাকেন। এসব কারণেই বাংলাদেশ বেতারে চাকরিজীবি মহিলার সংখ্যা অত্যন্ত কম। বাংলাদেশ বেতারে বর্তমানে মোট পদ সংখ্যা ২৬৮৯, এর মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা মাত্র ৩২ জন। অন্যদিকে বেসরকারি রেডিও মেট্রোওয়েভেও চাকুরিজীবি নারীদের সংখ্যা কম।

বেতারে নারীর উপস্থাপন

চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে নারীদেরকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়, যেভাবে যৌন আবেদনমূলক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয় বেতারে তা সম্ভব নয়। কেননা বেতার শুধুমাত্র শ্রবণ মাধ্যম। বেতারে নারীর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু নীতি মেনে চলা হয়।

- নাটকে নারীকে কোন ও ঘৃণ্য বা নৃশংস চরিত্রে ব্যবহার করা হয় না।
- বেতারে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা বা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে নারী ও পুরুষ কণ্ঠকে একই রকম গুরুত্ব দেয়া হয়।
- বেতারের নারীদের হেয় করে কোনও অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় না। বরং নারীদের শিক্ষা, আত্মউন্নয়ন, উপার্জনমুখী কর্মকাণ্ড, মাতৃ ও শিশু-স্বাস্থ্য, শিশু ও নারী অধিকারের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে নানাবিধ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এসব কারণে বেতারে নারীদের অবমূল্যায়ন বা বিকৃত উপস্থাপনার কোনও সুযোগ নেই।

বেতারে কর্মী নারীদের সমস্যা

বেতারে আমি চৌত্রিশ বছর চাকরি করেছি। পুরুষ সহকর্মীদের মতো মেয়ে সহকর্মীরাও ছিল আমার ভালো বন্ধু। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, বেতারে নারীদের

কাজ করার ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা অতীতেও ছিল না এখনও নেই। শিল্পী অথবা কর্মী হিসেবে যে সকল নারী বেতারে এ যাবৎকাল কাজ করেছেন তারা পুরুষ সহকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতা নিয়েই সম্মানের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে একটি কথা এখানে আমি উল্লেখ না করে পারছি না। বেতারে কিছু সংখ্যক মহিলা অফিসারকে অত্যন্ত মেধাবী, পরিশ্রমী হিসেবে লক্ষ করেছি। ভালো অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য তারা বিনা বাক্যব্যয়ে যে কোনও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে, কষ্ট স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করেননি। তাদের প্রতিভা আর সৃজনশীল দক্ষতা আমাকে বিমোহিত, চমৎকৃত করেছে। আবার কিছু অফিসারকে দেখেছি তারা অত্যন্ত আয়েশি, অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও নির্মাণে গতানুগতিক। শ্রমসাধ্য কাজে বা অনুষ্ঠান নির্মাণে বাইরে যাবার ব্যাপারে ব্যক্তিগত সমস্যা, পারিবারিক সমস্যার দোহাই দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। অথচ বিদেশে যাবার ব্যাপারে এরাই অন্যদের ডিঙিয়ে সব সমস্যার উর্দ্ধে চলে যেতে দ্বিধা করেননি। আমার এ মন্তব্যের জন্য দুঃখিত। তবে বেতারে পুরুষ অফিসারদের মধ্যেও সুবিধাভোগী অথচ মেধাহীন, কর্মভীরু মানুষের সংখ্যাও কম নেই।

বেতারে নারী কর্মীর অংশগ্রহণ বাড়াতে কিছু সুপারিশ

- শুধুমাত্র অনুষ্ঠানে গতানুগতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে বেতারের কর্মযজ্ঞে মেয়েদের ভূমিকা ফলপ্রসূ করা সম্ভব নয়। যে দেশে নারীর সংখ্যা পুরুষের সমান সে দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতিতে নারীর সমান অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়। দেশ ও জাতির উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে যেসব সমস্যা বিরাজ করছে যেসব সমস্যা দূরীকরণে জনউদ্বুদ্ধকরণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির কাজে বেতারকে যথোপযুক্ত ব্যবহার করতে হলে বেতারের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন পদে প্রতিভাময়ী, মেধাবী, শিক্ষিত তরুণীদের নিয়োগ অবশ্যই প্রয়োজন। এজন্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক নিয়োগ ছাড়াও বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে ঐ অঞ্চলের শিক্ষিত, শিল্প-সংস্কৃতি অনুরাগী নারীদের জন্য কোটা রাখা হলে বেতারের বিভিন্ন পদে নারীদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমি মনে করি।

- নতুন বেতার কেন্দ্রগুলোতে পদ কাঠামো তৈরি করা হলে এবং অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হলে আঞ্চলিক পর্যায়ে মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা বৃদ্ধি পাবে, মেয়েদের মেধা, প্রতিভা ও জ্ঞান বিকাশের পথ উন্মুক্ত হবে।

- শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে মেয়েদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী নারী ও শিশুদের অধিকারের বিষয়সহ তাদের সমস্যা, সংগ্রাম, সাফল্য, ব্যর্থতা সব বিষয়ই প্রতিদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হচ্ছে। এসব

অনুষ্ঠান স্টুডিও ভিত্তিক না করে মাইক্রোফোন আর রেকর্ডিং মেশিন নিয়ে প্রযোজকদের নিয়মিতভাবে গ্রাম-গঞ্জে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা, তাদের সমস্যা তাদের দ্বারাই চিহ্নিত করা, সমস্যা মোকাবিলায় তাদের সংগ্রাম ও সাফল্যের কথা অনুষ্ঠানে তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রতিটি আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র সমূহের উদ্যোগে গ্রাম-গঞ্জে গ্রামীণ শ্রোতা ক্লাব গঠন করে এসব অনুষ্ঠান শোনাবার ব্যবস্থা নেওয়া হলে অনুষ্ঠানের ভালো-মন্দ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সহ তাদের মতামত ও চাহিদা নিয়মিত জরিপ করা হলে বেতারের সাথে মহিলা শ্রোতাদের একটা আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হবে, জীবন সংগ্রামে তারা আরও শক্তি ও সাহস খুঁজে পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

উপসংহার ঃ পরিশেষে শুধু এইটুকু বলতে চাই নারীরা বেতারে শুধু অলংকারের মতো নয়, কবিতার মতো নয়, গানের মতো নয়—এই অসময়ের ক্রান্তিকালে বেতারে নারীরা হোক নির্ভয় সত্যভাষী শব্দ সৈনিক এবং দুঃখী অসহায় মানুষের বন্ধু, চিরকালের শব্দ বন্ধু, ভালোবাসার বন্ধু।

স্বল্প পরিসরের এই নিবন্ধে বেতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক মহিলার কথাই হয়তো অনুল্লেখ রয়ে গেছে, অনুল্লেখ রয়ে গেছে তাদের অবদানের কথা। আমার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে কোথাও কোথাও হয়তো তথ্য বিচ্যুতিও ঘটে গেছে। এ জন্যে আমি দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। যদি কেউ আমাকে সেসব বিচ্যুতি সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারেন আমি তা সানন্দে গ্রহণ করব।

[বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কম্যুনিকেশন আয়োজিত 'গণমাধ্যমে নারী' সেমিনারে (তারিখ ২৬ এপ্রিল ২০০৩) নিবন্ধটি পঠিত এবং আলোচিত। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তিকালে কিছু কিছু অংশ সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়েছে।]

একাত্তরের বধ্যভূমি ঃ গল্লামারীর খুলনা বেতার

"…. হে অজ্ঞাত বীর, শোনো,
তোমার সংগ্রামী স্মৃতি মাছের কাঁটার মতো লেগে
আছে আমাদের বিবেকের শীর্ণ গলায় নিয়ত।"
—শামসুর রাহমান

অক্টোবর' ১৯৯৯

[স্বাধীন বাংলা বেতারের অন্যতম উদ্যোক্তা মুক্তিযোদ্ধা আমার প্রিয় সহকর্মী শামসুল হুদা চৌধুরী (একাত্তরের রণাঙ্গন গ্রন্থের প্রণেতা) অবরুদ্ধ বাংলাদেশে হানাদার পাক বাহিনী কবলিত ছয়টি বেতার কেন্দ্রের তৎকালীন অবস্থা নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন খুলনা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে কিছু স্মৃতিচারণ মূলক লেখা লিখতে। কেননা স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে আমি ছিলাম খুলনা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সংগঠক। আমার ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল না। তবু শামসুল হুদা চৌধুরী সাহেবের অনুরোধে ছেঁড়া খোঁড়া স্মৃতির উপর নির্ভর করে কিছু একটা লিখে দিয়েছিলাম। সময়টা ছিল সম্ভবত ১৯৭৩ সাল। তারপর দীর্ঘ সময় চলে গেছে। শামসুল হুদা চৌধুরী, আঞ্চলিক পরিচালক হিসাবে অবসর নিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু সেই ১৯৭৩ এর পরিকল্পনা তিনি বাস্তবায়ন করতে পারেন নি। আমিও সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম ঐ রচনাটির বিষয়ে। ১৯৯৯ এর আগস্টে হঠাৎ করেই শামসুল হুদা আমাকে টেলিফোন করে জানালেন যে এখনও তার কাছে আমার স্মৃতি কথা সযত্নে রক্ষিত আছে। গ্রন্থ প্রকাশ না করতে পারায় তিনি লেখাটি ব্যবহার করতে পারেননি। তাই তিনি এটা আমাকে ফেরত দিতে চান। সে সঙ্গে অনুরোধ করলেন লেখাটি যেন আমি অবহেলায় নষ্ট না করি এবং প্রকাশের ব্যবস্থা নিই। কেননা ভবিষ্যতে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস গবেষণায় এসব স্মৃতিচারণ মূলক লেখার একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের পাঠকেরাও এসব লেখার ভেতর দিয়ে জানতে পারবে সেই সব দুঃসময়ের ঘটনাবলি, স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্মম ইতিহাস। ছাব্বিশ বছর আগের বিস্মৃত পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে আমি আনন্দিত হলাম। মনে হল আমি যেন ২৬ বছর পর আমার হারানো সন্তান খুঁজে পেয়েছি। নতুন করে লেখাটি পড়লাম। আমার স্মৃতি নির্ভর বর্ণনায় বিভিষীকাময় সেই অবরুদ্ধ দিনগুলির কথা স্বল্পপরিসরে লিখতে হয়েছিল বলে অনেক তথ্য, অনেক ঘটনাই বলা হয়নি। স্মৃতিচারণে কোথাও কোথাও আমার ব্যক্তিগত আবেগ, কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। সময়ের দাবিতে লেখাটি আবার পরিমার্জন করা যেত। কিন্তু করলাম না। প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিতে না পারলেও মনে প্রাণে আমি সেই মহান যুদ্ধের অংশীদার, একজন প্রত্যক্ষদর্শী। আমার এই দুর্বল রচনায় আর কিছু না থাক আমার হৃদয়টুকুতো আছে। এই হৃদয়ের স্পন্দন যদি কোনও পাঠক অনুভব করতে পারেন তা হলে সেই টুকুই আমার বড় প্রাপ্তি। সেই হৃদয়টুকুই আমি সাহসভরে নিবেদন করছি হৃদয়বান পাঠকদের জন্যে।]

অক্টোবর' ১৯৭০

রেডিও পাকিস্তানের প্রোগ্রাম অর্গানাইজার হিসাবে আমি চট্টগ্রাম থেকে খুলনায় বদলী হয়েছিলাম উনিশ শো সত্তর সালের অক্টোবরে। খুলনা শহর থেকে প্রায় তিন চার মাইল দূরে নির্জন গল্লামারী বিলের মধ্যে বেতারের ট্রান্সমিটার ভবন সদ্য মাত্র সমাপ্ত হয়েছে। অনুষ্ঠান প্রচারের কাজ শুরু হতে তখনও অনেক দেরি। এমন কি সে সময়ে দপ্তরের কাজই শুরু করা যায়নি। চেয়ার, টেবিল ছিল না, দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য কোনও কাগজপত্র বা ফাইল পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু এই শূন্য অবস্থা থেকেই আমাদের কাজ করতে হয়েছিল। কাজ চালানোর জন্যে বাইরে থেকে চেয়ে চিন্তে আনা হয়েছিল কয়েকটা টেবিল চেয়ার। নিউজপ্রিন্ট মিলের কয়েকজন সজ্জন বন্ধু দিয়েছিলেন কিছু কাগজ।

যেহেতু আনুষ্ঠানিকভাবে দপ্তরের কাজ শুরু হয় নি সে কারণে আমরা সবাই ট্রান্সমিটার ভবনেই মেসের মতন করে থাকতাম। গল্লামারীর বিলে তখন প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। খাওয়া দাওয়াও বেশ সস্তা ছিল। ট্রান্সমিটার ভবনের মেসে আগে থেকেই ছিলেন সিনিয়র ইনস্টলেশন ইঞ্জিনিয়ার আলাউদ্দিন আহমেদ, রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ার বজলুল হালিম চৌধুরী, ইনস্টলেশন ইঞ্জিনিয়ার মাহবুবুর রহমান, রেডিও ইঞ্জিনিয়ার সাদত হোসেন, আঞ্চলিক পরিচালক ইব্রাহিম আখন্দ, অনুষ্ঠান সংগঠক হিসাবে আমি এবং অনুষ্ঠান সংগঠক গোলাম কবির। অনুষ্ঠান প্রযোজকদের মধ্যে প্রথম যোগদান করেন মুন্সী আহসান কবির ও সামছুর আলী বিশ্বাস এবং পরে আবদুস সাত্তার শেখ ও ওয়ালীউর রহমান।

ট্রান্সমিটার ভবনে সারাটা দিনমান আমাদের কেটে যেত শিল্পীদের সাক্ষাৎকার এবং তাদের কণ্ঠস্বর পরীক্ষা গ্রহণ করে। দপ্তরকে সংগঠিত এবং অনতিবিলম্বে অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করবার লক্ষ্য নিয়ে অনুষ্ঠান পরিকল্পনার কাজে আমরা সবাই এমন মগ্ন থাকতাম যে ঐ নির্জন গল্লামারীর বিল কখনই নিরানন্দ মনে হত না। রাত্রে আমরা ট্রান্সমিটারের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য টেস্ট প্রোগ্রামে বাছাই করা গান বাজাতাম। শ্রোতাদের চিঠিপত্রও পেতাম প্রচুর। চিঠি আসতো বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা অঞ্চল ছাড়াও ভারতের সুদুর আসাম, আসানশোল, বিহার, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান থেকে।

নভেম্বর মাসে খুলনা বেতার কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনীর জন্য অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, শিল্পী নির্বাচন এবং প্রচার সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু ১২ই নভেম্বর প্রলয়ংকরী ঝড় আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডব লীলায় সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের জনজীবন তখন বিধ্বস্ত। সুতরাং কোনওরূপ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ৪ ডিসেম্বর থেকে আমাদেরকে অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করতে হয়েছিল। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সকাল ও সন্ধ্যায় দুটি অধিবেশনে অনুষ্ঠান প্রচারে অনেক প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমরা ক্লান্তিহীন শ্রম দিয়ে নতুন সৃষ্টির আনন্দ নিয়ে শুরু

থেকেই সঙ্গীত, নাটক, শিশুদের অনুষ্ঠান, মহিলাদের অনুষ্ঠান, সাহিত্য, শিল্পসহ বিভিন্ন আর্থসামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে নানা ধরনের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান প্রচার করতে সমর্থ হয়েছিলাম। খুলনা ও যশোরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষকসহ সর্বস্তরের মানুষ বিপুল আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে আমাদের সাহায্য করেছিলেন।

জানুয়ারি ১৯৭১—ডিসেম্বর ১৯৭১

অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হবার পূর্বেই আমরা ট্রান্সমিটার ভবনের মেস ত্যাগ করেছিলাম। সরকারী বাসা বরাদ্দ না পাবার কারণে তখনও চট্টগ্রাম থেকে আমার স্ত্রীকে আনতে পারিনি। অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে বয়রাতে ছোটো খাটো একটি সরকারী বাসা বরাদ্দ পাবার সাথে সাথেই আমি চট্টগ্রাম চলে গিয়েছিলাম আমার স্ত্রী, কন্যাকে আনতে। তাদেরকে নিয়ে ট্রেনে চট্টগ্রাম থেকে যশোর পৌঁছেছিলাম মার্চের দু তারিখে। যশোর টাউনের পুরাতন কসবায় আমাদের নিজস্ব বাড়ি। ভেবেছিলাম ঐদিন যশোরে বিশ্রাম নিয়ে পরদিন সকালেই খুলনা চলে যাব। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৩রা মার্চ থেকেই সারা দেশ ব্যাপী শুরু হল সংগ্রামী জনতার প্রতিবাদ। শুরু হল হরতাল, ব্যারিকেড প্রতিরোধ, বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পাক আর্মিদের গুলি বর্ষণ। ফলে তের চৌদ্দ দিন পর্যন্ত আমাকে আটকা পড়ে থাকতে হল যশোরে। এরপর জনজীবন একটু সহজ হয়ে এল। খুলনা-যশোর বাস চলাচল শুরু হওয়া মাত্রই স্ত্রীকে যশোরের বাসায় রেখে আমি একাই গেলাম খুলনায়। গণ আন্দোলনের জোয়ারে তখন প্রতিটি শহর, বন্দর, গ্রামগঞ্জ উত্তাল। প্রতিটি প্রাণ যেন তাজা আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে আগুনের উত্তাপ এসে পড়েছে সরকারী দপ্তরেও। বেতারের ট্রান্সমিটার ভবনে আগে ছিল পুলিশ পাহারা। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার আগেই সেখানে দেওয়া হল পাঞ্জাবি সৈন্য। কড়া পাহারা আর নিষেধ সত্ত্বেও খুলনা বেতার কেন্দ্র থেকেও প্রচারিত হতে লাগল স্বাধিকার আন্দোলনের স্বপক্ষে গান, কবিতা, সংবাদ, কথিকা। আমি অনুষ্ঠানের কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমার সদ্য প্রাপ্ত বাসার সংস্কার, চট্টগ্রাম থেকে আনা জিনিসপত্র বাসায় গোছগাছ করে রাখা নিয়ে ব্যস্ত। আন্দোলন, মিছিল সত্ত্বেও পরিস্থিতি কিছুটা শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক দেখে আমার স্ত্রী ২০শে মার্চ যশোর থেকে চলে এল খুলনায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ২১শে মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম থেকে হঠাৎ করে আমার শাশুড়ী খুলনায় এসে উপস্থিত। গোপন সূত্রে তিনি জানতে পেরেছেন পঁচিশে মার্চে মারাত্মক রকমের গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আসলে তিনি করাচি থেকে একটি গোপন বার্তা পেয়েছিলেন পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে কর্মরত তাঁর বোনের ছেলে সাইফুল আজমের কাছ থেকে। পঁচিশে মার্চ তারিখে আর্মি ক্রাক

ডাউনের আভাস দিয়ে তিনি সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাই আমার শাশুড়ী তাঁর কন্যা নাতনীদেরকে এ সময় খুলনায় একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুখে একা ছেড়ে দিতে রাজী নন। বললেন, তিনি ওদেরকে কালই চট্টগ্রাম নিয়ে যাবেন এবং পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক থাকে এবং কোনও গণ্ডগোল না হয় তবে তিনি এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে নিজে ওদেরকে খুলনায় রেখে যাবেন। আমি কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেও বেশি আপত্তি করলাম না এবং তিনি পরদিনই ওদেরকে নিয়ে চট্টগ্রাম চলে গেলেন।

পঁচিশে মার্চ। সন্ধ্যা বেলায় আমি আর গোলাম কবির শহরের একটা পরিচিত দোকানে বসে আড্ডা ও গল্পগুজব করছিলাম। এক সময় আমি ঐ দোকান থেকেই ফোন করলাম চট্টগ্রামে। কথা বললাম আমার স্ত্রীর সঙ্গে। বললাম, বিপর্যয়ের তো কোনও আলামত দেখছিনা। সুতরাং দু'চার দিনের মধ্যেই তুমি চলে এস। গোলাম কবিরও টেলিফোন করল রংপুরে। সেখানে তার আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলল। এর মধ্যে খবর পেলাম, ভূট্টো এবং এহিয়া খান ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন। শুনে আমরা হাসলাম। বললাম, ওরা বোধ হয় এবার ভয়ে রণে ভঙ্গ দিলেন এবং আগামী কাল থেকে বোধ হয় আমরা সত্যি সত্যিই স্বাধীন। যাহোক রাত দশটার দিকে আমাকে বয়রার বাসায় পৌঁছে দিয়ে গোলাম কবির চলে গেল। আসবার পথে আমি সেবা প্রকাশনীর একটা রহস্য উপন্যাস মাসুদ রানা কিনে এনেছিলাম। তাই একাকী শুয়ে শুয়ে পড়লাম রাত দেড়টা পর্যন্ত। তারপর বাতি নিভিয়ে ঘুম।

শেষ রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল অবিরাম গোলাগুলির আওয়াজে। গুলি এসে লাগছে বাইরে ঘরের দেয়ালে, লাইট পোস্টে। কেন এই গুলি, কিসের জন্য, কারা গুলি করছে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্যে অত রাতে বাইরে বেরুবার সাহসও হল না। এমনকি বিছানা থেকেও উঠতে ভয় পেলাম। গুলি খাবার ভয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলাম। সকাল ন'টার দিকে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। দরজা খুলতেই দেখি পাশের ফ্লাটের প্রতিবেশী ভদ্রলোক ভীত সন্ত্রস্ত চেহারায় দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, কাণ্ড দেখেছেন? আর্মিরা মাঝ রাত থেকেই পজিশন নিয়ে কেমন গোলাগুলি শুরু করেছে। রাস্তায় যাকে দেখছে তাকেই নির্বিচারে গুলি করে মারছে। আমি বললাম, আমি তো কারণ কিছুই বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোক বললেন, ঢাকা রেডিও শোনেন নি? শেখ মুজিব গ্রেপ্তার, মার্শাল ল জারী হয়েছে। ঢাকা রেডিও থেকে কোরান তেলাওয়াত আর মাঝে মাঝে ফরমান জারী হচ্ছে। ভদলোককে বিদায় দিয়ে ঢাকা রেডিও টিউন করলাম। ভদ্রলোকের কথাই সত্যি। পঁচিশ দিনের সংগ্রামী জনতার কণ্ঠ আজ বেতারে নিস্তব্ধ। সেখানে যেন শোকের নীরব মাতম আর থেকে থেকে ক্রুদ্ধ শ্বাপদের চিৎকার। খুলনা বেতার কেন্দ্রও আজ সম্পূর্ণ মৃত।

অবরুদ্ধ অবস্থায় সারা দিন ঘরের মধ্যে বসে রইলাম। না পারলাম কারো সাথে যোগাযোগ করতে, না পারলাম ঘর থেকে বেরুতে। এর মধ্যে ২৭শে মার্চ তারিখে সন্ধ্যার পর রেডিও সেটের নব ঘুরাতে ঘুরাতে আকস্মিকভাবে শুনতে পেলাম চট্টগ্রাম

থেকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের ঘোষণা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মেজর জিয়ার সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান। সে আহ্বান যেন আমাদের মৃতপ্রায় দেহে প্রাণের সঞ্চার। চট্টগ্রাম আমার স্মৃতির শহর, যৌবনের শহর, আনন্দের শহর। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রেই আমার প্রথম চাকরি। সেখানেই ভালোবাসা, বিয়ে এবং সংসার। সেই চট্টগ্রামে একটি সশস্ত্র সংগ্রামের ক্রান্তিকালে চট্টগ্রাম বেতারের ঐতিহাসিক ভূমিকায় আমি একদিকে যেমন আনন্দিত হলাম অন্যদিকে আক্রান্ত হলাম বিষণ্নতায়। চট্টগ্রামে আমার সহকর্মী বন্ধুরা সবাই এখন শব্দ সৈনিক হিসাবে মুক্তি সংগ্রামের অংশীদার, অথচ সেখানে আমি নেই। এখানে খুলনায় আমি একা, নিঃসঙ্গ, পরিবারহীন, বন্ধুহীন, মৃত্যু ভয়ে কাঁপছি। মৃত্যুর প্রতিক্ষায় প্রহর গুনছি। চিন্তা ভাবনায় শুয়ে, বসে, অনাহারে, অনিদ্রায় দু'দিন কাটিয়ে দেবার পর অসহ্য হয়ে উঠল বন্দীদশা। তারপর সাহস করেই গোলাগুলির ভেতর দিয়ে আমার বাসার সামান্য কিছু দূরে বয়রা সার্কিট হাউজে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক ইব্রাহিম আখন্দ, সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক আব্দুল মালেক খান এবং নিউজ এডিটর শরীফ সাহেব সপরিবারে থাকতেন। তাঁদের দশাও আমার মতোই। সার্কিট হাউজের পশ্চাতে প্রায় দুশো গজ দূরে ফায়ার ব্রিগেডের নতুন অসমাপ্ত অফিস। সেখানেই পাক সৈন্যরা তাদের ঘাঁটি বানিয়েছে। সেখান থেকেই তারা নিজেদের অস্তিত্ব সুদৃঢ় করার জন্য কোনওরূপ উস্কানী আর প্রতিরোধ ছাড়াই নির্বিচারে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। সারাদিন আমি আখন্দ সাহেবের সাথেই সময় কাটালাম। এরই মধ্যে আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে আখন্দ সাহেব টেলিফোনে জরুরি নির্দেশ পেলেন খুলনা রেডিও স্টেশন অবিলম্বে চালু করার জন্য। কিন্তু আখন্দ সাহেব জানালেন, তার স্টাফ কে কোথায় আছে তা তার জানা নেই। এই গোলাগুলির মধ্যে তাদের খুঁজে বের করা এবং স্টেশন চালু করা এই মুহূর্তে অসম্ভব।

বয়রা সার্কিট হাউজের কাছেই ছিল একটি গ্রাম। ঐ গ্রামের কিছু চেনা জানা লোকজন মাঝে মধ্যে সার্কিট হাউজে এসে আমাদেরকে নানা ধরনের খবর দিয়ে যাচ্ছিল। খবর পেলাম খালিশপুরের বাঙালি অবাঙালি দাংগা শুরু হয়েছে। পাক সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত ধরনের প্রতিরোধের কিছু সংবাদও শুনতে পেলাম। বয়রা গ্রামের কিছু সংখ্যক উৎসাহী যুবক বন্দুক আর গুলি সংগ্রহ করার চেষ্টা করছিল। কেউ কেউ বন্দুক নিয়ে সার্কিট হাউজের পশ্চাতে ইটের পাঁজার আড়াল থেকে ফায়ার ব্রিগেড দপ্তরে পাক সেনাদের প্রতি লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছিল। আর মাঝে মধ্যে জয়বাংলা বলে চিৎকার করে উঠছিল। ফলে সার্কিট হাউজে যারা অবস্থান করছিলেন তাদের অবস্থা আরও সংগীণ হয়ে উঠল। অবিরাম গোলাগুলিতে টিকতে না পেরে আমরা বিকেলের মধ্যেই সার্কিট হাউজ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে আশ্রয় নিলাম। রাত্রে রেডিওতে আবার শুনলাম চট্টগ্রাম কালুর ঘাট থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতারের সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান। মেজর জিয়ার কণ্ঠসহ পরিচিত, অপরিচিত

বিদ্রোহী শব্দসৈনিকদের কণ্ঠে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর। আর ঘোষণা আমাদের মৃতপ্রায় মনে নতুন করে উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। খুলনাতে হানাদার পাক সেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবার, তাদেরকে খতম করবার অনেক জল্পনা কল্পনা করতে করতে আমরা সবাই সারাটা রাত এক গৃহস্থ চাষীর গোয়াল ঘরের ধারে একটা বেঞ্চে বসে কাটিয়ে দিলাম।

সকাল হতেই এ ভাবে নিরাপত্তাহীন ও উদ্দেশ্যহীন অবস্থায় বসে থাকা আমার কাছে অসহ্য মনে হল। তাই আবার পাক আর্মিদের শ্যেন চক্ষু ও গোলাগুলি এড়িয়ে কোনওক্রমে ফিরে এলাম বয়রাতে আমার নিজস্ব ফ্লাটে। তখন কারফিউ কিছুক্ষণের জন্য শিথিল করা হয়েছে। সেই সময়টুকুর সুযোগ নিয়ে একটা ব্যাগে কয়েকটা কাপড় নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম শহরের অন্য প্রান্তে আমার সহকর্মী গোলাম কবিরের বাসার উদ্দেশ্যে। রাস্তার দৃশ্য তখন অবর্ণনীয়। কোনও যানবাহন নেই। লোকজন প্রাণ ভয়ে ছুটে চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। রাস্তার দু'পাশের দোকান-পাট, বস্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে সেখানে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। কোথাও কোথাও লাশ পড়ে আছে। রিকশা, বাস, ট্রাক কোনওটা অগ্নিদগ্ধ, কোনওটা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে। পাক সেনারা উদ্যত রাইফেল হাতে রাস্তার মোড়ে ঘাটি বানিয়ে ওৎ পেতে বসে আছে। প্রাণটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে দু'তিন মাইল পথ হেঁটে গেলাম কবিরের বাসায় পৌঁছলাম বেলা ১১টার দিকে। ওর বাসাটা ছিল বেতার কেন্দ্রে যাবার পথেই একটা পাড়ার মধ্যে। পাক সেনারা তখনও সেখানে হানা দেয়নি। গোলাম কবিরের বাসায় পৌঁছে কিছুটা নিরাপদ বোধ করলাম। সারাদিন দু'জনে শুয়ে বসে রেডিওতে আর্মিদের অয়ারলেস মেসেজ শুনতে লাগলাম। পুলিশ, ইপিআর, আনসার, শ্রমিক, জনতা বিক্ষিপ্তভাবে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যেখানে যেখানে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে সেখানে সেখানে অয়ারলেসে পাক সেনাদেরকে লড়াই করবার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কখনও মর্টার ছুঁড়তে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কখনও গানবোট থেকে শেলিং করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। পাক সেনাদের হতাহতের সংবাদ শুনে উল্লাসে উত্তেজনায় আমরা কখনও কখনও লাফিয়ে উঠছিলাম। কখনও কখনও আর্মি হেড কোয়ার্টারে, বেতার ভবনে, পাহারারত আর্মিদের কাছে বেনামীতে টেলিফোন করে গালাগালি দিচ্ছিলাম। যাহোক এমনি করে সেদিনও রাত কাটল। পরদিন বিকেলে দেখলাম একদল বাঙালি ইপিআর, আনসার বর্ডার থেকে রাইফেল হাতে পালিয়ে এসেছে। তারা পাড়ার ভেতর দিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছিল। আমরা তাদেরকে দেখে উৎসাহে আনন্দ উৎসাহে ছুটে গেলাম। সবাই মিলে তাদেরকে অনুনয় অনুরোধ করলাম সার্কিট হাউজে অবস্থানরত আর্মি হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করতে। কিন্তু তারা রাজী হল না। দীর্ঘ পথ চলায় তারা ক্লান্ত। তা'ছাড়া পাক সেনাদের সরাসরি আক্রমণ করার জন্য যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও লোকবল দরকার তা তাদের নেই। সুতরাং তারা কোনওরূপ ঝুঁকি না নিয়েই রূপসা নদী পার হয়ে বাগেরহাটের দিকে চলে গেল।

আমি আর গোলাম কবির হতাশভাবে বাসায় ফিরে এসে বসে রইলাম। পাক সেনারা আমাদের এই বাড়িতে হানা দিলে আমরা কীভাবে প্রতিরোধ করব, কীভাবে রিট্রিট করব ইত্যাদি বিষয়ে আমরা হাস্যকর পরিকল্পনার কথা বলাবলি করছিলাম। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হঠাৎ বাড়ির বাইরে রাস্তায় ভারী গাড়ি এসে থামার শব্দ হল এবং সেই সঙ্গে বুটের শব্দ। আমরা দুজনেই তখন বাড়ির বাইরের বারান্দায়। অবাক হয়ে দেখি একজন আর্মি অফিসার গেট ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করছে এবং তার পশ্চাতে সশস্ত্র কয়েকজন জওয়ান।

আর্মি অফিসার আমাদের কাছে এসে ইংরেজিতেই জিজ্ঞাসা করল, মিঃ কবির এবং মিঃ মাহমুদ কে? কবির বলল, আমরা। আর্মি অফিসার বলল, আমরা তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। এখুনি খুলনা স্টেশন চালু করতে হবে।

আমি বুঝতে পারলাম না আর্মি অফিসার কেমন করে আমাদের নাম এবং বাসার সন্ধান জানতে পারল! লক্ষ করে দেখি আর্মি অফিসারের অদূরে জেলা জনসংযোগ অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি অত্যন্ত অসহায় ও করুণ মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় ছিল। আর্মিরা তাকে ধরে আমাদের খুঁজে বের করার জন্য চাপ দেয়ায় তিনি উপায়ান্তর না দেখে ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন। যাহোক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে আমি বললাম, দেখুন আমরা অনুষ্ঠানের লোক। স্টেশন চালু করতে হলে ইঞ্জিনিয়ার দরকার। আর্মি অফিসার বাধা দিয়ে বলল, ইঞ্জিনিয়ার কে, কোথায় আছে তা খুঁজে বের করে স্টেশন আজ রাতেই চালু করার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি। তোমাদের সাহায্যের জন্য আমাদের গাড়ি এবং আর্মস রেডি আছে। সুতরাং নো মোর টকিং বিজনেস অ্যান্ড গেট রেডি বাই টু মিনিটস।

আর্মি অফিসারের কড়া নির্দেশে আমি আর গোলাম কবির কোনও কথা না বলে ওদের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে দেখি সরু গলির উপর একটা পুরো আর্মি কনভয়। জওয়ানদের একটা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। গাড়ির মধ্যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। রাইফেল ছাড়াও মেশিন গান, মর্টার, এল.এম.জি ইত্যাদি। তারই মধ্যে কোনওক্রমে জওয়ানদের পাশে অত্যন্ত সংকুচিত ভাবে দুজনে বসে রইলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। আমাদের নির্দেশে গাড়ি চলল রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ার জনাব বজলুল হালিম চৌধুরীর খোঁজে। প্রাণের দায়ে তাঁকে খুঁজে বের করাই এখন আমাদের প্রথম কাজ।

বজলুল হালিম সাহেব আমাদের কাছাকাছি গল্লামারী রোডেই একটা বাসা ক'দিন আগে ভাড়া নিয়ে ছিলেন। তাঁর ফ্যামিলি ঢাকা থেকে তখনও আসেন নি। সুতরাং তিনি একাই থাকতেন সে বাসায়। আমাদের ভাগ্য ভালো। তাঁকে বাসাতেই পেয়ে গেলাম। আমাদের অবস্থা দেখে আর বাক্য ব্যয় না করে বেরিয়ে এলেন। আমাদের তিনজনকে নিয়ে আর্মি কনভয় ছুটে চলল গল্লামারীর নির্জন রাস্তা দিয়ে ট্রান্সমিটার ভবনের দিকে। স্টেশনে পৌঁছে দেখি পাকিস্তান নেভীর অবাঙালি ইঞ্জিনিয়ার এবং কিছু টেকনিশিয়ান ট্রান্সমিটার চালু করার জন্য বইপত্র আর যন্ত্রপাতি নিয়ে

গলদঘর্ম হচ্ছে। আমাদের দেখেই তারা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। উর্দুতে বলল, 'এসে গেছো তোমরা? নাও, তোমাদের জিনিস তোমরা চালু করো। দু'দিন ধরে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে ট্রান্সমিটার 'অন' করা শিখেছি। কিন্তু ট্রান্সমিটারে কীভাবে প্রোগ্রাম দিতে হবে, কীভাবে ঢাকা স্টেশন রিলে করতে হবে তার হদিস বের করতে পারিনি। এখন তোমরা তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করো।' কাজতো আমাদের শুরু করতেই হবে। ফাঁকি দেবার কোনও উপায় নেই। বজলুল হালিম সাহেব একাই ট্রান্সমিটার রিসিভিং সেন্টার আর একবার বুথে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন। গোলাম কবির বসল বুথ অপারেশনে। আমি এবং আর্মি অফিসার বসলাম স্টুডিওতে অনুষ্ঠান ঘোষণা, সামরিক নির্দেশ পাঠ ও সংবাদ পাঠের জন্য। অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হল। সামরিক নির্দেশ পত্র পাঠের মাঝে আর্মি অফিসারের নির্দেশে জমজমাট উর্দু, বাংলা গান বাজাতে হল। আর্মি অফিসারের কড়া নির্দেশ, কোনও রকম দুঃখের গান বা হামদ, নাত বাজানো যাবে না। অনুষ্ঠান এমনভাবে প্রণয়ন ও প্রচার করার ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে করে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ও মানুষের মনে বর্তমান সরকারের প্রতি আস্থার ভাব ফিরে আসে। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে আনন্দ দিতে হবে, দুস্কৃতিকারী, যারা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত তাদেরকে তাদের কাজের পরিণতি সম্পর্কে কঠোর ভাবে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে, মানুষের মনে পাকিস্তানের প্রতি দেশাত্মবোধক জাগিয়ে তুলতে হবে এবং তার জন্য অ্যান্টিইন্ডিয়া প্রোপাগাণ্ডা জোরদার করতে হবে, পাকিস্তানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য সামরিক সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে তার প্রতি জনসমর্থন আদায় করতে হবে। এসব নির্দেশের কোনওরূপ বিচ্যুতি ঘটলে বা জয়বাংলা জাতীয় কোনও অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রচার করা হলে তা 'অ্যাক্ট অব সাবোটাজ' হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

চরম আদেশ শিরোধার্য করে আমি, কবির, এবং বজলুল হালিম সাহেব রাত দশটা পর্যন্ত অনুষ্ঠান প্রচার করলাম। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি শেষে আমাদের বাড়ি ফেরবার অনুমতি নেই। জওয়ানদের খাবার থেকে আমাদের কিছু খাবার দেওয়া হল এবং স্টুডিওতেই আমাদের রাত কাটাবার নির্দেশ দেওয়া হল। তিনজনে বলতে গেলে কিছুই খেলাম না। না ঘুমিয়ে মেঝেয় শুয়ে বসে সারাটা রাত কাটিয়ে দিলাম। স্টুডিওর গেটের বাইরে আমাদের পাহারা দেবার জন্য দু'জন সশস্ত্র জওয়ান বসে রইল। রাত্রে অসময়ে বাথরুমে যাবারও অনুমতি রইল না। বুঝলাম ওরা আমাদেরকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। প্রকৃতপক্ষে আমরা সম্পূর্ণরূপে ওদের হাতে বন্দী।

সকালে জওয়ানদের খাবার থেকে কিছু খাবারের ভাগ পেলাম। আর্মি অফিসারের নির্দেশ মতো তেমনিভাবে আবার অনুষ্ঠান প্রচার করা হল।

এমনি করে প্রায় তিন চারদিন অনুষ্ঠান প্রচারিত হল। সরকারী কর্মচারীদের কাজে যোগদানের নির্দেশ শুনে আঞ্চলিক পরিচালক আখন্দ সাহেব, সহকারী

আঞ্চলিক পরিচালক মালেক সাহেব, নিউজ এডিটর শরীফ সাহেব এবং আরও অনেকেই এসে কাজে যোগ দিলেন। এরফলে আমাদের তিনজনের উপরে যে একটানা চাপ পড়ছিল তা কিছুটা কমে গেল। এরই মধ্যে আমাদেরকে প্রায় প্রতিদিনই আর্মি হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হত নতুন আদেশ নির্দেশ গ্রহণের জন্য। খুলনা আর্মি হেড কোয়ার্টারে একজন বাঙালি মেজরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তিনি সম্ভবত তখনকার পরিস্থিতিতে একমাত্র বাঙালি অফিসার যিনি অত্যন্ত চতুরতা ও কৌশলের সাথে পাক আর্মিদের মনে আস্থার ভাব সৃষ্টি করে সাফল্যের সাথে টিকে ছিলেন। তিনি আমাদেরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। তারই হস্তক্ষেপে ও নির্দেশে বেতার ভবনে আমাদের বন্দী দশার অবসান ঘটে। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন উর্দুভাষী ঘোষক ও সংবাদ পাঠক ছিলেন। বলতে দ্বিধা নেই, তারা কখনই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমাদের উপর খবরদারী বা দুর্ব্যবহার করেন নি। তারা খোলাখুলিভাবে পাক আর্মিদের এবং তাদের সহযোগী অবাঙালিদের দ্বারা সংগঠিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিন্দে করতেন।

যাহোক, তিন চারদিন অনুষ্ঠান চালাবার পর মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে গোপন সূত্রে আমাদের কাছে খবর এল, রেডিও স্টেশন শিগগিরই আক্রমণ করা হবে এবং সে কারণে আমরা যেন নিরাপদ স্থানে সরে যাই। দিনটি ছিল সম্ভত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের শনিবার। রাত্রে আমরা যথারীতি অনুষ্ঠান প্রচার করে অসুস্থতার অজুহাতে বাড়িতে চলে গেলাম। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছিল। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম এবং একসময় ঘুমিয়েও গেলাম। কিন্তু মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পেলাম প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ। বুঝতে পারলাম রেডিও স্টেশন সত্যি সত্যি আক্রান্ত হয়েছে।

সারাটা রাত অস্থির উদ্বেগে কাটল। সকালেও তেমনি ভাবে একটানা গুলি চলতে লাগল। আমাদের বাসার কাছেই গুলির প্রচণ্ড শব্দ হতে লাগল। অবস্থা দেখার জন্য বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম।

জানতে পারলাম আমাদের খুব কাছেই গল্লামারী রোডের উপর একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে কয়েকজন দুঃসাহসী বাঙালি পুলিশ, আনসার পজিশন নিয়ে একটা আর্মির গাড়ির উপর গুলি বর্ষণ করে ৬/৭ জন পাঞ্জাবি সৈন্য হত্যা করেছে। আরও কিছু লোক আক্রমণ করেছে রেডিও স্টেশন। তাদের হাতে শুধু মাত্র থ্রি নট থ্রি রাইফেল। তাই নিয়ে তারা শনিবার মধ্যরাত থেকে রবিবার বেলা দশটা পর্যন্ত বীর বিক্রমে লড়াই করে গেল সুশিক্ষিত পাঞ্জাবি সৈন্যদের বিরুদ্ধে। যুদ্ধের সমাপ্তি টানার জন্য পাঞ্জাবি সৈন্যরা ব্যবহার করতে লাগল মর্টার, ভারী মেশিনগান এমনকি তারা গানবোটের সাহায্যে শেলিংও করতে লাগল। গোলার আঘাতে গল্লামারী রোডের বাড়িঘর ভেঙে চুরমার হতে লাগল। আগুন জ্বলতে লাগল সর্বত্র। সমস্ত গল্লামারী রোড এবং তার আশেপাশের এলাকা জনশূন্য হয়ে গেল। লোকে প্রাণভয়ে রূপসা নদী পার হয়ে ওপারে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলে গেল। গোলাম কবির-এর আত্মীয় স্বজনরাও বাসা ছেড়ে নদী পার হয়ে চলে গেল পিরোজপুরের উদ্দেশ্যে। শুধু

আমি আর গোলাম কবির শহরে রয়ে গেলাম। আমাদেরকে আশ্রয় দিলেন গগন বাবু রোডের এক ভদ্রলোক তাঁর নাম মিঃ জোহা। ভদ্রলোক পোর্ট ট্রাস্ট্রের চিফ একাউন্টস অফিসার। তাঁর স্ত্রী মিসেস নাইমা জোহা ছিলেন পাইওনিয়ার গার্লস স্কুলের প্রিন্সিপাল। আমরা তাঁকে আপা বলে ডাকতাম। সেখানে আখন্দ সাহেবও ইতোপূর্বে তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আখন্দ সাহেবও সেদিন গোলাম কবিরের আত্মীয়স্বজন-এর সাথে তাঁর পরিবার পরিজনকে পিরোজপুরে পাঠিয়ে দিয়ে রয়ে গেলেন আমাদের সাথে। সেদিন খুলনা শহর প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। কেননা পাক সৈন্যরা প্রতিশোধ স্পৃহায় খুলনা শহরে যে ত্রাস আর বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করেছিল তা অবর্ণনীয়। তবু অসীম সাহসে আমরা কিছু সংখ্যক লোক রয়ে গিয়েছিলাম। আর তাই সেদিন সন্ধ্যায়, শিকারী কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে পুনরায় পাঞ্জাবি সৈন্যরা আমাদেরকে ঐ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল রেডিও স্টেশন চালু করতে।

সন্ধ্যায় নির্জন গল্লামারী রোডের ধ্বংস স্তূপের ভেতর দিয়ে ট্রান্সমিটারে পৌঁছালাম। দেখলাম, স্টেশন ভবন গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে আছে। আমাদের মনও বিধ্বস্ত। এবারে আমরা চার সঙ্গী। আমি, গোলাম কবির, বজলুল হালিম সাহেব এবং একজন উর্দুভাষী সংবাদ পাঠক।

যথারীতি অনুষ্ঠান প্রচারিত হল। একজন ক্যাপ্টেন নিজে সমস্ত অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও প্রচারের তত্ত্বাবধান করলেন। দুষ্কৃতিকারীদের কঠোরভাবে সতর্ক করা হল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক বর্ণনা করা হল, অ্যান্টি ইন্ডিয়া প্রোপাগাণ্ডা, সামরিক সরকারের পক্ষে জনসমর্থন, চটকদার গান সব কিছুই প্রচার করা হল। তারপর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি শেষে আবার স্টুডিওতে তেমনিভাবে শুয়ে বসে রাত কাটাবার পালা। পরদিন সকালে আমরা বাইরে বেরিয়ে দেখি যে সব বেপরোয়া বাঙালি অসীম দুঃসাহসে বেতার কেন্দ্র আক্রমণ করেছিল তাদেরই লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। তাদের মধ্যে ৬০/৭০ বছরের বৃদ্ধ পর্যন্তও রয়েছে। এরা কেউই সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য নয়। সবাই কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ গ্রামবাসী। পাঞ্জাবি সৈন্যরা তাদের লাশ টেনে কাউকে খালের মধ্যে ফেলে দিল। কাউকে বা সামান্য মাটি খুঁড়ে ঢেকে দিল। দুটি ছিন্নভিন্ন লাশ দেখলাম। উর্দুভাষী সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে পাঞ্জাবি সুবেদার বলল, মাত্র এই দু'জন লোক শেষ পর্যন্ত এক নাগাড়ে খালের আড়ালে বসে গুলি চালিয়েছে। শেষে সৈন্যরা ক্রলিং করে যেয়ে হ্যান্ডগ্রেনেড ছুঁড়ে ওদেরকে হত্যা করেছে। অচেনা, অজানা এই সব অকুতোভয় মুক্তিপাগল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহ দেখে আমার শুধু একটি কথাই মনে হল, হায়, ওদের জন্যে কোনও শোকের শব্দ নেই, কোনও প্রিয়জনের দু'ফোটা চোখের পানি নেই, কাফনের কাপড় নেই, জানাজা নেই। স্বাধীনতার ইতিহাসে কোনওদিন ওদের নাম লেখা হবে না। কেউ জানবে না কেন ওরা পতঙ্গের মতো প্রাণ দিয়েছিল।

আমি শুধু দেখলাম আর শুনলাম। শোক প্রকাশ দুঃখ প্রকাশ বা কোনও মন্তব্য প্রকাশের অধিকার আমাদের নেই। তিক্ত বিস্বাদ মন দিয়ে সকলেই নীরবে ফিরে এলাম ট্রান্সমিটার ভবনের মধ্যে। অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য এখনই সুন্দর করে ওদের নির্দেশে বলতে হবে, ওরা দেশ প্রেমিক নয়, ওরা দেশের শত্রু। ওরা বীর শহীদ নয় ওরা দুষ্কৃতিকারী। ওদের দুষ্কার্যের উচিত শাস্তি-মৃত্যু।

এমনি করে উদ্যত রাইফেলের মুখে অনুষ্ঠানের নামে প্রহসন প্রচারিত হতে লাগল প্রতিদিন। চোখের সামনে সংগঠিত হতে দেখলাম অসংখ্য নারকীয় হত্যা। ট্রাক বোঝাই করে প্রতিদিন সকাল দুপুর, সন্ধ্যা আনা হত অসংখ্য বন্দী। বন্দীদের মধ্যে অধিকাংশই গ্রামের নিরীহ লোক, মিল কারখানার শ্রমিক, সাত আট বছরের ছেলে থেকে কুমারী, গৃহবধু, যুবক এমনকি সত্তর পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত। তাদের করুণ চিৎকারে আকাশ কাঁপতো। হয়তো আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কাঁপতো। কিন্তু নারকীয় উৎসবের এই সব জল্লাদ পশুদের মন এতটুকু ভিজতো না। বন্দীদের খালের ধারে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করা হত। এরপর ওরা আর গুলি খরচ করতো না। ট্রাক বোঝাই বন্দীদের সাথে দু'তিন জন বিহারী কশাই আনতো। তারা আমাদের চোখের সামনে ছুরি ধার দিত। তারপর এক এক করে বন্দীদের জবাই করে খালের পানিতে ফেলে দিত। জবাই শেষে হাসতে হাসতে আমাদের এসে বলতো, ইয়ার কেয়সা হালৎ হ্যায়? সবকিছু ঠিক ঠাক হ্যায়? আভী গানা লাগাও–বহুত আচ্ছা গানা।

দুঃস্বপ্নের ন'টি মাস ধরে যেসব হত্যালীলা, রক্তের হোলি খেলা চলেছে তার বর্ণনা দেওয়া এখন কতটুকুই বা সম্ভব। অবাঙালি নিম্নশ্রেণীর বিহারী আর বিশ্বাসঘাতক বাঙালি রাজাকারদের যোগসাজসে পাক আর্মি সাধারণ মানুষের মনে ত্রাস আর আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য প্রতিদিন নির্বিচারে নিরীহ নারী পুরুষ শিশুদের হত্যা করতো। অসংখ্য লাশ শহরের রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে মোড়ে ফেলে রাখতো। মুক্তি যোদ্ধাদের লাশ ঝুলিয়ে রাখতো লাইট পোস্টে। সেই সব লাশের বুকে সেঁটে দেওয়া কাগজে লেখা থাকতো ভারতের চর, দুষ্কৃতিকারী ইত্যাদি। তবু তারা মুক্তিপাগল মানুষের সাহস এতটুকু ভাঙতে পারে নি। বরং পাক সৈন্যরা ভয় পেত মুক্তি বাহিনীর নামে। কেননা ব্রিজ উড়িয়ে, রেল লাইন উপড়ে, আর্মি কনভয় ধ্বংস করে মুক্তি বাহিনীর সদস্যরা হানাদার সৈন্যদের সব দিক থেকে পঙ্গু ও বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। আকস্মিক আক্রমণে আর চোরাগুপ্তা গুলিতে অসংখ্য সৈন্য প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছিল। যখন তখন যেখানে সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা বোমা ফাটাতো। এসব কারণে পাক সৈন্যরা ভীষণ সন্ত্রস্ত থাকতো। প্রত্যেককেই সন্দেহের চোখে দেখতো। প্রতিটি লোককে পরিচয় পত্র রাখতে হত আর পথে ঘাটে প্রত্যেককে খানা তল্লাসী করা হত। এর মধ্যে আমিও ব্যক্তিগত ভাবে অনেক দুঃখজনক ঘটনার শিকার হয়েছি। পঁচিশে মার্চের পরই আমাদের যশোরের বাড়ি সম্পূর্ণ লুঠ হয়ে গিয়েছিল। যা লুঠ করা সম্ভব হয় নি তা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার পিতা মাতা সম্পূর্ণ

নিঃস্ব অবস্থায় শহর থেকে পালিয়ে মাগুরার একটি গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমার তরুণ ভাইবোন, ভাগ্নী পাক সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের সাথে বা চট্টগ্রামে আমার স্ত্রীর সাথে আমার কোনওরূপ যোগাযোগ ছিল না। আমার ছোটো ভাই মাহফুজ গ্রাম থেকে শহরে এসে শহরের অবস্থা দেখে আবার পালিয়ে যাবার পথে ধরা পড়ে। পাঞ্জাবি সৈন্যরা তাকে বাস থেকে নামিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল। আমি এবং আমার আব্বা সংবাদ পেয়ে অনেক খোঁজ করে যশোর ক্যান্টনমেন্টের খয়েরতলা মোড়ের সামনে মৃত ভৈরব নদীর কচুরী পানার ভেতর থেকে তার হাড় কখানা উদ্ধার করে কবর দিতে পেরেছিলাম মাত্র। এরপর মর্মান্তিক ভাবে হারিয়েছিলাম সদাহাস্যময় ভ্রাতৃপ্রতীম বজলুল হালিম চৌধুরীকে। তিনি ঢাকায় এসেছিলেন কনফারেন্স-এ যোগ দিতে আর সেই সুযোগে তাঁর স্ত্রীকে খুলনায় নিয়ে যেতে। কিন্তু কনফারেন্সে ভুল টার্গেট হিসাবে দুঃখজনকভাবে তিনি আততায়ীর হাতে প্রাণ হারালেন। খুলনায় তাঁর আর ফিরে যাওয়া হল না। এমননি ভাবে চট্টগ্রামে প্রাণ হারালেন চট্টগ্রাম বেতারের সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক শ্রদ্ধেয় কাহ্হার সাহেব। নিষ্ঠুরভাবে নিহত হবার সংবাদ পেলাম রংপুর বেতারের সহকর্মী মহিউদ্দিন হায়দারের, রাজশাহী বেতারের ইঞ্জিনিয়ার মহসীন সাহেবের। এসব কারণে আমি শরীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং নভেম্বর থেকে অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। নিজেকে মনে হত একটা পথের কুকুরের চেয়েও অধম যে কুকুরের চিৎকার করার ক্ষমতা আছে অথচ আমার তাও নেই।

বধ্যভূমি গল্পামারীতে প্রতিদিনি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমি ঐ সময়ে একটি ছোটো গল্প লিখেছিলাম 'বধ্যভূমিতে শেষ দৃশ্য'। হানাদার বাহিনী তাদের বন্দী শিবির থেকে একজন আহত মুক্তিযোদ্ধসহ কয়েকজন বন্দীকে গভীর রাতে ট্রাকে নিয়ে চলেছে বধ্যভূমিতে। বন্দী শিবিরে নির্যাতনে আহত মুক্তিযোদ্ধা তার অন্তিম যাত্রায় ট্রাকের মধ্যে পরিচিত হয় তারই মতো নির্যাতিতা একটি মেয়ের সঙ্গে যার দেহ, যার সম্ভ্রম হানাদার শিকারী পশুরা খুবলে খেয়েছে। মেয়েটির দেহের প্রয়োজন ওদের কাছে ফুরিয়েছে বলে আজ তাকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যভূমির শেষ নারকীয় উৎসবে।

ট্রাকে মেয়েটি এবং ছেলেটি একই সঙ্গে বসে। ওদের একটু একটু করে কথা হয়, জীবনের কথা, স্বপ্নের কথা, আনন্দের কথা। ওরা কেউ কারো পরিচয় জানে না, অতীত জানে না। নিয়তির অমোঘ বিধানে আজ দুজন অনন্ত যাত্রার সঙ্গী, দানব ইচ্ছার করপুটে সমর্পিত। বধ্যভূমিতে ওদের সকলকে ট্রাক থেকে নামিয়ে নদীর ধারে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করানো হয়। হানাদার পাঞ্জাবি সেনাদের রক্ত পিপাসু রাইফেল উদ্যত। শেষ মুহূর্তে বন্দী সবার কণ্ঠে গুঞ্জরিত হতে থাকে পবিত্র কোরানের আয়াত।

মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ নৃশংসতার প্রেক্ষাপটে বধ্যভূমির উদ্দেশ্যে অন্তিম যাত্রায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং হানাদার পশুদের দ্বারা ধর্ষিতা মেয়েটিকে নিয়ে 'বধ্যভূমিতে শেষদৃশ্য' গল্পটি সাহিত্যের বিচারে হয়তো তেমন উৎকৃষ্ট ছিল না। কিন্তু নয়টি মাস ধরে দু'চোখ দিয়ে আমি যা দেখেছিলাম তার সঙ্গে আমার তারুণ্যের রোমান্টিসিজম ও আবেগ, সকল যন্ত্রণা, ঘৃণা, প্রতিশোধ স্পৃহাকে আমি ঐ মুক্তিযোদ্ধা তরুণের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। স্বাধীনতার পর পরই এহসান চৌধুরী নামে আমার এক বন্ধু তার সাহিত্য পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশ করেছিল।

বলতে দ্বিধা নেই আমার কল্পনা বিলাসী মন বধ্যভূমির মুক্তিযোদ্ধা তরুণের ভেতর দিয়ে নিজেকে কল্পনা করেছিল। কিন্তু যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতাম যখন দেখতাম ঐ তরুণের মতো যোদ্ধা হবার শক্তি, সাহস আমার নেই। নিজের অক্ষমতায় নিজেকে ঘৃণা করতাম, ঘৃণা করতাম হানাদার দখলদার পাক সেনাদের। ঘৃণা সত্ত্বেও ওদের চাহিদা অনুযায়ী অনুষ্ঠান প্রচারে সহযোগিতা দিতে বাধ্য হতাম। ওরাও ঘৃণা করতো, অবিশ্বাস করতো আমাদের। বলতো, গাদ্দার বাঙালি। মাটিতে বুট ঠুকে বলতো, হাম সব তাবা কর দেঙ্গে। জয় বাংলা কা বাচ্চে, কাহা হ্যায় তোমহারা লিডারলোগ? ও সালেলোগ তো আভি কালকাত্তামে মৌজ উড়াতে হ্যায়। প্রায়ই ব্যঙ্গস্বরে বলতো, হা, বীর বাঙালি লোড়াই করে বাংলাদেশ স্বাধীন কোরবে আর হামি চুতিয়া লোগ চুহা বনকে মিট্টিকা আন্দার চালিয়ে যাবে।

ডিসেম্বর মাস যখন এল তখন সত্যি সতিই চুহা বনতে হল হানাদার পাক সেনাদের। ভারতীয় সেনাবাহিনী আর মুক্তিযোদ্ধাদের সাঁড়াশী আক্রমণে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই পতন ঘটল যশোরের। যশোরের পতনের পর যশোর থেকে পলাতক পাকবাহিনী, মিলিশিয়া এবং রাজাকারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল খুলনা শহর। মুক্তিযোদ্ধারা সহযোগী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে চতুর্দিক থেকে খুলনা ঘেরাও করে ফেলল। ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান এসে পাক সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানের উপর সরাসরি আঘাত হানতে লাগল। কখনও বা বোমার বদলে রাশি রাশি লিফলেট ছড়িয়ে দিল আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে। হানাদার বাহিনীর তখন চরম দুরাবস্থা। অস্ত্র নেই, খাদ্য নেই, অবাঙালিরা তাদের আটা, রুটি দিয়ে সাহায্য করতে লাগল। রাজাকার, মিলিশিয়াদের বাজারের দোকানে দোকানে ভিক্ষা করতে দেখলাম। আমেরিকার সেভেন্থ ফ্লিট যুদ্ধজাহাজ থেকে পাকিস্তানের পক্ষে সাহায্য আসার গুজব ছড়িয়েছিল। কিন্তু পাক বাহিনীর সে আশাও নিরাশায় পরিণত হল যখন জানা গেল ঢাকার পতন অত্যাসন্ন। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও হানাদার পাক বাহিনী তাদের সহযোগীদের নিয়ে মরণ কামড় দিয়ে চেষ্টা করল প্রতিরোধ গড়ে তোলার। প্রতিদিন প্রতিরাত সারা খুলনা শহর বিরামহীন গোলাগুলির শব্দে কাঁপতে লাগল। আমরাও কাঁপতে লাগলাম তবে এবার ভয় নয়, আনন্দে—মুক্তি আর বিজয়ের আনন্দে, স্বাধীনতার নতুন সূর্য দেখার প্রতীক্ষায়। অবশেষে সেই প্রতিক্ষিত দিনটি এল ১৬ই ডিসেম্বর-বিজয়ের দিন। অবরুদ্ধ ঢাকা মুক্ত হল ১৬ই ডিসেম্বর

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হানাদার পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু খুলনা অবরুদ্ধ থেকে গেল পাক বাহিনীর হাতে। আত্মসমর্পণের আগে খুলনাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পরিকল্পনা দিয়ে পাক বাহিনী ১৫ এবং ১৬ই ডিসেম্বর এই দু'দিন সারা খুলনা জুড়ে চালাল নারকীয় হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ। সরকারী গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, সেতু কালভার্ট সহ তারা বেতারের ট্রান্সমিটার, স্টুডিয়ো, যন্ত্রপাতি, নথিপত্র সবকিছুই ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস করে ফেলল। ধ্বংসযজ্ঞ শেষে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে সার্কিট হাউজ ময়দানে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পন করল ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডের কাছে।

১৭ই ডিসেম্বর সারা খুলনা শহর জুড়ে একদিকে যেমন বিজয় উৎসব, মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ভালোবাসা আর আনন্দের মাতম, অন্যদিকে পরাজিত হানাদার শত্রু আর তাদের সহযোগী রাজাকারদের উদ্দেশ্যে ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। তবে আত্মসমর্পণকারী শত্রুরা ভারতীয় বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানে থাকায় এই ঘৃণা সহিংসতায় পরিণত হবার সুযোগ পায়নি।

অক্টোবর, ১৯৯৯

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের অনেক দুঃখজনক ঘটনা, অনেক স্মৃতি, অনেক ইতিহাস জমা হয়ে আছে মনে। নয়মাসের প্রতিটি দিন, প্রতিটি সময়কে বুকের মধ্যে ধরে রাখার জন্য আমি আর গোলাম কবির প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ছুটে বেড়িয়েছি। সেই সময়ের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, ক্যান্টনমেন্ট, বধ্যভূমি, রণাঙ্গন, আশ্রয় শিবির, সব জায়গা সব ঘটনাবলীর স্মৃতি, মানুষের জীবন মৃত্যু, শোক, আনন্দ, বীরত্ব, আর বিশ্বাসঘাতকতার অনেক ছবি, অনেক দৃশ্য এক এক করে জমিয়ে রেখেছি। সেই সব ছবি আর স্মৃতি স্বল্প পরিসরে বলে যাওয়া সম্ভব নয়। কোনওদিন বলতে পারব বলেও মনে হয় না। ছবিগুলো আস্তে আস্তে বিবর্ণ হবে। সব মুছে যাবে, মুছে যাচ্ছেও। কেননা আমাদের স্মৃতি বড় দুর্বল। স্বাধীনতার জন্য যারা রক্ত দিল তারা শুধু দেয়ার জন্যই দিল। স্বাধীনতার পর ওদের রক্ত ভেজা মাটিতে ওদের কথা ভুলে গেলাম। বিত্তের লোভে, ক্ষমতার লোভে আমরা এখন জন্তুর মতো খেয়ো খেয়িতে ব্যস্ত। সব কিছু ছিঁড়ে খেয়েও আমাদের পরিতৃপ্তি হয় নি। তাই আমরা এখন পরস্পরের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছি।

[মুক্তকণ্ঠ, ২৪ ও ২৫ মার্চ ২০০০ সাল এবং বাংলার বাণী ২৬ মার্চ ২০০০ সাল সংখ্যায় প্রকাশিত। নিবন্ধটি রচনার প্রেরণাদাতা শ্রদ্ধেয় শামসুল হুদা চৌধুরী ২০০৫ সালে ইন্তেকাল করেছেন।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

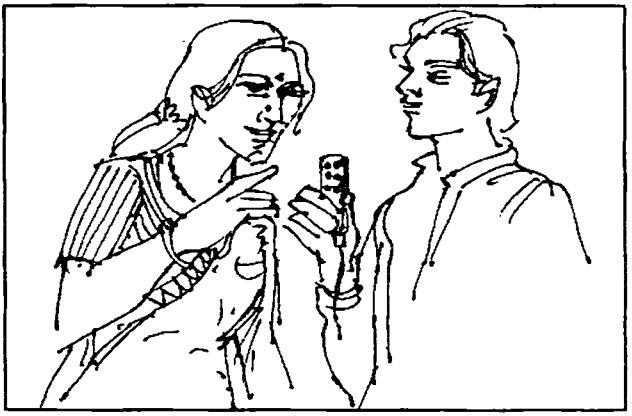

"সবারে করি আহ্বান—
এসো উৎসুক চিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ।
হৃদয় দেহো পাতি, হেথাকার দিবা রাতি
করুক নবজীবন দান"।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

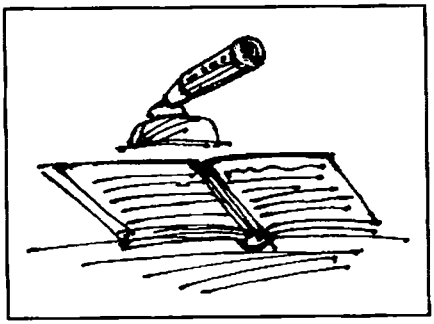

সুকণ্ঠ

আপনি কি বেতারে অনুষ্ঠান ঘোষণা করতে চান? উপস্থাপনা করতে চান? কিন্তু আপনি কি আপনার নিজের কণ্ঠস্বর শুনেছেন? আপনি জানেন কি কেমন আপনার কণ্ঠস্বর? বাচনভঙ্গি?

আপনি বা আমি যখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলি, ঝগড়া করি, আলোচনা করি, বক্তৃতা দিই, প্রেম করি অথবা দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে কিছু হতাশার শব্দ ছুঁড়ে দিই তখন শুধুই আমাদের লক্ষ্য থাকে কণ্ঠনিঃসৃত বাক্যাবলির প্রতি, চিন্তা ভাব ও আবেগের বহিঃপ্রকাশের প্রতি। কণ্ঠ অথবা কণ্ঠস্বর নিয়ে আমরা কেউ এতটা ভাবিত হইনা। কিন্তু কখনও কোনওভাবে যদি টেপ রেকর্ডারে নিজের কণ্ঠ রেকর্ড করার সুযোগ হয়, রেকর্ড করার পর তা শোনা হয় তখন বিস্মিত হই। ভাবি এ কার কণ্ঠস্বর! এই উজ্জ্বল, আকর্ষণীয় অথবা কর্কশ, ফ্যাসফেসে নিরুত্তাপ কণ্ঠের মানুষটি কি সত্যি আমি!

বৃক্ষের পরিচয় যেমন তার ফুল বা ফলে তেমনি মানুষের পরিচয় তার কণ্ঠ ও আচরণে। কণ্ঠস্বর এমন একটি জিনিস যার দ্বারা একজন অন্য একজনের মনে দাগ কাটতে পারে, একজন অন্যজনকে প্রভাবিত করতে পারে। কোথাও কোনও পার্টিতে, কারো সাথে আলাপ পরিচয়ে, কোনও ক্রেতাকে আদর স্বাগতমে, কোনও সভায় নিজ বক্তব্য ও মতামত পেশ, টেলিফোনে আলাপে, বেতার অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় সব কিছুতে সব সময়ে কণ্ঠস্বরই পরিচয় দেয় একটি মানুষের ব্যক্তিত্বের, তার স্বাতন্ত্র এবং তার অস্তিত্বের।

এখন প্রশ্ন আপনি কি সেই আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বরের অধিকারী যা অপরকে সহজেই বিমোহিত ও প্রভাবিত করতে পারে? শুধুমাত্র কণ্ঠস্বরের মাধ্যমেই আপনি কি হতে চান বিশিষ্ট বেতার ব্যক্তিত্ব?

ইচ্ছে করলেই যে কেউ তার কণ্ঠস্বরকে সবল ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। তবে কণ্ঠস্বরকে সবল ও আকর্ষণীয় করে তোলার আগে কণ্ঠস্বর ও প্রকাশ

ভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং কণ্ঠস্বরের ত্রুটি গুলো সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। মানুষের কণ্ঠস্বরে সাধারণতঃ পাঁচটি প্রধান ত্রুটি লক্ষ করা যায়। আপনি পরীক্ষা করে দেখুন তো আপনারও সেই ত্রুটি রয়েছে কিনা?

১। আপনার কথাবার্তা কি অস্পষ্ট?

আপনি আপনার কথা নিয়ে বেশ বিড়ম্বনায় ভুগছেন। আপনি কিছু বলতে চান, বলছেনও। কিন্তু যাকে বলছেন সে আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছেনা, আপনাকে পুনরাবৃত্তি করার জন্য অনুরোধ করছে। এ রকম অবস্থা সবার সাথে প্রায়ই যদি ঘটতে থাকে তা হলে বুঝতে হবে অন্যদের শ্রবণযন্ত্রে কোনও গণ্ডগোল নেই গণ্ডগোল রয়েছে আপনার জিহ্বায়। আপনার জিহ্বায় আড়ষ্টতা আছে বলেই অন্যরা আপনার কথা বুঝতে পারছেনা। জিহ্বার আড়ষ্টতা থেকে সন্দেহমুক্ত হতে চাইলে পরীক্ষা করে দেখুন। নিচের কথাটি অনেকবার জোরে উচ্চারণ করুন,

LEAVES FROST CRISPED BREAK FROM THE TREES AND FALL.

বাংলা ভাষায়ও উচ্চারণ করুন

"ধরিত্রী পৃষ্ঠে ছায়া সুশীতল, সবুজ শ্যামল আমার এই স্বদেশ ভুমি। অপরূপ তার স্রোতস্বিনী নদী,হ্রদ, পর্বতশ্রেণী। সুশোভিত বৃক্ষরাজী, ফুল, ফলের সমারোহে কী চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী।"

অথবা এ ধরনের কবিতা আবৃত্তি করুন ঃ

"ছিল আশা, রক্ষঃকুল রাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি বৎস দেখিয়া তোমারে
বামে রক্ষঃকুল লক্ষী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ। বৃথা আশা! পূর্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল আসনে।"

যদি উচ্চারণ ও আবৃত্তি করতে গিয়ে আপনি অসুবিধা বোধ করেন তা হলে বুঝতে হবে আপনার জিহ্বায় আড়ষ্টতা আছে। স্বরবর্ণগুলো উচ্চারণ করা সহজ কিন্তু ব্যাঞ্জনবর্ণ যুক্ত কথাগুলোর উচ্চারণে জিহ্বা, ঠোঁট এবং দাঁতকে বেশ শক্ত ভাবে ব্যবহার করতে হয়। যাদের কথাবার্তা অলস ও অস্পষ্ট ধরনের তাদের প্রতি পরামর্শ— রোজ আধঘণ্টা করে আয়নার সামনে বাংলা বর্ণমালার অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত এবং ইংরেজি বর্ণমালার A থেকে Z পর্যন্ত বেশ জোরে উচ্চারণ করুন এবং পাঁচ মিনিট ধরে শিস দিন। ঠোঁটের আড়ষ্টতা দূর করার জন্য শিস দেওয়া খুব ভালো। এ নিয়ম মেনে চললে দু'তিন মাসের মধ্যেই আপনার কণ্ঠে এবং কথা বলার ভঙ্গিতে বেশ পরিবর্তন আসবে। অনুশীলনীর সময় আপনার প্রতিটি কথার উচ্চারণ পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট করার জন্যে দাঁতে দাঁত এটে কথা বলার চেষ্টা করুন। বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিকুপার এভাবে কথা বলার অনুশীলন করতেন। এতে জিহ্বা

ও ঠোঁট-এর উপর চাপ পড়াতে এদুটোই বেশ শক্ত হয়। আপনার ক্রটি থাকলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। দাঁতে দাঁত এটে প্রথমে আস্তে ও পরে দ্রুত বার বার উচ্চারণ করার চেষ্টা করুন,

HE THRUST THREE THOUSAND THISTLES THROUGH THE THICK OF HIS THUMB.

আপনি যদি সঠিকভাবে অনুশীলন করে যেতে পারেন তবে আপনার উচ্চারণ পরিচ্ছন্ন এবং কণ্ঠস্বর নিশ্চয় সবল হবে।

২। আপনার কণ্ঠস্বর কি কর্কশ?

কণ্ঠস্বরের কর্কশতা সাধারণতঃ চিবুক, গলা ইত্যাদিতে উত্তেজনা ও কাঠিন্যের জন্যে হয়ে থাকে। বিশেষ করে মেয়েদের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা এবং কাঠিন্যের পরিমাণ বেশি। গলার পেশীর কাঠিন্য দূর করার জন্যে আসুন একটা পরীক্ষা করে দেখা যাক। চেয়ারে বসে সামনের দিকে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে দিন। সমস্ত শরীর ঢিলে করে হাত দুটো অলসভাবে ছড়িয়ে দিন। খুব আস্তে আস্তে শুধু মাথাটা কয়েকবার চারদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করুন। এভাবে তিন মিনিট করার পর মুখের হা বড় করে বলুন,

CLOCK, SQUAW, GONG, CLAW.

যদি রোজ কয়েক মিনিট করে এই প্রক্রিয়া অনুশীলন করেন এবং শিশুদের সাথে যেভাবে আলাপ করেন (অবশ্যই ধমকা ধমকি নয়) ঠিক সেইভাবে সব সময় মৃদু ভাবে, ভদ্রভাবে সবার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন তা হলে আপনার কণ্ঠস্বরে মিষ্টতা আস্তে আস্তে এসে যাবে।

৩। আপনার কণ্ঠস্বর কি সরু? মিন মিনে ?

আপনার শরীরের ডায়াফ্রাম (যে মাংসপেশী আপনার ফুসফুসের নিচে এবং যা আপনার বুক ও পেটকে পৃথক করে রেখেছে) হচ্ছে একটা হাপরের মতো। এই হাপরের সবল উপস্থিতি কণ্ঠস্বরকে আকর্ষণীয় করে এবং ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে। ডায়াফ্রাম যদি দুর্বল হয় তবে কণ্ঠস্বর হবে সরু। সরু ও মিনমিনে কণ্ঠের মানুষ কখনই সবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে না। কথা বলার আসরে এরা কথা বলতে সাহস পায় না, হীনমন্যতার শিকার হয়। আপনার ডায়াফ্রাম দুর্বল কিনা পরীক্ষা করে দেখুন। ডায়াফ্রামের উপর হাত রেখে BOOMBLY, BOOMBLY BOOM শব্দগুলো উচ্চারণ করুন। সবল ডায়াফ্রাম লাফিয়ে উঠবে। কিন্তু দুর্বল ডায়াফ্রাম মোটেই নড়বে না।

ডায়াফ্রাম শক্তিশালী করার জন্য রোজ সকালে বিকালে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ান। সেই সাথে গভীরভাবে শ্বাস নিন এবং লম্বা শ্বাস ত্যাগ করুন। এ ছাড়া মেঝেতে

শুয়ে ডায়াফ্রামের উপর একটা ভারী বই রেখে জোরে জোরে শ্বাস নিন এবং চিৎকার করে বলুন, Hay ! He! Ha! Hi! Ho! Hoo! শব্দগুলো বার বার বলে সোজা হয়ে বসুন। গভীর ভাবে শ্বাস নিয়ে ঠোঁট সংকুচিত করে শ্বাস ছাড়ুন। এ সব ব্যায়াম করার পর একটা খবরের কাগজ নিয়ে এক নিঃশ্বাসে জোরে জোরে কতদূর পড়তে পারেন তা বার বার পরীক্ষা করে দেখুন। দম বাড়াতে চেষ্টা করুন। কিছুদিন অনুশীলন করুন, দেখবেন ডায়াফ্রাম শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আপনার মিনমিনে স্বভাব ও সরু কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন ঘটেছে। দূর হচ্ছে অস্পষ্ট কথা বলা এবং সেই সঙ্গে ফিরে আসছে আপনার আত্মবিশ্বাস।

অনেকে কথা বলার সময় শ্বাস-প্রশ্বাস এত বেশি নেন বা ত্যাগ করেন যার ফলে তাকে একটা হাঁপানি রোগীর মতো মনে হয়। আপনি যদি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আয়ত্তে রাখতে পারেন তবে তা আপনার কণ্ঠস্বরকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। আপনার সামনে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে মুখের থেকে ঠিক চার ইঞ্চি দূরে রেখে বলুন "PETER PIPER PICKED A PECK OF PICKLED PEPPERS"

আপনার বলার সাথে সাথে যদি মোমবাতি নিভে যায় তাহলে বুঝতে হবে শ্বাস প্রশ্বাসের উপর আপনার কোনও নিয়ন্ত্রণ শক্তি নেই। কণ্ঠস্বর সবল অথচ স্বাভাবিক এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আয়ত্তে রাখার জন্য মৃদু স্বরে কথা বলার অনুশীলন একটি উৎকৃষ্ট উপায়। একটি ঘরের মধ্যে আপনার বন্ধুকে দাঁড় করিয়ে অল্প কিছু দূরত্ব বজায় রেখে সামান্য জোরে অথচ ফিস ফিস করে কথা বলুন। যতদূর পর্যন্ত সে আপনার ফিস ফিস কথা শুনতে পাবে সেই দূরত্বের বাইরে আপনি ক্রমে ক্রমে সরে যেতে থাকুন এবং শ্বাস প্রশ্বাস আয়ত্তে রেখে সুস্পষ্ট উচ্চারণে ফিস ফিস করে কথা বলতে থাকুন যাতে সে আপনার কথা স্পষ্টভাবে শুনতে সক্ষম হয়।

৪। আপনার কণ্ঠস্বর কি বৈচিত্র্যহীন? সাদামাঠা ?

অনেকেই আছেন যারা একঘেয়ে সাদামাঠা সুরে কথা বলে থাকেন। যাদের কণ্ঠস্বর নিরুত্তাপ ও নিষ্ক্রিয় ধরনের তাদের সঙ্গে কথা বলতে কেউই পছন্দ করে না। ফলে এরা হীনমন্যতায় ভোগেন, অসুখী ও ভাবপ্রবণ হন। আপনি কি ঐ ধরনের হীনমন্যতার অসুখে ভুগছেন? তা হলে আপনার প্রতি পরামর্শ এমন লোকদের সঙ্গে সব সময় মেলামেলা করুন যারা খুব হাসি-খুশি এবং আমুদে স্বভাবের। এ সব আমুদে লোকদের সাথে কাজ করুন। তাদের মজলিসে আড্ডা দিন। হাসির গল্প পড়ুন, হাসির ছবি দেখুন এবং প্রাণ খুলে হাসুন। যখন একা থাকবেন তখনও আনন্দময় স্মৃতিগুলো স্মরণ করুন। অনুশীলনের জন্য সংগীতের সারে গামার মতো "হোঃ হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ হাঃ হোঃ হেঃ হেঃ তারপর হুঃ হুঃ হুঃ" এভাবে প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর দ্রুত গতিতে হাসুন। এভাবে অনুশীলন করলে আশা করি দু'মাসের মধ্যেই আপনি আপনার কণ্ঠস্বরে উষ্ণতা, সতেজতা এবং উচ্ছলতা ফিরে পাবেন। কণ্ঠস্বরে একঘেয়েমীতার আর একটি কারণ হচ্ছে নাকি সুরে কথা বলা যা

খুবই শ্রুতিকটু। আপনার নাক বন্ধ করে 'মিনিং' শব্দ উচ্চারণ করুন। শব্দটা নাকের মধ্যে কেঁপে জড়িয়ে যাবে। এর কারণ হচ্ছে M N আর N G এই শব্দগুলো নাকের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে। বাংলায় ম, ন, ঙ। নাক বন্ধ করে আবৃত্তি করুন তো—

"খ্যাদা নাকে নাচছে ন্যাদা

নাক ড্যাঙ্গা ড্যাং ড্যাং

এবার বুঝতে পারছেন নাকের মধ্যে 'ন' আর 'ঙ' শব্দ কি কেঁপে জড়িয়ে যাচ্ছে। এছাড়া অন্য কোনও শব্দ আপনার নাকের মধ্যে কাঁপলে বুঝতে হবে আপনি নেকো।

নাকে কথা বলার অভ্যাস ত্যাগ করতে হলে বুকের ভেতর থেকে কথা টেনে এনে গলায় স্বরের গাঢ়ত্ব ঢেলে মুখ খুলে প্রকাশ করতে চেষ্টা করুন। মুখ যতখানি খুলে কথা বলবেন ততই আপনার কণ্ঠস্বরে আকর্ষণীয় পরিবর্তন আসবে। ঠোঁট দুটো সামান্য খুলে 'অলিভ' উচ্চারণ করুন তো। আচ্ছা এবার মুখ খুলে ঐ শব্দটি আবার বলুন। এই দুই ভাবে বলার মধ্যে যে স্বর তরঙ্গ প্রতিধ্বনিত হল তার পার্থক্য এতক্ষণে আপনি নিশ্চয় ধরতে পেরেছেন? কণ্ঠস্বরে সামান্য আবেগময় শিহরণ বা রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতে হলে সময়ে অসময়ে গুনগুনিয়ে আপনার প্রিয় গান গাইতে পারেন।

৫। আপনার কণ্ঠস্বর কি খুব চড়া ?

যদিও আপনি আপনার চড়া স্বরকে একে বারে খাদে নামাতে পারবেন না তবুও স্বরকে আয়ত্তে রাখার জন্য শব্দকে যতটুকু সম্ভব কোমল করে বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত করার অনুশীলন করতে পারেন। আবৃত্তি করুন,

ALONE ALONE ALL ALL ALONE
ALONE ALONE ON A WIDE SEA

অথবা মিষ্টি রোমান্টিক কবিতা আবৃত্তি করুন কোমল কণ্ঠে। অথবা বলুন, 'ওহে কেমন আছো?' একথা বলতে গিয়ে প্রথমে কপালে হাত রেখে সেই হাত লক্ষ্য করে আপনার কথাকে ছুঁড়ে দিন। এভাবে বলার পর এবার বুকে হাত রাখুন। আচ্ছা, এবার আবার ঐ কথাটি বুকের দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিন। এতে আপনার চড়া কণ্ঠস্বর কতটুকু গাঢ়ত্ব এবং উজ্জ্বলতা পেল তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। শত অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি গভীর ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে কোমল স্বরে নম্রভাবে কথা বলার জন্য পরিশ্রম করেন তবে আপনার চড়া স্বরের রুক্ষতা কমে গিয়ে কণ্ঠে আসবে কোমল উষ্ণতা ও মধুরতা।

সব কথার শেষে আমার কয়েকটি সাধারণ পরামর্শ ঃ কোরাসে গান গাইবেন, উপন্যাস, কবিতা উচ্চস্বরে পড়বেন। এতে আপনার ছন্দজ্ঞান বাড়বে এবং উচ্চারণ

সুস্পষ্ট হবে। একমাস বা তার বেশি এভাবে অনুশীলন করলে আপনার কথা বলার স্বতন্ত্র ভঙ্গি এমনিতেই গড়ে উঠবে। নিজে আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বরে সুন্দর ভাবে কথা বলতে পারলে নিজের মনেই তৃপ্তি পাবেন। শুধু নিজের মন থেকে এ আত্মতুষ্টি নয় অপরের কাছ থেকেও পাবেন উপযুক্ত মর্যাদা।

(সহায়ক তথ্য স্টিফেন এস প্রাইস রচিত নিবন্ধ থেকে সংগ্রহ)

বেতারে লেখা ও বলা

বেতারে আমরা শ্রোতাদের শিক্ষা, তথ্য বা আনন্দ যাই পরিবেশন করি না কেন তা পরিবেশিত হয় একটা গল্পের মাধ্যমে। এখানে গল্প বলতে প্রেমের গল্প বা রূপকথা নয়। বিষয়বস্তুর তথ্যগুলো এমনভাবে সাজিয়ে ও সুন্দর করে বলতে হয় যা শ্রোতাদের গল্পের মতোই আকৃষ্ট করে। সেই বলার মধ্যে আমরা শ্রোতাদেরকে তথ্য দিই, শিক্ষণীয় কিছু বলি। তাদেরকে হাসাই, কাঁদাই, উত্তেজিত করি, উৎসাহিত করি। আমাদের এই গল্প বলাটাই হল আমাদের অনুষ্ঠান। একটা অনুষ্ঠান তৈরি করতে হলে আমাদের যেসব পদক্ষেপ নিতে হয় তা হচ্ছে ঃ

(১) বিষয়বস্তু নির্বাচন
(২) বিষয়টা কীভাবে বলব তার জন্যে গল্পের পরিকল্পনা
(৩) গবেষণা
(৪) আলোকপাত বা ফোকাস
(৫) লেখা
(৬) মহড়া এবং ধারণ

অনুষ্ঠান নির্মাণের আগে প্রথমে ভাবতে হবে কী বিষয়ে আমি অনুষ্ঠান করব? কাদের জন্যে আমি আমার নির্বাচিত বিষয় পরিবেশন করব? কাদের জন্যে আমি গল্প বলব? কেন বলব? এই গল্প বলার গুরুত্ব, যথার্থতা কতখানি ? এই গল্পের আকর্ষণ অন্যের কাছে কতটুকু ? গল্পে সামগ্রিক আবেদন আছে কি?

আমাদের মনে রাখতে হবে শুধু ঘটনা বলা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য নয়। গল্পকারকে তার বক্তব্য বলার জন্য শ্রোতাকে আকৃষ্ট করতে হবে। শ্রোতাকে তার গল্পের ভেতর দিয়ে তারই মতো অনুভব করতে, অভিজ্ঞতা অর্জন করতে, আবেগাপ্লুত হবার রসদ জোগাতে হবে।

অনুষ্ঠান নির্মাতাকে ঐসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিজের মনকে কনভিন্স করতে হবে। বিষয়বস্তু নির্বাচন চূড়ান্ত করার পর কীভাবে বলা হবে তা নিয়ে গবেষণা করতে হবে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। গবেষণার কিছু নিয়মরীতি মেনে চলতে হবে। নিয়মগুলো হচ্ছে ঃ

(১) প্রাপ্ত তথ্য প্রথমেই বিশ্বাস না করে তা অন্য সোর্স থেকে কনফার্ম বা সত্যতার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

(২) পুরানো তথ্যের চাইতে নতুন তথ্য নিয়ে কাজ করতে হবে।

(৩) গল্পটা তথ্যসমৃদ্ধ করার জন্য যতদূর সম্ভব বেশি করে জানতে হবে, বেশি তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৪) গল্পটি ভালো করে বলবার জন্য মানসিক ধৈর্য ও জেদ থাকতে হবে। অনুষ্ঠানটি ভালো করে পরিবেশন করার জন্য জেদের বিকল্প নেই। এই জন্যেই বিষয় নিয়ে, গল্প বলার আঙ্গিক নিয়ে বারবার গবেষণা করতে হবে। কাউকে কিছু বলার আগে নিজেকে মানসিকভাবে তৈরি করতে হবে। জানতে হবে আমি কী বলব, কেন বলব, কাকে বলব, কতটুকু বলব, কেমন করে বলব এবং এই বলার প্রতিক্রিয়া বা ফলাবর্তন কী হবে?

(৫) গল্পের সেন্ট্রাল আইডিয়া বা মূল বক্তব্য হচ্ছে একটা ফুলের কুঁড়ির মতো। গল্পে বা অনুষ্ঠানের কোন অংশে কীভাবে এই কুঁড়ি প্রস্ফুটিত করতে হবে, কীভাবে গল্প বলাটা আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে গ্রন্থিত করতে হবে তা গবেষণা করে অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা করতে হয়। মূল বক্তব্য গল্পে নানাভাবে বিকশিত করা যায়। এটি নির্ভর করে আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু, অনুষ্ঠানের মেজাজ এবং উপস্থাপনা কৌশলের উপর। নাটকে, সঙ্গীতে, সাক্ষাৎকারে, প্রামাণ্য প্রতিবেদনে, আবহ শব্দের প্রয়োগে, বিশেষজ্ঞগণের বক্তব্যের উদ্ধৃতিতে, সংবাদপত্রের উদ্ধৃতির মাধ্যমে মূল বক্তব্য তথ্যনির্ভর করে পরিবেশন করা যায়।

(৬) গবেষণা সম্পন্ন করার পর শুরু হবে পাণ্ডুলিপি লেখার কাজ। লিখতে হবে সহজ সরল ভাষায়, কথা বলার ভঙ্গিতে। বেতারে লেখা এবং বলা একটা আর্ট, একটা শিল্প। এই শিল্প যিনি আয়ত্ত করতে পারেন তিনি শ্রোতাদের কাছে পরিচিত হন এক আকর্ষণীয় বেতার ব্যক্তিত্বে। কী কলাকৌশলে শ্রোতাদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হতে পারে সে বিষয়ে আমাদের কিছু সাধারণ পরামর্শ রয়েছে। পরামর্শগুলো হচ্ছে ঃ

আকর্ষণীয় সূচনা

যে বিষয় নিয়ে লেখা হোক না কেন লেখার শুরুটা এমন কথা দিয়ে শুরু করতে হবে যা তাৎক্ষণিকভাবে শ্রোতাদের আকর্ষণ করবে এবং শ্রোতার শোনার আগ্রহকে ধরে রাখবে। সাদামাঠা বর্ণনার মাধ্যমে শুরু না করে সম্পর্কযুক্ত উপাখ্যান, ঘটনা বা বর্ণাঢ্য আবহের মধ্য দিয়ে শুরু করা ভালো। শুরু করার পর শ্রোতাকে বলুন তাকে কী বলতে যাচ্ছেন। বলার পর বলবেন কী বলেছেন।

নিজস্ব ভঙ্গিতে কথোপকথন

কথিকা পাঠে বা অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় বক্তৃতার ঢং-এর চাইতে কথা বলার স্বাভাবিকতা, নিজস্ব কথনভঙ্গি এবং একের সাথে অন্যের মধ্যে কথাবার্তার ধাঁচ সবচেয়ে কার্যকরী। কথনভঙ্গিতে নিজেকে আমি এবং শ্রোতাকে আপনি হিসাবে উপস্থাপন করলে কথোপকথনভঙ্গি ফলপ্রসূ হয়।

শ্রুতির জন্যে লেখা

লেখার সময়ে ছোটো ছোটো কথা, ছোটো ছোটো বাক্য এমনভাবে ব্যবহার করতে হয় যা একজন অন্ধ বা আধা বধিরও বুঝতে সক্ষম। কোনও বিষয়ে শ্রোতাদের বলতে গেলে এমন গতি ও বিরতি সহকারে বলা দরকার যাতে শ্রোতারা বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে শোনা ও বলার জন্যে সময় পায়। তাই তড়িঘড়ি করে দ্রুত না পড়াই উচিত।

সক্রিয় শব্দাবলী

লেখার সময়ে নিষ্ক্রিয় ধরনের বাক্য পরিহার করুন। সতেজ, সহজ এবং এমন কার্যকরী শব্দের ব্যবহার করুন যা শ্রোতাদের মনে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়।

চিত্রধর্মিতা

চিত্রধর্মিতা তখনই ফুটে ওঠে যখন লেখার মধ্যে ঘটনা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির আকর্ষণীয় বর্ণনা থাকে। তাই শ্রোতাদের মনের পর্দায় ভিস্যুয়াল এফেক্ট তৈরির জন্য পরিবেশ পরিস্থিতির বর্ণনাসহ বাস্তব ছোঁয়া কাহিনীর সংক্ষিপ্ত অবতারণা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুকৌশল প্রয়োগ ঘটানো যেতে পারে।

অতি ব্যবহৃত সস্তা গতানুগতিক পদ

লেখাটিতে সুরুচির পরিচয় দিতে অতি ব্যবহৃত সস্তা পদ সমষ্টি, খিস্তি খেউড়, পুরানো ধরনের বাক্যরীতি পরিহার করুন। তবে কৌতুক, বিদ্রুপ অথবা প্রহসন জাতীয় বিষয়ভিত্তিক কথিকাতে সরস আবহ তৈরির জন্যে ব্যতিক্রম হিসাবে সম্পর্কযুক্ত কিছু গতানুগতিক পদ বা পুরানো বাক্যরীতি সুকৌশলে ব্যবহার করতে পারেন।

সময়ের স্বল্পতা

আপনার বলার সময় সীমাবদ্ধ। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রস্তাবিত বিষয়ে অল্প কথায় প্রয়োজনীয় তথ্য ও মন্তব্য দিয়ে লেখাটি শেষ করুন।

স্পষ্টতা

বক্তব্যের স্পষ্টতা ও সরাসরি ভাব প্রকাশের ব্যাপারে নিজেকে আপোষহীন রাখুন। লেখালেখি, কাটাকাটি ততক্ষণ চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়বস্তুর অর্থ স্পষ্ট, যথার্থ ও মানসম্পন্ন না হয়। লেখার সময়ে সচেতন থাকতে হবে কাহিনীর প্রয়োজনীয় ছয়টি ***ক*** (কে, কি, কোথায়, কখন, কেন, কিভাবে) সম্পর্কে। ইংরেজীতে পাঁচটি ***ডব্লিউ*** (হু, হোয়াট, হয়্যার, হোয়েন, হোয়াই) এবং একটি ***এইচ***-হাউ।

সংকোচন বা সংক্ষিপ্ততা

বাক্যের মধ্যে শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ কথ্য ভাষার মাধ্যমে ব্যবহার করুন। যেমন ***করিতেছি*** এর পরিবর্তে ***করছি*** ইতাদি ব্যবহার করবেন। চলতি ও সাধু ভাষার সংমিশ্রণ পরিহার করুন।

কথ্যরীতি

চলতি বা কথ্য ভাষা ব্যবহারে পরিচ্ছন্নতা, সরলতা ও সুরুচি বজায় রাখা দরকার। কথ্য ভাষা এমন হওয়া উচিত নয় যাতে শরীরী কুরুচি প্রকাশ পায় বা গ্রাম্যতার প্রকাশ ঘটে। বেতার কথিকায় কথ্য ভাষা রীতি হচ্ছে সরল কথোপকথনের কিন্তু রুচিপূর্ণ।

পরিসংখ্যান, সুনির্দিষ্ট তারিখ বা সময়সূচক ভাব

কথিকায় পরিসংখ্যান, উপাত্ত, গাণিতিক হিসাব নিকাশ বর্জনীয়। শ্রোতাদের পক্ষে এসব মনে রাখা সম্ভব নয়। কথিকায় প্রয়োজন ছাড়া সাধারণভাবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণের উল্লেখ না করলেও চলে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস, ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস, ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষা ও শহীদ দিবস। এসব ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই বৎসর ও দিনের উল্লেখ অপরিহার্য।

শিক্ষামূলক কথিকা

শিক্ষামূলক, সাহিত্য, বিজ্ঞান বা বিশেষ কোনও বিষয়ের ওপর নিজের দক্ষতা, মৌলিকতা ও অবস্থান সম্পর্কে আস্থাশীল হতে হবে। যে বিষয় নিয়ে কথা বলবেন, সে বিষয়ে আপনার জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়ে আস্থার সঙ্গে কথা বলতে হবে। বিষয়টি সম্পর্কে আপনার মৌলিক জ্ঞান না থাকলে তা কখনই সহজ করে লিখতে ও বলতে পারবেন না।

প্রকাশভঙ্গি

যা লিখবেন তা বলার জন্য যতটা সম্ভব শুদ্ধ উচ্চারণে, মার্জিত বাচনভঙ্গিতে কথা বলুন। অশুদ্ধ উচ্চারণ, অমার্জিত বাচনভঙ্গি কখনই শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে না।

পুনরাবৃত্তি

কথিকায় প্রয়োজনীয় বিশেষ তথ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, এবং শ্রোতাদের বুঝার জন্যেই বিভিন্নভাবে ব্যখ্যা দেওয়া যেতে পারে। শ্রোতাদের সুবিধার জন্যেই মুদ্রণ মাধ্যমের চেয়ে বেতারে প্রয়োজনীয় তথ্যের পুনরাবৃত্তির অর্থই হচ্ছে শ্রোতার মনে তথ্যটি গভীরভাবে দাগ কেটে বসানো।

শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাসে সতর্কতা

কোনও বিশেষ বিষয়ের টেকনিক্যাল শব্দ, অর্থহীন বাক্য, জটিল শব্দ, দ্ব্যর্থবোধক কথা এবং দীর্ঘবাক্য পরিহারযোগ্য। যখন কোনও অপরিচিত শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন হবে তা সহজ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও বর্ণনার মাধ্যমে বোঝাতে হবে।

স্পর্শকাতর বিষয়ে সাবধানতা

এমন কোনও বিষয়ের অবতারণা করা উচিত নয়, এমন কোনও বাক্য ব্যবহার করা উচিত নয় যা কোনও জনগোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে, তাদের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ভীতি সৃষ্টি করতে পারে, বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে, পরস্পরের মধ্যে সংঘাত, ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হবার জন্যে উস্কানি প্রদান করতে পারে। এছাড়া সমাজের কোনও স্তরের শ্রমজীবী মানুষের সৎ পেশার প্রতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কটাক্ষ, কারো শারীরিক বৈকল্য নিয়ে উপহাস বেতার প্রচার নীতিমালার পরিপন্থী। কথিকায় এসব স্পর্শকাতর বিষয় সতর্কতার সাথে পরিহার করুন।

আঙ্গিক

পৃষ্ঠার উভয় দিকে মার্জিন রেখে ডবল স্পেসে কথিকাটি টাইপ করা হলে পড়ার জন্যে সুবিধা হবে। টাইপ করা সম্ভব না হলে পৃষ্ঠার একদিকে বড় বড় করে লিখতে হবে প্রতিটি পৃষ্ঠায় নম্বর দিতে হবে এবং পড়ার আগে পৃষ্ঠা থেকে পিন খুলে নিতে হবে। পড়বার সময় প্রতিটি পৃষ্ঠা এমন সাবধানে ধরতে হবে যাতে কাগজের খসখস শব্দ মাইক্রোফোনে না পৌছায়।

উপস্থাপনা কৌশল

এবার আসা যাক অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা কৌশল প্রসঙ্গে। বেতারে যে অনুষ্ঠান আমরা পরিবেশন করি তার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতাদের অনুষ্ঠান উপভোগের আমন্ত্রণ জানানো। ইংরেজীতে যাকে বলে *কাম অ্যান্ড এনজয়* । চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই পরিবেশন করা হয় শিক্ষা ও তথ্য। কিন্তু অনুষ্ঠান শোনার জন্যে শ্রোতাদের কখনও বাধ্য করা যায় না। কৌশলে তাদের আকর্ষণ করতে হয়। এই আকর্ষণের দায়িত্ব কার? সুকৌশলে ক্রেতাকে আকর্ষণ করার জন্যে বিপণীতে যেমন সেল্‌সম্যান তেমনি একজন অনুষ্ঠান ঘোষক বা উপস্থাপকও বেতার অনুষ্ঠানের সেল্‌সম্যান। অনুষ্ঠান ঘোষক বা উপস্থাপক হচ্ছে বেতারের মুখপাত্র বা প্রতিনিধি।

বেতারে প্রত্যেক মাইক্রোফোন পারফর্মারের মূলমন্ত্র হচ্ছে বন্ধুর সাথে কথা বলা। একজন পারফর্মার হিসাবে আপনি যখন মাইক্রোফোনের সামনে আসবেন তখন কথা বলুন। কারণ রেডিও হচ্ছে কথা বলা, সুন্দর করে কথা বলা। যদিও আপনার হাতে পাণ্ডুলিপি রয়েছে কিন্তু তা বক্তৃতার মতো, উপদেশের মতো, পাঠ্যবই পড়ার মতো করে পড়বেন না।

কথা বলার সময় শ্রোতাকে বেশি বুদ্ধিমান অথবা একেবারে বুদ্ধিহীন বা অবোধ ভাববেন না। ধরে নিন যে তিনি আপনার মতোই বুদ্ধিমান। তবে তার চাইতে আপনি স্বতন্ত্র। কেননা বেতারের স্টুডিওতে মাইক্রোফোনের সামনে আপনি যখন বসবেন তখন আপনি বেতারের মুখপাত্র। শ্রোতার কাছে আপনি আকর্ষণীয় অথচ রহস্যময় ব্যক্তিত্ব। আপনার শ্রোতা আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু তিনি আপনার কণ্ঠমাধুর্য এবং কথনভঙ্গির মাধ্যমে আপনার অস্তিত্ব, আপনার ব্যক্তিত্ব, আপনার অন্তরঙ্গতা অনুভব করতে পারছেন। তাই বেতারে ঘোষক ও শ্রোতা পরস্পরের বন্ধু। কেউ কাউকে দেখতে পায়না কিন্তু উভয়েই উভয়ের চেহারা কল্পনা করে নেয়।

সামান্য অভিনয়

তথ্য, চিন্তা ও আবেগ বহনের জন্য বেতারে শব্দ হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম। এখানে প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য ইশারা ইঙ্গিত, দেখন হাসি, ভ্রুকুটি করার কোনও অবকাশ নেই। এ সব কিছুই কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। কণ্ঠস্বরে ৎসামান্য অভিনয় করেই এই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা সম্ভব। একটি অনুষ্ঠান লক্ষ

হাজার শ্রোতার উদ্দেশে নিবেদিত হতে পারে। কিন্তু হয়তো শুনেছেন একজন, দুজন বা একটি পরিবারের কয়েকজন। সুতরাং উপস্থাপক হিসাবে উঁচু কণ্ঠস্বরে বা চিৎকার করে পড়া বা কথা বলার প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক স্বরে কথা বলুন। যখন আপনি কাউকে দেখে স্মিত হাসেন, সেই ভাবটি আপনি কণ্ঠস্বরেও আনতে পারেন।

আগ্রহ প্রদর্শন

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানসমূহের পরিবেশনয় উপস্থাপক হিসাবে আপনার কণ্ঠে সামান্য উত্তেজনা, আগ্রহ ও আনন্দের ভাব বজায় রাখতে হবে। শুরু করতে হবে সামান্য উঁচু লয়ে। এর জন্যেও প্রয়োজন অভিনয়। আপনি যদি উৎসাহী হন তবে শ্রোতারাও উৎসাহী হবেন। তবে অতি উৎসাহ ভালো নয়। আপনি যদি আপনার কণ্ঠে নিষ্প্রাণ হন, একঘেয়ে হন, শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনে নিজেকে অবনমিত রাখেন, অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারকালে নিজেকে আন্তরিকভাবে সম্পৃক্ত না রাখেন তবে শ্রোতাদের কাছে আপনি বিরক্তিকর বস্তুতে পরিণত হবেন।

শ্রোতা মনস্তত্ত্ব

যে অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হচ্ছে, বন্ধু ভেবে যে অদৃশ্য শ্রোতার সাথে আপনি কথা বলছেন আপনি কি ভেবে দেখেছেন তিনি কী জানতে পছন্দ করেন? আপনার ভেবে দেখতে হবে ইতোমধ্যে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে কতটুকু জানেন বা বিষয়বস্তুর কোন তথ্যটি তার অজানা? এ বিষয়ে তার আগ্রহ কতটুকু? যে অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হচ্ছে সেই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য কারা? এসব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনাই হচ্ছে শ্রোতা মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা।

দায়িত্বশীল প্রতিনিধিত্ব

মাইক্রোফোনে আপনি যদি বিন্দুমাত্র দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেন, কি বলছেন সে সম্পর্কে সচেতন না থাকেন, খারাপ রুচির পরিচয় দেন, অসৌজন্য প্রকাশ করেন তা হলে মুহূর্তেই আপনার খ্যাতি বিলীন হয়ে যাবে। প্রতিষ্ঠানের সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আপনি যদি ঘটনা পরিবেশনে এলোমেলো, বিশৃঙ্খল থাকেন, সঠিক তথ্য প্রদান না করেন তা হলে আপনাকে অবিশ্বস্ত আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং একজন ব্রডকাস্টারকে বেতারের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন একজন অনুষ্ঠান ঘোষক বা উপস্থাপক ভাষার শব্দ ভাণ্ডার হিসাবে, ভাষা প্রয়োগে, বাচনভঙ্গিতে এবং উচ্চারণের ক্ষেত্রে শ্রোতাদের কাছে আদর্শ হিসাবে বিবেচিত। বেতার হচ্ছে এতটি শক্তিশালী মাধ্যম। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ প্রভাবিত করার জন্য বিপুল শক্তি রয়েছে বেতারের। সুতরাং বেতারে মাইক্রোফোনের সামনে যারা বসছেন তাদেরকে অবশ্যই দায়িত্বশীল মুখপাত্র হিসাবে নিজের দোষগুণ সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। নিজের কণ্ঠ, বাচনভঙ্গি,

পরিবেশনার কৌশলগত গুণাগুণ সম্পর্কে সব সময়ে শ্রোতাদের সমালোচনাকে স্বাগত জানাতে হবে। তাদের মতামত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে এবং নিজের ভুলত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে শ্রোতাদের সমালোচনাই হচ্ছে আপনার একমাত্র সাহায্যকারী। আপনার শ্রোতারাই আপনার কণ্ঠের, আপনার অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত বিচারক।

একজন ঘোষকের সম্পদ কী? তার সম্পদ হচ্ছে দুটি-একটি হচ্ছে তার কণ্ঠ আর একটি হচ্ছে তার মাইক্রোফোন। কণ্ঠ এবং মাইক্রোফোনের সুউপযুক্ত ব্যবহার করে যিনি শ্রোতা-দর্শককে আকৃষ্ট করতে পারেন, আনন্দ দান করতে পারেন, বিমোহিত করতে পারেন তিনিই সফল পারফর্মার। সুতরাং মাইক্রোফোনে সফল পারফর্মার হতে হলে যে অনুশীলন ও নৈপুন্য প্রয়োজন তা হচ্ছে ঃ

(১) **শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ঃ** নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে এক দমে কতটুকু পড়তে হবে, বাক্যের গঠন, ভাব ও অর্থ অনুযায়ী, যতি চিহ্ন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কোথায় বিরতি দিতে হবে তা নির্ভর করে নিজের সচেতনতা ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের উপর।

(২) **সুস্পষ্ট উচ্চারণ ঃ** আপনার উচ্চারণ হবে শুদ্ধ ও সুস্পষ্ট। বাচনভঙ্গি হবে মার্জিত। অনুষ্ঠান যত উচ্চমানের হোক না কেন তা যদি অশুদ্ধ উচ্চারণে অমার্জিত বাচনভঙ্গিতে পরিবেশিত হয় তা কেউ শুনবে না।

(৩) **যথাযথ পদক্ষেপ ঃ** উপস্থাপনাকালে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে চিৎকার করবেন না আবার গদগদভাবে বেশি অন্তরঙ্গ হবেন না। এখানে প্রয়োজন পরিমিতিবোধ।

(৪) **স্বর বিস্তারে বৈচিত্র্য ঃ** উচ্চ-গ্রামে কথা বলবেন না খুব নিম্ন-গ্রামেও নয়। মাঝারি পর্যায়ে স্বর বিস্তারে বৈচিত্র্য আনতে হবে।

(৫) **অনুরণন ঃ** কণ্ঠ কর্কশ হবে না, নাকি হবে না, মেকি হবে না। কণ্ঠ হবে স্বাভাবিক। উষ্ণ এবং সাংগীতিক বুনট থাকবে তাতে।

(৬) **কণ্ঠের যত্ন ও অনুশীলন** কর্কশভাবে কণ্ঠ পরিষ্কার করবেন না। কক্ষ অতিক্রম করতে পারে এরকম দূরত্বে ফিসফিস করে সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলুন। স্বর প্রক্ষেপণে ঠোঁট, চোখ, জিহ্বার যথাযথ ব্যবহার করুন। আয়নার সামনে উচ্চস্বরে কবিতা আবৃত্তি করুন। অনুশীলনকালে গলা ছেড়ে গান গাইবেন তবে কণ্ঠে বেশি চাপ প্রয়োগ করবেন না এবং টানা জায়গাগুলোতে দম রাখবেন। বারবার গভীরভাবে শ্বাস নিন। পুরো শ্বাস ত্যাগ করুন। নিজের কণ্ঠ রেকর্ড করুন। শুনুন। নিজের কণ্ঠের দোষত্রুটি নিজেই বিচার করুন। নিজে না পারলে অভিজ্ঞ সহকর্মী বন্ধুদের সাহায্য নিন। কণ্ঠস্বরের ত্রুটি, উচ্চারণের ত্রুটি দূর করার জন্যে কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিন। তাদের পরামর্শ নিয়ে পদ্ধতিগতভাবে অনুশীলন

করুন। অব্যাহত অনুশীলনে আপনার কথা বলার স্বতন্ত্র ভঙ্গি আস্তে আস্তে গড়ে উঠবে। আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বরে এবং স্বউদ্ভাবিত উপস্থাপনা কৌশলে আপনি একজন বেতার ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন শ্রোতাদের কাছে।

বেতারে লেখা ও বলা সম্পর্কে শেষ কথা হচ্ছে বেতারে সব লেখাই কানের জন্যে। চোখের জন্যে নয়। তাই শ্রোতাদের আগ্রহ রয়েছে এমন কোনও বিষয়ে নতুন কোনও তথ্য নিয়ে সহজ করে লিখুন এবং সুন্দর করে বলুন।

সাক্ষাৎকার

আধুনিক সাংবাদিকতায় সংবাদকে ব্যতিক্রমী ঢংএ উপস্থাপনের একটি চমৎকার কৌশল সাক্ষাৎকার। বর্তমানে সংবাদ পরিবেশনের একটি প্রধান হাতিয়ার হিসাবে সাক্ষাৎকার আজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। সাধারণ মানুষের কাছে সাক্ষাৎকার হচ্ছে দুজন ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন যা কোনও সংবাদপত্র, রেডিও বা টেলিভিশনের পক্ষ থেকে রেকর্ড করা হয়। আপাত দৃষ্টিতে ব্যাপারটি সহজ মনে হলেও সাক্ষাৎকার গ্রহণে যথেষ্ট পরিশ্রম ও দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ এটা মোটেও শুধু রেকর্ড করা বক্তব্য নয়। এখানে যে ব্যক্তি সাক্ষাৎকার নিতে যাচ্ছেন তাকে অবশ্যই কিছু বিশিষ্ট গুণাবলীর অধিকার হতে হয়। কেননা এখানে চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনার ব্যাপার আছে, লেখার ব্যাপার আছে, কথা বলে তথ্য আদায়ের ব্যাপার আছে।

সাক্ষাৎকার হল এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়। এটা এমন এক ধরনের আলোচনা যার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ বা সংবাদ সরবরাহ করা হয়। এটা এক ধরনের দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে দুটো পক্ষ অর্থাৎ interview is the personal contact between the reporter and the interviewee (সাক্ষাৎকারদাতা)। এখানে যে পক্ষের গুরুত্ব বেশি তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎকারদাতা। উভয় পক্ষই তাদের পারস্পরিক কথাবার্তা তৃতীয় কোনও ব্যক্তি বা মধ্যস্থতাকারীর সাহায্য ছাড়াই চালিয়ে যায়।

এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দু'জন লোক কোনও পূর্ব ধারণা ছাড়াই আলাপ-আলোচনা করলে তাকে সাক্ষাৎকার বলা যায় না। সেটা সামাজিক আলাপ-আলোচনা হতে পারবে। সাক্ষাৎকারকে বলা যায় সবচেয়ে Polished entertaining feature. সাক্ষাৎকার সাধারণত আনুষ্ঠানিক এবং উদ্দেশ্যমূলক হয়। কিন্তু সামাজিক আলোচনা হয় সময় কাটানো ও আনন্দ লাভের জন্য। সাক্ষাৎকারে দু'পক্ষকেই কথার আদান-প্রদান করতে হয়। শুধু একজন কথা বলে চললেই সেটা সাক্ষাৎকার হবে না। এটা ব্যক্তিগত বক্তৃতা হতে পারে। যে কোনও ধরনের জিজ্ঞাসাবাদই সাক্ষাৎকার নয়। সাক্ষাৎকার হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোনও খ্যাতনামা ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জনসাধারণের আগ্রহ রয়েছে এমন বিষয়ে মতামত, ধারণা বা বিশেষ ধরনের তথ্য আকর্ষণীয় প্রশ্নের মাধ্যমে সংগ্রহ ও পরিবেশন করা হয়।

সাক্ষাৎকারের ইতিহাস

গত শতকের তৃতীয় দশক থেকেই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশনের পদ্ধতিটি শুরু হয়। প্রথম সংবাদ সাক্ষাৎকারের কৃতিত্ব সাধারণত দেয়া হয় জেমস গর্ডন বেনেটকে। ১৮৩৬ সালে নিউইয়র্ক সিটির একটি ফ্যান্সি হাউজ-এ একটি খুনের ঘটনার ব্যাপারে তার মালিক রোজিনা টাউনসেন্ডকে বেনেট যে প্রশ্নাবলী করেন তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আদালতে যেমন সওয়াল-জবাব চলে সেভাবেই বেনেটের নেয়া এ ধরনের সাক্ষাৎকার নিউইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। খবরের কাগজে ফিচার হিসেবে সাক্ষাৎকারের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন এই গর্ডন বেনেট।

তার প্রায় পঁচিশ বছর পর হোরেস গ্রীলি মরমোন নেতা ব্রিগহ্যাম ইয়াং-এর সাক্ষাৎকার নেন এবার তা নিউইয়র্ক ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সে সময় মার্কিন দাস প্রথা ও বিচ্ছিনতাবাদ ইত্যাদি সমস্যার প্রশ্নোত্তর—সাংবাদিকতা বেশ উপজীব্য হয়ে ওঠে। গ্রীলি মূলত সাক্ষাৎকার-সাংবাদিকতার একটা নয়া আঙ্গিক প্রদান করেন।

সাক্ষাৎকার-সাংবাদিকতার সূচনা আমেরিকাতে হলেও এবং তা বেশ জনপ্রিয় হলেও লন্ডনের পলমল গেজেট-এ তার তীব্র সমালোচনা করা হয়। এতে বলা হয় আমেরিকান সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকারীর (রিপোর্টার) মানকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে। সাক্ষাৎকারদাতাকে বিরক্ত করে তুলছে এবার পাঠককে করে তুলছে ক্লান্ত। ১৮৬৯ সালে গডকিনের উদারনৈতিক অথচ বুদ্ধিবৃত্তিক পত্রিকা নেশন-এ বলা হয়, মূলত সাক্ষাৎকার হচ্ছে বেতনভূক কোনও রাজনীতিকের প্রতারণা এবং কোনও সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টারের প্রতারণার মিশ্র ফল। 'কিন্তু 'শিকাগো ডেইলি নিউজ'-এর বিদেশ সংবাদদাতা এডওয়ার্ড প্রাইম বেল এই সমালোচনাকে নিজে তুলে ধরলেও বলছেন, বড় ধরনের সাংবাদিকতার গুরুত্বের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে এবং সাক্ষাৎকার বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মানুষের জ্ঞানের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

সাক্ষাৎকার কেন নেওয়া হয় (সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যাবলী)

আধুনিক সাংবাদিকতায় সাক্ষাৎকার হচ্ছে সংবাদ কাহিনীর একটি জনপ্রিয় ফসল। তাই সঙ্গত কারণে এর পিছনে কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। কেননা আমরা যদি প্রশ্ন করি সাক্ষাৎকার কেন নেওয়া হয়, তখনই উদ্দেশ্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এগুলো হচ্ছে

To entertain	আনন্দ দান
To educate	শিক্ষা দান
To inform	তথ্য প্রদান
To give practical guidance	বাস্তব নির্দেশনা।

(১) To entertain (আনন্দ দান করে) ঃ interview story পড়ে পাঠক সাক্ষাৎকার গ্রহীতার কাজ থেকে সাক্ষাৎকার দাতার অনেক চমকপ্রদ ঘটনা জানতে পারে যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে সর্বদা পরিবেশিত গুরুগম্ভীর সংবাদ থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের আনন্দ প্রদান করে।

(২) To educate (শিক্ষা প্রদান করে) ঃ এই ধরনের সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকার দাতা তার সৃষ্টিশীল ও প্রগতিশীল চিন্তা, চেতনা তুলে ধরেন যা জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক। অর্থাৎ এখানে সাক্ষাৎকারদাতার জীবন, দর্শন, চিন্তা-চেতনা, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং এ থেকে পাঠকরা অনেক শিক্ষা লাভ করে এবং সাক্ষাৎকারদাতার চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি তাদের নিজের জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখে।

(৩) To inform (তথ্য প্রদান করে) ঃ অজানা ও গোপন তথ্য বের করাই সাক্ষাৎকারের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সাথে তথ্যের সূক্ষ্ম দিকটা তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক বিষয় ও সমস্যা এবং সেই সাথে সমস্যা সমাধান ও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

(৪) To give practical guidance (বাস্তব নির্দেশনা দান করে) ঃ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পাঠককে বাস্তব নির্দেশনা দেওয়া হয়। যেমন—গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ দিচ্ছে। এই ঋণ কারা পাবার যোগ্য, ঋণ পেতে হলে আবেদনকারীর কী করণীয়, ঋণ পাওয়া গেলে তা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, ঋণ কীভাবে শোধ করতে হবে, কীভাবে নিজেকে স্বনির্ভর করতে হবে, এ বিষয়ে যদি গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনুস-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যায় তাহলে বাস্তব দিক নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব হয়।

এছাড়া W.G. Bleyer "How to write special feature" গ্রন্থে সাক্ষাৎকারের তিনটি প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এগুলো হচ্ছে,

(১) সাক্ষাৎকারের প্রশ্নোত্তর অবিকল ভাবে তুলে ধরা। কারো মুখের কথা অবিকলভাবে তুলে ধরা হলে সেটা অনেকটা বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে এবং কাহিনীকে পাঠকের কাছে জীবন্ত করে তোলে। সাক্ষাৎকার ব্যতীত অন্য কোনও সংবাদ কাহিনীর মাধ্যমে এটা করা সম্ভব নয়।

(২) সাংবাদিক যে বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেন, তার বক্তব্য, মতামত, তথ্য পাঠকের কাছে অসামান্য। তাই সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে নির্মিত সংবাদ কাহিনী পাঠকের কাছে সবচাইতে বেশি গ্রহণযোগ্য।

(৩) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা হয় ও বিনোদন জ্ঞাপন করা হয়। কোনওকিছুর সাক্ষাৎকার দাতার মতামত দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পেরে পাঠক আশ্বস্ত ও পরিতৃপ্ত হয়।

INTERVIEW PROCESS/INTERVIEW STORY (সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া/সাক্ষাৎকার কাহিনী)

সাংবাদিকরা ইন্টারভিউ প্রসেস বা সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া বলে একটি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। পত্রিকায় যত সংবাদ ছাপানো হয়, তার মূলে রয়েছে ইন্টারভিউ প্রসেস। যেমন—একজন সাংবাদিক বাজারে গেছেন আলুর ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে। শহরে হঠাৎ করে আলুর ব্যবহার কমে গেছে এবং আলুর ব্যবসায়ে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে গেলে তাকে বিভিন্ন জায়গায় ভোক্তা ও বিক্রেতার কাছ থেকে নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে সমস্যার শিকড় চিহ্নিত করতে হবে। উত্তরসহ এটা ছাপানো হলে তাকে নিউজ স্টোরি বলে। কিন্তু এই সংবাদ তৈরি করা সম্ভব হয় সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ার সাহায্যে। আবার যেমন ঢাকার অদূরে ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে আশেপাশের মানুষ, প্রত্যক্ষযাত্রী, রেলওয়ের লোক সবার সাথে কথা বলার পর যে সংবাদটি তৈরি করা হয়, সেটা পত্রিকার ইন্টারভিউ স্টোরি হিসেবে যায় না, যায় অ্যাক্সিডেন্ট স্টোরি হিসাবে। যদিও প্রশ্নের মাধ্যমে এখানে ঘটনাটি তুলে ধরা হয়েছে। তাই ইন্টারভিউ প্রসেস এবং ইন্টারভিউ স্টোরি আলাদা। ইন্টারভিউ প্রসেস এর চেয়ে ইন্টারভিউ স্টোরির ক্ষেত্র বিস্তৃত। ইন্টারভিউ স্টোরির সাহায্যে কোনও ব্যক্তির পরিবেশ, পরিবার, তার স্বভাব চরিত্র ইত্যাদি ছবিসহ তুলে ধরা যায়। সোজা কথায় ব্যক্তির জীবনকে ইন্টারভিউ স্টোরির মাধ্যমে তুলে ধরা যায়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রস্তুতি

ইংরেজিতে একটি কথা আছে, "Before you can have your rabbit stew catch the rabbit first." অর্থাৎ খরগোশের সুরুয়া খেতে হলে প্রথমে আমাকে খরগোশ ধরতে হবে। তেমনি কোনও কাজ করতে গেলে সে কাজটির ব্যাপারে কিছু প্রস্তুতির দরকার হয়। সাক্ষৎকারের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। একটি ইন্টারভিউ স্টোরি তৈরি করতে সাক্ষাৎকার গ্রহীতাকে যে কী পরিমাণ প্রস্তুতি নিতে হয়, পরিশ্রম করতে হয় তা কোনও পাঠক দর্শক বা শ্রোতার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এ জন্যেই ভাসমান বরফ স্তুপের সাথে সাক্ষাৎকারের তুলনা করা হয়। যা দেখা যায়, তা হয়তো পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু একটি ভালো সাক্ষাৎকারের জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। যে রিপোর্টারের প্রস্তুতি যত ভালো হয় তার সাক্ষাৎকার তত সফল হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মানসিক প্রস্তুতির সাথে প্রয়োজন শারীরিক প্রস্তুতি। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে অবশ্যই সুস্থ দেহে, মার্জিত বেশে সাক্ষাৎকার নিতে যেতে হবে। খুব উগ্র সাজ-পোশাকে বা খুব ঘরোয়াভাবেও যাওয়া উচিত নয়। এমন কোনও কুঅভ্যাস (যেমন পেন্সিল বা কলম কামড়ানো, কলম দিয়ে কান খোচানো বা নাক খোচানো ইত্যাদি) প্রদর্শন উচিত নয় বা সাক্ষাৎদাতার বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। অর্থাৎ সাক্ষাৎকার

গ্রহীতাকে নিজের সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং নিজকে ভদ্র ও মার্জিত বেশে নিজেকে সজ্জিত করতে হবে যাতে করে সাক্ষাৎদাতা প্রথম দর্শনেই সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর প্রতি আকৃষ্ট হন।

এবার আসা যাক মানসিক প্রস্তুতির প্রসঙ্গে। মানসিক প্রস্তুতির জন্যে যা করা দরকার তা হচ্ছে ঃ

(১) যে বিষয়ে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে সে বিষয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহীতার স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। কেননা যে বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে যে বিষয়ে সাংবাদিকের জানা না থাকলে তিনি সাক্ষাৎদাতার পাল্টা কোনও প্রশ্নে অপ্রস্তুত হয়ে যেতে পারেন এবং এ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎদাতা যা বললেন, তাকে তাই মেনে নিতেই হবে। এই বিব্রতকর অবস্থা পরিহারের জন্যেই প্রয়োজন বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা।

(২) এমন বিষয় নির্বাচন করতে হবে যা গুরুত্বপূর্ণ এবং যাতে জনগণের আগ্রহ রয়েছে। একটি সাক্ষাৎকার একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। একটি সাক্ষাৎকার অধিক বিষয়ের সংযোজন আদৌ কাম্য নয় এবং ভালো সাক্ষাৎকার হিসাবে বিবেচিত নয়।

(৩) যার সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে তার বয়স, পদ মর্যাদা, তার মতামত, পছন্দ-অপছন্দ, তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যতটা সম্ভব আগে জেনে নিতে হবে। এটা জানা যাবে—

—সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে,

—পূর্বেকার খবরা-খবর থেকে,

—যদি সাক্ষাৎকারদাতার কোনও বই-পুস্তক বা পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে সেটা থেকে।

(৪) কী কী প্রশ্ন করা হবে সে সম্পর্কে সাংবাদিককে আগেই একটি ছক ও কৌশল তৈরি করে নিতে হবে। প্রশ্নমালা হবে সুচিন্তিত, সময়োচিত, লজিক্যাল, সংক্ষিপ্ত এবং টু দি পয়েন্ট। একটার পর একটা এমন নতুন ধরনের প্রশ্ন করতে হবে যা সাক্ষাৎকারদাতাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে এবং প্রাসঙ্গিক উত্তর দিতে বাধ্য করবে। তবে এমন কোনও প্রশ্নের অবতারণা করা উচিত নয় যা বিষয় বহির্ভূত, অপ্রাসঙ্গিক ও অবাস্তব। পুরোনো কথা, জানা কথা নিয়ে প্রশ্ন বা উত্তরের প্রতি পাঠকরা আদৌ আগ্রহী হবে না এবং সাক্ষাৎকারদাতাও আনন্দ পাবেন না।

(৫) সাক্ষাৎকার গ্রহীতা সাক্ষাৎকারদাতার উপর প্রভাব বিস্তার করবেন পেশাগত কৌশল, বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন, চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন দিয়ে। কিন্তু সাক্ষাৎকার গ্রহীতাকে অবশ্যই নিজের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। নিজের ব্যক্তিগত মতাদর্শ, ধ্যান-ধারণার সাহায্যে জোর করে সাক্ষাৎকারদাতাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয় নয়।

(৬) সাক্ষাৎকারদাতার বিকল্প চিন্তা করে রাখুন। সাক্ষাৎকারদাতা হঠাৎ করে কথা বলতে অস্বীকার করতে বা জরুরি অনাকাঙ্ক্ষিত কাজে আটকে যেতে পারেন। বিকল্প সাক্ষাৎকারদাতা ঠিক করে প্রাথমিক আলাপ করে রাখা ভালো।

সাধারণত সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষের জীবন, সমাজের নীচু শ্রেণীর মানুষের কাছে কৌতূহলের বিষয়। তারা সমাজের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তাই তাদের সাক্ষাৎকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করে প্রতিবেদক। এ ছাড়া অন্যরা যে সাক্ষাৎকারদাতা হন না এমন নয়। পথের ভিখারি অনেক সময় সাক্ষাৎদাতা হতে পারেন। তবে তাদের সাক্ষাৎকার কদাচিত প্রতিবেদক গ্রহণ করে থাকেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের নীতি

১। সাক্ষাৎকার গ্রহীতাকে নির্বাচিত সময়ে উপস্থিতির ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। এ ছাড়া সাক্ষাৎকার পর্বটি যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় সে দিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

২। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার সময় সম্বোধন পরোক্ষ হওয়া উচিত। প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে না যেয়ে সাধারণ কিছু প্রশ্ন করা উচিত।

৩। সাক্ষাৎকার গ্রহীতাকে মনে রাখতে হবে যে, তিনিই প্রশ্নকর্তা। সাক্ষাৎকারদাতা যেন কোনওক্রমেই তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারেন সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। তবে তিনি উত্তরদাতাকে নানা রকম তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

৪। সাক্ষাৎকার নেবার পরিবেশ হাল্কা রাখা উচিত। এটা নির্ভর করে সাক্ষাৎকার গ্রহীতার সপ্রতিভ বুদ্ধিমত্তা এবং রসবোধের উপর। গুরুগম্ভীর পরিবেশে সাক্ষাৎকারদাতা কথা বলার ব্যাপারে সংযমী ও গম্ভীর হয়ে পড়তে পারেন। লঘু পরিবেশে সাক্ষাৎকারদাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে স্বস্তিবোধ করেন।

৫। সাক্ষাৎকার গ্রহীতার আচরণ, পোশাক এমন হওয়া উচিত নয় যা সাক্ষাৎকার দাতার মধ্যে বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে।

৬। এমন প্রশ্ন করতে হবে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাঙ্ক্ষিত তথ্য বের করে আনতে সক্ষম হবে।

৭। সাক্ষাৎকার দাতাকে আহত বা অপ্রস্তুত করতে পারে এমন ধরনের একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮। হ্যাঁ বা না বোধক প্রশ্ন যতোটা সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে।

৯। উত্তর প্রাসঙ্গিক নয় অথচ সাক্ষাৎকারদাতা সময়ের প্রতি লক্ষ না রেখে ক্রমাগত বলেই চলেছেন এমন ক্ষেত্রে তাকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে তাকে কৌশলে খুব ভদ্রভাবে থামাতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক উত্তরদানে প্রভাবিত করতে হবে।

১০। প্রতিটি প্রশ্নই হবে প্রাসঙ্গিক ও চ্যালেঞ্জিং।

১১। প্রতিক্রিয়ামূলক প্রশ্ন করে সাক্ষাৎকারটি এগিয়ে নিয়ে যান। এমন প্রশ্ন হতে পারে—তারপর কী হল? আপনি কী করলেন?

১২। দরকারি কাগজপত্র চেয়ে নিন। খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন চ্যালেঞ্জ করার মতো না শোনায়। কৌতূহল দেখানোর মতো চাইতে হবে।

১৩। বম্ব প্রশ্ন। প্রতিবেদকের জানা প্রয়োজন, কিন্তু সাক্ষাৎকারদাতার জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই প্রশ্নকে বম্ব প্রশ্ন বলে। ভালো ফল পেতে হলে প্রতিবেদককে অত্যন্ত ভদ্রতা ও সাবধানতার সাথে প্রশ্নটি করতে হবে। এ সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আগে অনুমতি নেওয়া ভালো। সব ক্ষেত্রে একবারেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। এ জন্য একটু অপেক্ষা করা ভালো অথবা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পুনরায় আবার প্রশ্ন করা যেতে পারে।

১৪। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বম্ব প্রশ্ন সাক্ষাৎকারের পরিবেশ নষ্ট করে দেয়। আলোচনা আর এগোতে চায় না। তাই সাক্ষাৎকার গ্রহীতাকে সুকৌশলে সাধারণ কথার মাধ্যমে এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হয়।

১৫। OFF THE RECORD বলে সাংবাদিকতায় একটা কথা প্রচলিত আছে। এর মানে হল যে কথাটি আমি তোমাকে বললাম, সে কথাটি তুমি প্রচার করবে না বা আমার নামে উদ্ধৃতি দেবে না। সাক্ষাৎকার নেবার সময় সাক্ষাৎকারদাতা যদি OFF THE RECORD বলে কিছু বলেন তাহলে তার নোট নেওয়া যাবে না বা টেড রেকর্ডার ব্যবহার করা যাবে না বা ক্যামেরা ব্যবহার করা যাবে না।

১৬। এমন কোনও প্রশ্ন সরাসরি করা উচিত নয় যা সাক্ষাৎকারদাতাকে আহত, উত্তেজিত বা রাগান্বিত করতে পারে।

১৭। ভালো বোঝাপড়ার জন্য মনোযোগ দিয়ে শোনা জরুরি। সফল সাক্ষাৎকারের জন্য তা কখনও কখনও প্রশ্নের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

১৮। সাক্ষাৎকারদাতার কাছ থেকে সুচিন্তিত উত্তর পেতে হলে তাকে চিন্তা করার সময় দিতে হবে। তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই।

১৯। প্রয়োজন হলে গুরুত্বপূর্ণ উত্তরগুলো নোট বুকে লিখে রাখতে হবে।

২০। সাক্ষাৎকারদাতার অনুমতি সাপেক্ষে টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করা যেতে পারে।

২১। সাক্ষাৎকার নেবার সময় জবাবদিহিকালে সব সময় ভদ্রতা, সুচারু রসবোধ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বজায় রাখতে হবে।

সাক্ষাৎকারের ধরন

ইন্টারভিউ মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে ঃ

(১) Factual News interview (অভিমত সাক্ষাৎকার)

(২) The personality interview (ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার)

(১) Factual News interview ঃ পত্র-পত্রিকায় কিছু খবর প্রায়ই আসে। যেমন—নারী নির্যাতন, শিশু শ্রম ইত্যাদি। যারা এই ব্যাপারে জড়িত অর্থাৎ এর পক্ষে বা বিপক্ষে রয়েছেন তাদের মতামত নিয়ে এই ধরনের সাক্ষাৎকার তৈরি করা হয়। এখানে সময়ানুগতার ব্যাপারটি রয়েছে। অর্থাৎ সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। যেমন—ডাক্তার কোনও নতুন ধরনের অপারেশন করলে সেটা ভালো না মন্দ বা Factual News interview -এর মাধ্যমে জানা যায়। নারী নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি কোনও ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এই ধরনের সাক্ষাৎকারকে Opinion News interview বলে। এখানে সাংবাদিকের পরিশ্রম বেশি হয়। এখানে অনুসন্ধানের কাজটি বেশি করতে হয়। কেননা নারী নির্যাতন সম্পর্কে কোনও রাজনীতিবিদ বা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব কোনও বক্তব্য রাখলে তিনি সঠিক বক্তব্য রাখছেন কিনা অর্থাৎ তিনি সত্যি নারী নির্যাতনের পক্ষে বা বিপক্ষে কিনা সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে হবে।

(২) Personality interview সাংবাদিকতার একটি সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় অবদান হচ্ছে ব্যক্তি সাক্ষাৎকার। মানুষ মানুষকে জানতে চায়–তাই এটা করা হয়। ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকারে হাজারো তথ্যের ভেতর থেকে আকাঙ্ক্ষিত চিত্রটি বের করে আনা হয়। সাধারণ মানুষের প্রবল আকর্ষণ থাকে খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের প্রতি। কিন্তু সবার পক্ষেই সম্ভব নয় তাঁদের সান্নিধ্য লাভ এবং সরাসরি যোগাযোগ। সাংবাদিক এখানে সাধারণ মানুষের দূত হয়ে সেই কাজটি করে দেন। সাংবাদিক যে বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সেই ব্যক্তিরই বলা বাক্যে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। যার ফলে পাঠক ঐ ব্যক্তির সাথে সরাসরি যোগাযোগ করছে বা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করছে এমনটি অনুভব করতে পারেন। এখানে সাংবাদিকের বেশ কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। তবে সময়ানুগতার ব্যাপারটি এখানে নেই। এখানে যার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে তাঁর ব্যক্তিত্ব নিবন্ধের শুরুতে বর্ণনা করতে হয়। এই ধরনের সাক্ষাৎকারে সাদামাটা বর্ণনা বর্জন করতে হয়। মানুষের মেজাজ মনোভাব সম্পর্কে জানা থাকলে এ ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সুবিধাজনক হয়।

এ ধরনের সাক্ষাৎকার বিবরণী একটি ফিচারের অবয়ব ধারণ করে। ফলে একে ফিচার সাক্ষাৎকারও বলা যায়। অন্যান্য সাক্ষাৎকারের চেয়ে এটি পড়তে ভালো লাগে। কারণ গৎবাঁধা কোনও কিছু নয়, পদ্ধতিমাফিক নয় বরং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতেই এর অবয়ব গড়ে ওঠে। এজন্য রিপোর্টারের নিজস্ব ভাণ্ডার থেকেও প্রচুর

মালমশলা যোগ করতে হয়। এই সাক্ষাৎকারে ব্যক্তির বক্তব্য তার বক্তব্যের কারণে রঞ্জিত হবে কিন্তু অতিরঞ্জিত হবে না।

এ ছাড়া উপস্থাপনা, বাচনভঙ্গি, প্রশ্নোত্তর শৈলী, বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে আমরা সাক্ষাৎকারকে আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

সংবাদ সাক্ষাৎকার

সম্প্রতিকালে পরিবেশিত কোনও সংবাদের উপর ভিত্তি করে এই ধরনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য হল খবর বা তথ্য সংগ্রহ করা। এখানে ব্যক্তি মূল বিষয় নয়। সাক্ষাৎকার দাতা এখানে সংবাদ উৎস হিসাবে কাজ করেন। তিনি এখানে বিষয় সম্পর্কে যা বলেছেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতি, শিক্ষা, আর্থিক বিষয়, অপরাধ ও উদ্ভাবন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই ধরনের সাক্ষাৎকার বিস্তৃত। যেমন—কোনও নতুন ওষুধ বাজারে এসেছে। এটা কিসের ওষুধ, কোন প্রতিষ্ঠান এর পেছনে আছে, এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা, এই ওষুধের পেছনে কী পরিমান অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে—রিপোর্টার এ তথ্যগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন।

সংবাদ সাক্ষাৎকারের তিনটি বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সাক্ষাৎকারের বিষয়টি কোনও চলতি সংবাদঘটনা থেকে উদ্ভূত হতে হবে।

২। সাক্ষাৎকারের উৎস সম্পর্কে শ্রোতা, দর্শক, পাঠকের আস্থা থাকতে হবে।

৩। বিষয়টি সম্পর্কে জনাসাধারণের যে সাধারণ জ্ঞান বা জানাশোনা আছে, তার সঙ্গে আরও কিছু যুক্ত হবে এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। বিষয়টি সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যনির্ভর গল্পটিকে সাক্ষাৎকারটি আরও গভীরতা দেবে, ব্যাখ্যা করবে, বর্ধিত কলেবর দেবে।

সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকার

এটা হচ্ছে কোনও একটি বিষয়ের উপর একাধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার। এখানে সবগুলো সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর মূল সুরটি তুলে ধরা হয়।

এই সাক্ষাৎকারের ধারা অনুযায়ী বিপোর্টার শুধু এক দুজন বা কয়েকজন হাতেগোনা সূত্রের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন না বরং তিনি এক ডজন থেকে শুরু করে একশ পর্যন্ত সূত্রের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেন। সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত বিষয়টি সবসময়েই চলতি কোনও ঘটনা বা ঘটনাবলির উপর ভিত্তি করেই হয়। এই সংবাদ ঘটনাটির এতখানি প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকবে যে রাস্তাঘাটে মানুষ তা নিয়ে আলোচনা করবে। এখানে সাক্ষাৎকারদাতা অনির্ধারিত সাধারণ মানুষ।

দলগত সাক্ষাৎকার/গোষ্ঠী সাক্ষাৎকার

এটা অনেকটা সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকারের মতো। এখানে কোনও গোষ্ঠি বা দলের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় যেমন– আদমজী পাটকলে কোনও কারণে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করলে সেখানকার কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক ইত্যাদি বেশ অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়ে এই ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

সংবাদ সম্মেলন

সংবাদ সম্মেলন বা প্রেস কনফারেন্স গোষ্ঠী বা সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকারের মতোই। তবে গোষ্ঠী বা সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকারের প্রশ্নকর্তাদের পক্ষ থেকে যেমন প্রায় একই ধরনের করা হয় এখানে ঠিক তা হয় না। এখানে একদল সমবেত সাংবাদিক কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে (অনেক সময় তার সাথে সহযোগীরা থাকেন) বিভিন্ন প্রশ্ন করে তার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য পেয়ে থাকেন। ফলে প্রশ্নের কোনও সাদৃশ্য থাকে না। যে বিষয়ে ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করে থাকুক না কেন, দেখা যায় একেক গণমাধ্যমের একেক সংবাদিকের বিপরীতধর্মী প্রশ্ন করার কারণে তার জবাবটাও অনেকসময় অপ্রত্যাশিত ধরনের হয়ে থাকে। আবার উত্তরদাতা ব্যক্তির সহকারীরাও মাঝে মাঝে এমন কিছু কথা বলে থাকেন যা অনেক তথ্যের জন্ম দেয়।

সংবাদ সম্মেলন সাধারণত দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাই ডেকে থাকেন। অবশ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কোনও সংস্থার পক্ষ থেকে এ ধরনের সংবাদ সম্মেলনের আহ্বান করা হয়ে থাকে। থিওডোর রুজভেল্ট হচ্ছেন প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি সংবাদ সম্মেলনকে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ ধরনের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্টগণ সে দেশের সাংবাদিকদের জন্য বড় ধরনের সংবাদ উৎসে পরিণত হন।

টেলিভিশন প্রচলনের পর সংবাদ সম্মেলনে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সংবাদ সচিব জেমস হ্যাগারটি সংবাদ সম্মেলনে টেপ রেকর্ডিং-এর ও সাউন্ড মোশন পিকচার গ্রহণের অনুমতি দেন। সংবাদ সম্মেলনকে আরও এক ডিগ্রি সরেস করে তুলেছিলেন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি। তিনি সংবাদ সম্মেলন টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেন। কেনেডি ও তার পূর্বসূরীদের সূচিত সংবাদ সম্মেলন ব্যবস্থা আজ চিত্রতারকা থেকে শুরু করে ফুটবল-ক্রিকেট তারকাসহ বিভিন্ন নামীদামি ব্যক্তিই কাজে লাগাচ্ছেন।

অনুসন্ধানমূলক সাক্ষাৎকার

জনমত যাচাই বা জরিপের জন্য এই ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্ন বা প্রশ্নমালা তৈরি করে কোনও একটি এলাকায় ঢালাওভাবে বাছাইকৃত কিছু লোকের মতামত সংগ্রহ করা হয়।

টেলিফোনে সাক্ষাৎকার

তথ্য সংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে টেলিফোন। একজন রিপোর্টার টেলিফোনের মাধ্যমে তার উৎসের কাছে পৌছাতে পারলেন কিনা, কিংবা কতখানি পৌছাতে পারলেন, উৎস কোনও প্রতিষ্ঠানের লোক হলে সে প্রতিষ্ঠানের অপারেটরের কাছ থেকে কি রকম সাড়া পেলেন তা মূল্যায়ন করতে হবে। টেলিফোনে প্রথমেই প্রশ্ন না করে নিজের পরিচয় দেয়া উচিত। রিপোর্টারকে নিশ্চিত হতে হবে সঠিক ব্যক্তির সাথে তিনি কথা বলছেন কী না। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে কিছুটা বিরতি দিলে চলে, কিন্তু টেলিফোনে কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিলে কথার খেই হারিয়ে যায়। অর্থাৎ কথোপকথনের গতিটা সাবলীল হতে হবে।

টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার

টেলিভিশনে খবরে দুই ধরনের সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা হয়। রিপোর্টের প্রয়োজনে এবং স্টুডিও আলোচনা। রিপোর্টে ব্যবহৃত সাক্ষাৎকার দুই ধরনের হয় ঃ

১। ঘটনা বা প্রতিবেদনের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার বা বক্তব্যের সুনির্বাচিত অংশ (Sound Bite Sync)। একে talking head ও বলে। সাক্ষাৎকার নেয়ার উদ্দেশ্য প্রধানত দুটি। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু বা ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য নেয়া। ঘটনা বা বিষয় সংশ্লিষ্ট কোনও অভিযোগ থাকলে, অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত দুজনের বক্তব্যই নিতে হবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হল, প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণ, অভিমত, উপদেশ নেয়া।

২। সাধারণ মানুষের কথা বা বক্তব্য, ইংরেজিতে বলে Vox pop. এটা ল্যাটিন শব্দ Vox populi-র সংক্ষিপ্ত রূপ, যার মানে Voice of the people বা জনগণের কথা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বয়স ও পেশার লোকজনকে বিপোর্টের বিষয় সংশ্লিষ্ট একটি সাধারণ প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, যা থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত বা একই মত পাওয়া যায়।

টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে আরও যা কিছু প্রয়োজনীয়

প্রতিবেদনে সাক্ষাৎকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি ব্যবহারের আগে সম্ভব হলে সাক্ষাৎকারদাতাকে পরিচিত করে নেওয়াই রেওয়াজ। পরিচিতিমূলক কয়েকটি শট দিয়ে তা করা হয়, যাকে বলা হয় Set up shots. সাক্ষাৎকারদাতা কাজ করছেন অথবা প্রতিবেদনের সাথে কথা বলেছেন এমন কয়েকটি শট set up shot হিসেবে নেয়া যেতে পারে। তবে Set up shots অবশ্যই নিতে হবে। তা ব্যবহার করা হোক বা না হোক।

সাক্ষাৎকারের যে কথাগুলো ব্যবহার করা হবে তা সাক্ষাৎকারদাতা একেবারে নাও বলতে পারেন। সে ক্ষেত্রে দুটি বা তিনটি জায়গা থেকে কথা কেটে কেটে জোড়া দিতে হতে পারে। এসব জোড়া লুকানোর জন্য Cutaways বা Insert shot অবশ্যই নিতে হবে। Cutaway বা Insert হল বিষয়বস্তুর বর্ণনা করা বা অভিনবত্ব আনার জন্য মূল ছবির মধ্যে অন্য কোনও কিছুর শট। অনেক সময় Continuity সমস্যা ঢাকতে বা একটি শট থেকে দৃষ্টিনন্দনভাবে আরেক শটে যাওয়ার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়।

Cutaway-র বিকল্প হিসেবে প্রতিবেদকের মাথা ঝাঁকানো বা Noddy ব্যবহার করা যেতে পারে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী মাথা নাড়ছেন, আগ্রহ নিয়ে আছেন মৃদু হাসছেন এমন শটকে Noddy বলে। তবে কোনও বিতর্কিত বিষয়ে সাক্ষাৎকার নিতে হলে 'সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাক্ষাৎকারদাতার সাথে একমত হচ্ছেন বলে মনে হয়' এমন মাথা নাড়ানোর শট ব্যবহার করা উচিত নয়।

লোকজনের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে ক্যামেরায় কথা বলা। আগে থেকে সাক্ষাৎকারদাতাকে বলে দিতে হবে তিনি যেন রিপোর্টারের সাথে কথা বলেন। সাক্ষাৎকারদাতার কথা রিপোর্টের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাবে। সাক্ষাৎকারদাতা এখানে জাতির উদ্দেশ্যে কথা বলছেন না, বলছেন রিপোর্টারের সাথে।

সাক্ষাৎকার নেবার সময় একই সমতলে বসতে হবে। এতে করে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও সাক্ষাৎকারদাতার Eye line ঠিক থাকবে।

Aston ব্যবহারের জন্য সাক্ষাৎকারদাতার নামের বানান, পদবি তার কাছ থেকে সঠিকভাবে জেনে নিতে হবে। Aston হচ্ছে ছবিতে নাম বা ক্যাপশন দেয়ার জন্য Aston কোম্পানির এক ধরনের অক্ষর তৈরির যন্ত্র। সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকারদাতার নাম উল্লেখ বা অনুষ্ঠান শেষে এডিট লাইন তৈরির জন্য এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এখন অবশ্য পর্দায় যে কোনও লেখাকেই Aston বলে।

দুর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহতের আপনজনদের সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। কথা বলতে অপারগ হলে তাদের বক্তব্য নেয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। শোকে পাথর হয়ে যাওয়া কেউ হলে, কোনও স্মৃতি চারণে উদ্বুদ্ধ করে তার

কান্না বের করে আনার চেষ্টা করুন। এসব ক্ষেত্রে তাদের আরও আহত করে এমন কোনও প্রশ্ন করতে যাবেন না। জেরা তো নয়ই।

কখনও প্রয়োজন হলে আরেক ধরনের সাক্ষাৎকার কৌশল ব্যবহার করা হয়। একে বলা হয় Door stoping. কোনও ঘটনায় অভিযুক্ত, অপরাধের সাথে জড়িত কিংবা তারকা, যাদের সহজে appointment পাওয়া যায় না, তাদের বক্তব্য নেয়ার জন্য বাধ্য হয়ে তাদের বাসার দরোজায় অপেক্ষা করে বাইরে বের হওয়া বা ফেরার সময় ধরে বক্তব্য নেয়াই Door stoping. কখনও কখনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বৈঠক থেকে বের হয়ে আসার সময় দরোজার সামনে গতিরোধ করে বক্তব্য নিতে হয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় সাক্ষাৎকার যেহেতু সাংবাদিকতার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্ষেত্র তাই সাক্ষাৎকার নেবার সময় ও পরবর্তীতে পত্রিকায় প্রতিবেদনটি প্রকাশের অথবা বেতার বা টেলিভিশনে প্রচারের সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে এটা পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের কৌতূহল মেটাতে সমর্থ হয় এবং এর প্রতি মানুষের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করে।

[তথ্য সূত্র : 'সাংবাদিকতা'— সম্পাদনা, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, 'রিপোর্টিং,—সুধাংশু শেখর রায় এবং 'টেলিভিশন সাংবাদিকতা'—নয়ীম তারিক।]

বেতার নাটক রচনা, প্রযোজনা ও নির্দেশনা

আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে বিনোদনের অন্যতম বিষয় বেতার নাটক যাকে আমরা বলতে পারি শ্রব কাব্য। শুধুমাত্র শ্রবণের মাধ্যমেই যার সম্পূর্ণ রসাস্বাদন, অনুধাবন ও পরিতৃপ্তি পাওয়া সম্ভব। বেতার হচ্ছে শব্দ নির্ভর বা ধ্বনি মাধ্যম। তাই শব্দ নির্ভর বেতারে বেতার নাটকে থাকে চাতুর্যময় বুদ্ধিদীপ্ত শব্দের খেলা, সংলাপের খেলা, রহস্যময়তা, আবেগ-উৎকণ্ঠা, দ্বন্দ্ব, ঘাত-প্রতিঘাতের খেলা। বেতার নাটকে সব কিছুর প্রকাশ শব্দে। শ্রোতা সেই শব্দকে গ্রহণ করে দৃশ্যকে নিজেই কল্পনা করে নেয়। সুতরাং এই ধ্বনি মাধ্যমে বেতার নাটক প্রযোজনা করতে নাট্য প্রযোজক বা নির্দেশকের যে সকল গুণাবলী ও দক্ষতার প্রয়োজন তা হচ্ছে,

১। **বেতার মাধ্যম সম্পর্কে জ্ঞান**
যে মাধ্যমে প্রযোজক কাজ করবেন সেই মাধ্যমের প্রকৃতি ও কর্মধারা সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

২। **নাটক সম্পর্কে জ্ঞান**
মঞ্চ নাটক, টেলিভিশন নাটক এবং বেতার নাটকের পার্থক্য, উপস্থাপনা কৌশল ও আঙ্গিক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। নিজে নাটক রচনার দক্ষতা প্রযোজকের জন্য একটি প্লাস পয়েন্ট।

৩। **অভিনয় জ্ঞান**
মঞ্চ নাটক, টেলিভিশন নাটক এবং চলচ্চিত্র ছাড়াও বেতার নাটকে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা।

৪। **শিল্পীদের কণ্ঠস্বরের গুণগতমান, বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য সম্পর্কে জ্ঞান**
বেতার নাটকের জন্য তালিকাভুক্ত কোন শিল্পীর কণ্ঠস্বর কোন ধরনের এবং কোন ধরনের চরিত্র উপযোগী সে বিষয়ে প্রযোজককে অবহিত থাকতে হবে।

৫। **সংগীত সম্পর্কে জ্ঞান**
সংগীত বিশারদ হবার প্রয়োজন নেই। নাটকের ঘটনা, পরিবেশ পরিস্থিতি ও মুড অনুযায়ী আবহ সংগীতের উপযুক্ত নির্বাচন ও সংযোজনের জন্যেই সংগীত সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

৬। **কারিগরী দক্ষতা**

স্টুডিও, মাইক্রোফোনের ব্যবহার, প্যানেল অপারেশন, রেকর্ডিং সম্পর্কে প্রযোজককে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে।

৭। **ব্যক্তিত্ব ঃ**

শিল্পী ও নাট্যকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার জন্যেই প্রযোজকের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব থাকা প্রয়োজন।

প্রাথমিক পূর্ব প্রস্তুতি ঃ পাণ্ডুলিপি নির্বাচন

প্রযোজক যে নাটকটি প্রযোজনা করবেন তা নির্বাচনের আগে তাকে পাণ্ডুলিপিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়তে হবে। পরীক্ষা করে দেখতে হবে—

১। নাটকটি বেতার মাধ্যমের উপযোগী করে রচিত হয়েছে কী ?

২। নাটকটিতে একটি সহজ সরল গল্প আছে কী?

৩। নাটকটিতে মানবিক আকর্ষণ (হিউম্যান ইন্টারেস্ট) আছে কী?

৪। যে ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে তা কতটুকু বাস্তবসম্মত এবং শিল্পসম্মত?

৫। নাটকে অভাবিত চমক, উত্তেজনা, সংঘাত এবং যুক্তিযুক্ত পরিণতি আছে কী?

৬। নাটকের মূল চরিত্রগুলোর নাম পরিচয় এবং তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে কী?

৭। সম্পৃক্ত চরিত্রগুলোর শ্রেণীস্তর কী?

৮। চরিত্রগুলোর মূল্যবোধ, জীবনধারা কী?

৯। গল্পের পরিণতির সঙ্গে তাদের পরিণতি কী?

১০। চরিত্রগুলোর সংলাপ কী চরিত্রানুগ? স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক?

এসব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে বেতার নাটকের জন্য প্রয়োজন ঃ

(ক) শুধুমাত্র শব্দ মাধ্যমের উপযোগী ভালোভাবে বর্ণিত একটি সহজ সরল গল্প। গল্পের কোনও সাব প্লট বা শাখা প্রশাখার প্রয়োজন নেই।

(খ) শক্তিশালী চারিত্রিক গুণাবলীসহ কোনও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গল্পটি নির্মিত হবে।

(গ) গল্পে থাকবে মানবিক আকর্ষণ, সহজ সরল চরিত্রানুগ সংলাপ যা গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, চরিত্র নির্মাণে, দৃশ্য নির্মাণে সহায়তা করবে।

(ঘ) গল্পে উপস্থাপিত, বর্ণিত চরিত্র সমূহের পরিচয় হবে সুস্পষ্ট।

(ঙ) গল্পে থাকবে অভাবিত চমক, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, আবেগ, উত্তেজনা, রহস্যময়তা, মানবিক অথবা নৈতিক দ্বন্দ্ব। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবে যুক্তি সংগত গতি (লজিকাল মুভমেন্ট)।

পাণ্ডুলিপিতে বর্জনীয় বিষয়

(ক) এখানে সুস্পষ্ট ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে বেতার প্রচার নীতিমালার পরিপন্থী অথবা বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে অবাঞ্ছিত তিক্ত বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনও বিষয়, চরিত্র, ঘটনা বা সংলাপ বেতার নাটকে ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। নাটকে এমন কোনও বিষয়ের অবতারণা করা উচিত নয় যা কোনও জনগোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে, তাদের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ভীতি সৃষ্টি করতে পারে, পরস্পরের মধ্যে সংঘাত, ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হবার জন্যে উস্কানি প্রদান করতে পারে। এছাড়া সমাজের কোনও স্তরের শ্রমজীবি মানুষের সৎ পেশার প্রতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কটাক্ষ, কারো শারীরিক বৈকল্য নিয়ে উপহাস বেতার প্রচার নীতিমালার পরিপন্থী।

(খ) এছাড়া নাটকের চরিত্রগুলোর শ্রেণীস্তর সামাজিক ও পারিবারিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংলাপ হবে চলতি বা কথ্যভাষায়। চলতি বা গ্রাম্য ভাষা ব্যবহারে পরিচ্ছন্নতা, সরলতা এবং সুরুচি বজায় রাখতে হবে। নাটকে কাহিনী ও চরিত্রের প্রয়োজনে সংলাপ আঞ্চলিক ভাষায় হতে পারে, সাধু অথবা বিশুদ্ধ কথ্যরীতিতে হতে পারে, কাব্যিক ভাষায় হতে পারে। তবে এমন সংলাপ বা ভাষা ব্যবহার উচিত নয় যাতে শরীরী কুরুচি প্রকাশ পায় বা অশ্লীল গ্রাম্যতার প্রকাশ ঘটে।

বেতার নাটকের চাহিদা ও ফরমুলা অনুযায়ী উপযুক্ত মানসম্পন্ন, শিল্পসম্মত নাটক নাট্যকাররা লিখবেন এমন আশা সব সময় করা যায় না বা তা পাওয়াও সম্ভব হয় না। যে নাটকটি প্রচারের জন্য চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে তা হয়তো আংশিকভাবে মানসম্পন্ন হতে পারে এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নাটকটির ঘটনা ও চরিত্রে কোথাও যদি কোনও অপূর্ণতা অথবা বিতর্কের আশংকা থাকে, কোথাও কোনও কম্যুনিকেশন গ্যাপ বা সংশয় সৃষ্টি হবার অবকাশ থাকে তবে তা সংশোধন করে প্রচার উপযোগী করে নেওয়া যেতে পারে। তবে সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য প্রযোজকের উচিত এবিষয়ে নাট্যকারের সাথে আলোচনা করা, নাটকটির গুণাগুণ এবং দোষত্রুটি সম্পর্কে যুক্তি দ্বারা নাট্যকারকে কনভিন্স্ করা এবং নাট্যকারের সাহায্যেই পাণ্ডুলিপি পরিমার্জন করা। নাট্যকারের পরিমার্জন যদি প্রযোজকের মনপুতঃ না হয় তবে সেক্ষেত্রে প্রযোজক সুকৌশলে নাট্যকারের আস্থা ও সম্মতি নিয়ে নিজে পাণ্ডুলিপি পরিমার্জন করতে পারেন। তবে এই পরিমার্জন অবশ্যই নাট্যকারের চাইতে উৎকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ শিল্পী নির্বাচন

নাটকের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত নির্বাচনের পর শুরু হয় নাটকের চরিত্র অনুযায়ী শিল্পী নির্বাচন। বেতার নাটক চোখে দেখার ব্যাপার নয়। এটি কানে শোনার বিষয়।

এখানে শিল্পীদের দৈহিক সৌন্দর্যের চেয়ে কণ্ঠ সম্পদই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তাই অভিনেতা অভিনেত্রীদের কণ্ঠস্বর, বাচন ভঙ্গি ও নাটকের চরিত্রের আচরণ ও মেজাজের সঙ্গে প্রধান চরিত্রগুলোর সঙ্গে অপ্রধান চরিত্রগুলোর পার্থক্য হবে তাদের মেজাজ, বাচন ভঙ্গিতে ও কণ্ঠস্বরে। এই তিনটি গুণের কারণেই শ্রোতারা সহজেই প্রধান চরিত্রগুলোকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে। নাটক শুনতে শুনতে শ্রোতারা সহজেই অনুমান করে নেবে এই চরিত্রের মানুষটি রোগা, এই চরিত্রের মানুষটি মোটা, এই চরিত্রের মানুষটি সুন্দর, এই চরিত্রের মানুষটি মহৎ, এই চরিত্রের মানুষটি খল, কুৎসিৎ। সুতরাং নাটকের কাহিনী ও চরিত্র অনুযায়ী শিল্পী নির্বাচনে প্রযোজকের দূরদর্শিতা ও সঠিকভাবে বাছাই করবার ক্ষমতা প্রয়োজন।

তৃতীয় পর্ব ঃ মহড়া

বেতার শিল্পীদের উপযুক্ত মহড়া এবং মহড়াকালীন প্রযোজনা সংক্রান্ত পরিকল্পনার উপর বেতার নাটকের সাফল্য অনেকটা নির্ভরশীল। বেতার নাটকে সাধারণতঃ তিনদিন মহড়া দেওয়া হয়। অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত সকল শিল্পী নির্দিষ্ট সময়ে মহড়ায় আসছেন কি না, প্রদত্ত চরিত্রকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করার জন্য শিল্পীরা অভিনয়ের ব্যাপারে আন্তরিকতা ও আগ্রহ প্রকাশ করছেন কি না, তাদের সংলাপ প্রক্ষেপণ যথাযথ হচ্ছে কি না, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গিতে কোনও ত্রুটি আছে কি না এ সকল বিষয়ে প্রযোজকের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন নাটকের বক্তব্য ও আবেগকে শিল্পীদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া, নাটকের প্রতিটি চরিত্রের আচরণ, মেজাজ অনুযায়ী শিল্পীদের কাছ থেকে অভিনয় আদায় করে নেওয়া। মহড়াকালে প্রযোজকের উচিত ভালো অভিনয়ের জন্য শিল্পীদের উৎসাহিত করা, ধন্যবাদ জানানো এবং সকলের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। এখানেই প্রয়োজন প্রযোজকের ব্যক্তিত্ব, শিল্পী ও সংশ্লিষ্ট নাট্যকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। তবে নিয়ন্ত্রণের নামে প্রযোজক কখনই কোনও শিল্পীর সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবেন না বা অশোভন ভাবে শিল্পীর ত্রুটি বা অক্ষমতাকে অন্যদের সামনে তুলে ধরে তাকে হেয় করার চেষ্টা করবেন না। এছাড়া প্রযোজক কখনই কোনও শিল্পীকে প্রযোজকের নির্দেশানুযায়ী অন্ধ অনুকরণের জন্য চাপ প্রয়োগ করবেন না। চরিত্রটি বুঝিয়ে দিয়ে শিল্পীকে তার নিজস্ব ভঙ্গি ও ক্ষমতার মধ্যেই চরিত্রানুগ অভিনয় আদায়ের জন্য যত্ন সহকারে বার বার শিল্পীকে উৎসাহিত করবেন। এজন্য তাকে হতে হবে সহনশীল। শিল্পীদের প্রতি তার আচরণ হবে বন্ধুসুলভ এবং কৌশলী। মহড়াকালে প্রযোজককে অভিনয় ছাড়াও নাটকের নির্ধারিত সময় সীমার প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। এক ঘণ্টা অথবা পঞ্চাশ মিনিটের দৈর্ঘ্য সীমার নাটকে শব্দ ও আবহ সংগীত ছাড়াই শুধুমাত্র সংলাপের জন্য কতটুকু সময় প্রয়োজন হবে তার হিসাব নিকাশ মহড়াকালেই সম্পন্ন করতে হবে। নাটকের মহড়া দিবসগুলোর মধ্যেই নাটকের সূচনা সংগীত, দৃশ্য পরিবর্তন সূচক সংগীত, মুড অনুযায়ী আবহ সংগীত কী

হবে, কোন দৃশ্যে কোন ধরনের সাউন্ড এফেক্ট বা শব্দ সংযোজন করতে হবে সে বিষয় চিন্তাভাবনা করে পাণ্ডুলিপির প্রতিটি দৃশ্যের বাম প্রান্তে চিহ্নিত করতে হবে। নাট্য প্রযোজক প্রয়োজন বোধে অভিজ্ঞ সংগীত পরিচালকের সঙ্গে আলোচনা করে টুকরো টুকরো আবহ সংগীত রেকর্ড করার ব্যবস্থা নিতে পারেন। তবে প্রতিটি বেতার কেন্দ্রেই নাটক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র মিউজিক অ্যান্ড সাউন্ড এফেক্ট লাইব্রেরি আছে। প্রযোজকগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঐ লাইব্রেরি থেকে আবহ সংগীত ও সাউন্ড এফেক্ট সংগ্রহ করে থাকেন। তবে প্রতিটি নাটকে একই ধরনের আবহ সংগীতের ব্যবহার আদৌ উচিত নয়। এছাড়া আবহ সংগীত ও সাউন্ড এফেক্ট সমূহের মান উৎকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন নাটকে শব্দ এবং আবহ সংগীতের ব্যবহার হবে পরিবেশ তৈরিতে, পারিপার্শ্বিক বর্ণময়তা বা দৃশ্যকল্পে রং তৈরিতে, গল্প বলাতে, চরিত্রগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টিতে এবং শ্রোতার কানকে সজাগ করতে। শব্দ এবং সংগীত শুধুমাত্র নাটকের গল্প বলাতে সাহায্য করে, মুড তৈরিতে সাহায্য করে কিন্তু গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে না। সেজন্যে নাটকে শব্দ ও সংগীতের ব্যবহারে পরিমিতিবোধ ও সচেতনতা থাকা দরকার। অধিকমাত্রায় কিংবা উচ্চমাত্রায় শব্দ, সংগীতের ব্যবহার নাটককে ব্যাহত করে এবং শ্রোতাদের মনোসংযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

বেতার নাটকে অনেক ক্ষেত্রে শব্দ বা সাউন্ড এফেক্ট ছাড়াই নীরবতা আরও বেশি কার্যকরী হতে পারে। "সাইলেন্স ক্যান বি মোর এক্সপ্রেসিভ দ্যান ওয়ার্ডস অর সাউন্ড এফেক্টস।"

মহড়ার তৃতীয় দিন হবে অভিনয়ের চূড়ান্ত মহড়া। স্টুডিওতে মাইক্রোফোনের সামনে কোন শিল্পী কী ভাবে অভিনয় করবেন, কতটুকু দূরত্ব থেকে সংলাপ প্রক্ষেপণ করবেন তা পর্যবেক্ষণের জন্যই মাইক্রোফেনের রিহার্সালের প্রয়োজন হয়। মাইক্রোফোন রিহার্সালের সময় প্যানেলে বসে প্রযোজককে শিল্পীদের কণ্ঠস্বরের ব্যালান্স করতে হয়। অভিনয়ে কারো কোনও ত্রুটি বা অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হলে তা শিল্পীদের অবহিত করতে হবে। মাইক্রোফোনে রিহার্সালের সময় প্রযোজককে নাটক প্রযোজনার কারিগরি বিষয়টি তার চিন্তাভাবনার মধ্যে রাখতে হয়। এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে যাবার পরবর্তী মুহূর্তটুকু পূর্ববর্তী দৃশ্যের আবহ সংগীতের রেশ আস্তে আস্তে ফেড আউট হবে। অথবা উভয় দৃশ্যের মেজাজ অনুযায়ী কোন ধরনের ইন্টারলড্ মিউজিক ব্যবহার করতে হবে অথবা চরিত্রের শেষ সংলাপ ক্রমশ ফেড আউট করতে হবে তা প্রতিটি দৃশ্যের মেজাজ ও গতি বুঝে নির্ধারণ করতে হয়।

পঞ্চম পর্ব ঃ রেকর্ডিং

নাটক রেকর্ডিং দিবসে নাট্য প্রযোজক নিজেকে সকল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখবেন। কেননা মহড়াকালেই প্রযোজনা সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হয়েছে। তাই দুশ্চিন্তাহীন মনে প্রযোজক এখন রেকর্ডিং এর জন্য প্রয়োজনীয়

সংখ্যক টেপ, স্টুডিও বরাদ্দ ব্যবস্থা, রেকর্ডিং এবং প্রযোজনা সহকারীদের দায়িত্ব ও উপস্থিতি চেক আপ করে নেবেন।

নির্ধারিত সময়ে রেকর্ডিং শুরু করবেন। প্রতিটি দৃশ্য রেকর্ডিং এর আগে শিল্পীদের কণ্ঠস্বর ব্যালান্সের জন্য একবার করে মাইক্রোফোনে রিহার্সাল দিয়ে নেবেন এবং তারপর রেকর্ডিং শুরু করবেন। রেকর্ডিং এর সময় তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় নানা ধরনের শব্দ সৃষ্টি করা যায়। এজন্য অ্যাকুয়িস্টিক সিস্টেমে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রযোজনা সহকারী বা সাউন্ড এফেক্টম্যান সহায়তা করে থাকেন। যে ধরনের সাউন্ড এফেক্ট স্টুডিওতে তাৎক্ষণিকভাবে সংযোজন করা সম্ভব হয় না তা পরে সাউন্ড লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করে সম্পাদনা কালে সংযোজন করা যায়। প্রযোজককে সচেতন থাকতে হবে নাটক রেকর্ডিং এর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করা। নাটক রেকর্ডিং কালে মাঝে মাঝে বা শেষ হবার পর রেকর্ডিং কোয়ালিটি পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত যাতে করে কোনও একটি ত্রুটি থাকলে সঙ্গে সঙ্গেই রি-রেকর্ডিং করা সম্ভব হয়।

ষষ্ঠ পর্ব ঃ সম্পাদনা

নাটকটি নির্ধারিত সময়ের দৈর্ঘ্য, আবহ সংগীত ও শব্দ সংযোজনের মাধ্যমে সুগ্রন্থিত করাই সম্পাদনার মূল উদ্দেশ্য। সম্পাদনাকালে নাটকের প্রযোজককে লক্ষ রাখতে হয় মাস্টার টেপে নাটকের কোনও অনাবশ্যক অংশ সংলাপ বা শব্দ আছে কী না বা সময়ের কারণে কোনও সংলাপ ছেঁটে দিতে হচ্ছে কী না। নাটককে সুশ্রাব্য করার জন্য সম্পাদনা একদিকে যেমন একটি দক্ষতার বিষয় অন্য দিকে একটি নান্দনিক বিষয়। কেননা সম্পাদনা কালেই নাটকটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সুশ্রাব্য করার প্রয়াসে প্রযোজককে তার কারিগরি দক্ষতার সাথে শৈল্পিক চিন্তাভাবনার সংমিশ্রণ ঘটাতে হয়।

বেতার নাটক

এতো গেল প্রযোজনার কথা। এবার আসা যাক বেতার নাটক রচনার বিষয়ে। গল্পতো নাট্যকারকেই চিন্তা করতে হবে তিনি কী বিষয় নিয়ে নাটক লিখবেন। আগেই উল্লেখ করেছি একটি বেতার নাটকে কী কী উপাদান থাকবে। ঐতিহাসিক, সামাজিক, বিয়োগান্ত, মিলনান্ত, হাস্যরস যে কোনও বিষয় নিয়ে নাট্যকার ভাবনা চিন্তা করতে পারেন। কাউকে বেতার নাটক লেখা শেখানো সম্ভব নয় যদি না তার বিভিন্ন মাধ্যমের নাটক সম্পর্কে গভীর আগ্রহ, পড়াশুনা এবং স্বচ্ছ ধারণা না থাকে। বেতার নাটক সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেবার জন্যেই এই গ্রন্থের শেষ পর্বে আমার প্রথম জীবনের লেখা "শেষ বিকেলের গান" নামে একটি সহজ সরল রোমান্টিক গল্পের বেতার নাটক মডেল হিসেবে পুনঃমুদ্রণ করা হল।

তৃতীয় অধ্যায়

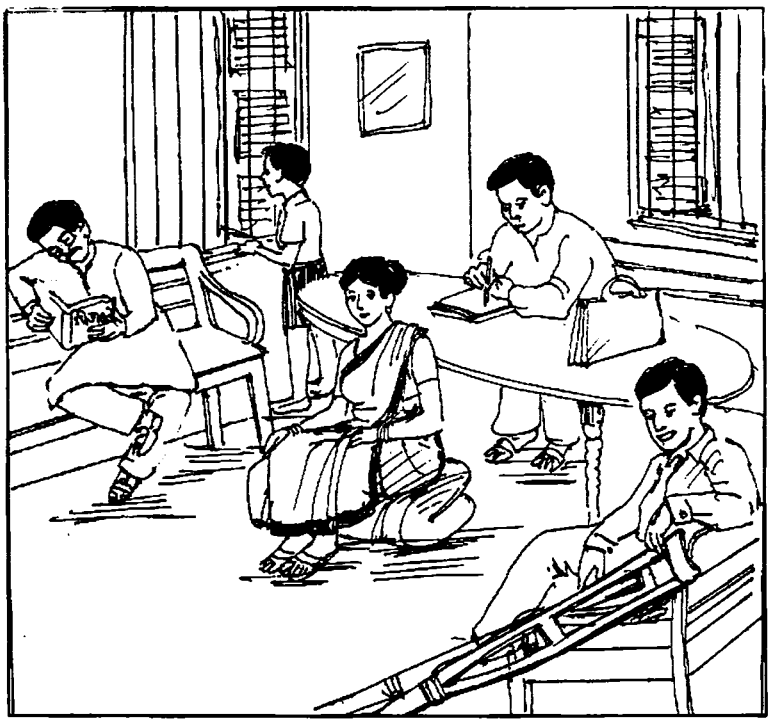

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ
প্রেমের বেদনা থাকে
সমস্ত জীবন।
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

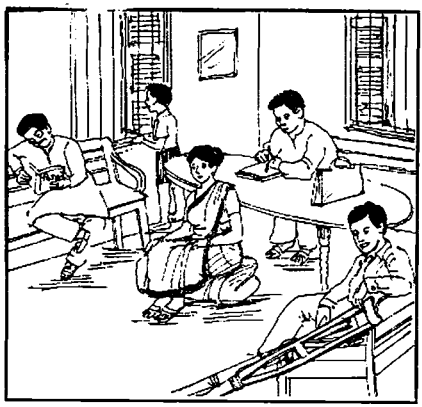

বেতার নাটক ঃ
শেষ বিকেলের গান

সময় রাত।

(কোনও এক মফস্বল শহরের স্টেশনের পরিবেশ ও কোলাহল। ক্র্যাচে ভর করে এক যুবকের এগিয়ে আসার শব্দ এসে থামে)

কুলি ঃ স্যার, টেরেন আওনের বহুত লেট। আপনার লাগেজ কি অহন ওয়েটিং রুমে রাখুম?

যুবক যাত্রী ঃ রাখো। তবে ট্রেন এলে আমাকে ফেলে লাগেজ নিয়ে হাওয়া হয়ে যেওনা। দেখতেই তো পাচ্ছ আমি ল্যাংড়া খোড়া মানুষ।

কুলি ঃ তওবা তওবা। এই কথা কওনের আগে আপনের কেরাচ দিয়া আমার মাথায় একখান...

যুবক যাত্রী ঃ (বাধা দিয়ে) মাল বওয়ার জন্যে তোমার মাথাটা এখন আস্তই থাক। ট্রেন এলে আমাকে একটু রয়ে সয়ে তুলে দিয়ো।

চা ওয়ালা ঃ (দূর থেকে এগিয়ে আসে) চা দেব স্যার গরম চা?

যুবক যাত্রী ঃ (বিরক্তিতে চিৎকার করে ওঠে) না। (ক্র্যাচে চলার শব্দ. ওয়েটিং রুমে এসে চেয়ার টেনে বসার শব্দ হয়।)

(আশরাফ আলী নামে একজন যাত্রী প্রবেশ করেন গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে)

"জানি, জানি হল যাবার আয়োজন....তবু পথিক, থামো থামো কিছুক্ষণ।"

ট্রেন তো লেট মনে হচ্ছে। (ক্র্যাচধারী যুবককে দেখে) এই যে ভাই ট্রেন কখন আসবে জানেন নাকি?

যুবক যাত্রী ঃ আমি টাইম টেবল নই। স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করুন।

আশরাফ আলী ঃ স্যরি। (চেয়ার টেনে বসার শব্দ) আমার কথায় রাগ করেছেন নাকি?

যুবক যাত্রী ঃ (বিরক্তভাবে) না।

আশরাফ আলী ঃ কিছু মনে করবেন না। যাত্রা পথে কারো সাথে আলাপ পরিচয়, গল্পগুজব না করতে পারলে যাত্রাটাই বিস্বাদ হয়ে যায়। আমি আশরাফ আলী। পেশায়....

যুবক যাত্রী ঃ (বাধা দিয়ে) নিশ্চয় ইন্সুরেন্সের লোক?

আশরাফ আলী ঃ কাজটা দারুণ থ্রিলিং। করতে পারলে....

যুবক যাত্রী ঃ (বাধা দিয়ে) কচু হত। ইন্সুরেন্সের লোকেরা শাসালো মক্কেল ছাড়া যার তার সাথে গায়ে পড়ে আলাপ করেনা। আমি আপনার সোনা মক্কেল নই। পোড়া ছাই।

আশরাফ আলী ঃ (হেসে) যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দ্যাখো তাই....।

যুবক যাত্রী ঃ কাব্য রেখে আপনার মতলব বলবেন?

আশরাফ আলী ঃ ভাইরে গল্প ছাড়া আমার কোনও মতলব নেই। জোর গলায় বলতে পারি আমি নিপাট ভদ্রলোক। হলফ করে বলতে পারি আমি জুয়াচোর বা বাটপাড় নই। আমি ছোটখাটো একজন সাংবাদিক।

যুবক যাত্রী ঃ তাহলে গল্প, কবিতা লেখার বদ অভ্যাস আছে নিশ্চয়?

(আশরাফ হেসে ওঠেন)

আপনি যাই হোন বুঝতে পারি মানুষটা সদানন্দ। কিন্তু আমি ভাই নিরামিষ নিরানন্দ। আমার সাথে আপনার আলাপ জমবে না। স্যরি মিঃ আশরাফ আলী।

আশরাফ আলী ঃ (হেসে) আপনি আমার সম্পর্কে এত সব জেনে নিলেন অথচ সহযাত্রী হিসেবে আপনার নামটা পর্যন্ত জানা হল না।

যুবক যাত্রী ঃ কানা ছেলের নাম যেমন পদ্মলোচন হয় আমার নাম তেমনি রাজা হোসেন।

আশরাফ আলী ঃ আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন।

রাজা ঃ কেন আমার এই কাটা ঠ্যাং দেখে কি তাই মনে হচ্ছে?

আশরাফ আলী ঃ জ্বি না মানে....

রাজা ঃ আমি একা চুপচাপ বসে থাকতে ভালোবাসি। তাই প্লিজ—।

(কুলির মাথায় মালপত্র সহ ছয় বছর বয়স্ক শিশু-সন্তান সোহেল সহ রোমেনা প্রবেশ করে।)

কুলি ঃ এই ওয়েটিং রুমে আপনার মালপত্র রাখি বেগম সাহেবা?

রোমেনা ঃ ঠিক আছে। যাও, ট্রেন এলে সময় মতো তুলে দিয়ো।

কুলি ঃ জ্বে আচ্ছা। (চলে যায়)

রোমেনা ঃ সোহেল এসো আমরা এই চেয়ারটিতে বসি।

সোহেল ঃ বাইরে আমি ট্রেন আসা দেখি আম্মু?

রোমেনা ঃ না বাবা তুমি বাইরে যেওনা।

সোহেল ঃ আম্মা আমি বাইরে যাব না। এই জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব।

(দূর থেকে ফেরিওয়ালাদের হাকডাক ভেসে আসে)

সোহেল ঃ আম্মু, গাড়ি কখন আসবে বল না?

রোমেনা ঃ আসবে বাবা। তুমি চুপ করে দ্যাখো গাড়ি এলেই আমরা চড়বো।

সোহেল ঃ রেল গাড়িতে চড়তে কী মজা! আম্মু, তোমার মনে আছে আমাদের পাশের বাড়ির মন্টু রেলগাড়ি নিয়ে কী সুন্দর ছড়া বলতো....

মাগো মা
কাঁথা দিলে না
রেলগাড়িতে চলে যাব
দেখতে পাবে না।

জানো মা আমি বড়ো হলে আমার অনেক টাকা হবে। তখন আমি তোমাকে অনেক শাড়ি গয়না কিনে দেব আর তোমাকে নিয়ে রেলে ফার্স্ট ক্লাশে চড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো। হ্যাঁ আম্মু?

রোমেনা ঃ পাগল ছেলে আমার, আমাকে বুড়ো বয়সে অত শাড়ি গয়না দিলে আর ফার্স্ট ক্লাশে নিয়ে ঘুরে বেড়ালে তোর বউ যে আমায় হিংসে করবে।

সোহেল ঃ ইস আমি বিয়েই করব না।

(কুলিসহ শহীদ চৌধুরীর প্রবেশ)

কুলি ঃ স্যার, ট্রেন তো আওনের ঠিক নাই। আপনার লাগেজ ওয়েটিং রুমে রাখুম না প্লাটফর্মে রাখুম।

শহীদ ঃ ওয়েটিং রুমে রাখো।

কুলি ঃ ট্রেন থামলেই লাগেজ উঠাইয়া দিমু। আমি অখনই আইতাছি স্যার (চলে যায়। একজন পান বিড়ি সিগারেট ওয়ালা জানালার বাইরে হাঁক দিয়ে ওঠে)।

আশরাফ ঃ ট্রেনটা আজ বড় বেশি লেট করছে, কি বলেন মিস্টার....

শহীদ ঃ আমার নাম শহীদ চৌধুরী।

আশরাফ ঃ আপনি কত দূর যাবেন?

শহীদ ঃ জ্বি খুলনা।

আশরাফ ঃ আমি অবশ্য অতদূর যাব না। মাঝ পথেই নেমে যাব। তবু আমরা সবাই একই ট্রেনের যাত্রীতো। (রাজাকে উদ্দেশ্য করে) আপনি কতদূর যাবেন রাজা সাহেব?

রাজা ঃ জাহান্নামে।
(আশরাফ হেসে উঠেন। বলেন,)

আশরাফ ঃ সত্যি এসব ট্রেনে যাওয়া জাহান্নামে যাবার মতোই যন্ত্রণাদায়ক।

কুলি ঃ (দূর থেকে) স্যার, দুই স্টেশন আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইছে তাই ট্রেন আইতে বহুত লেট অইবো।

সোহেল ঃ শুনছো আম্মু ট্রেন আসতে অনেক দেরি। উঃ কতক্ষণ বসে থাকবো?

রোমেনা ঃ এসো তোমাকে এখানে বিছানা করে দিই। তুমি ঘুমোও।

সোহেল ঃ পরে ঘুমাবো আম্মু। এই জানালায় দাঁড়িয়ে একটু বাইরে দেখি।

আশরাফ ঃ (চিৎকার করে) এই যে স্টেশন মাস্টার সাহেব গাড়ির খবর কি?

স্টেশন মাস্টার ঃ (দূর থেকে) লেট হবে।

আশরাফ ঃ কত লেট?

স্টেশন মাস্টার ঃ (দূর থেকে) বলা যায় না। শেষ রাতেও হতে পারে। (চলে যায়)।

রাজা ঃ ওহ ডিসগাষ্টিং।
(স্টেশনের পারিপার্শ্বিক কোলাহলের শব্দ একটু উচ্চকিত হয়ে ক্রমশ বিলীন হতে থাকে। এলোমেলোভাবে মাউথ অর্গান বেজে ওঠে।)

রোমেনা ঃ আহ সোহেল এভাবে ডিসটার্ব কোরো নাতো।

সোহেল ঃ একটুখানি বাজাই আম্মু। (আবার বাজাতে থাকে। রাজার কণ্ঠ শোনা যায়।)

রাজা ঃ এই ছেলে শোনো।
(মাউথ অর্গান বাজনা থেমে যায়।)
মাউথ অর্গানটা আমাকে একটু দাও। আমি বাজিয়ে শোনাচ্ছি।

(মাউথ অর্গানে এবার "এ্যায় আপনা দিল তো আওয়ারা" গান বেজে ওঠে। তারপর হঠাৎ করেই থেমে যায়। রাজা আবার বলে)

রাজা ঃ যা বাজাবে ভালো করে বাজাবে। এলোমেলো বাজাবে না।

রোমেনা ঃ (কিছুটা ধমকের সুরে) সোহেল, এদিকে এসো। আর বাজাবাজি না। এসো বিছানায় শোও।

আশরাফ ঃ (স্বগত) ট্রেন আসতে অনেক দেরি। ট্রেনটা কি রাত কাবার করে আসবে নাকি? তাহলে সারারাত এই ওয়েটিং রুমেই কাটাতে হবে। কী যে করি। শুয়ে শুয়ে এদের মতো ঘুম দেবার বেডিং পত্তর আমার নেই। ইজিচেয়ার দু'টোতো বেশ দুজনে দখল করে শুয়ে আছেন। এদের সাথে যে একটু কথাবার্তা বলে সময় কাটাবো সে উপায় নেই। একজনের তো মুখে আগ্নেয়গিরি আর একজন দক্ষিণ মেরুর বরফের মতো ঠাণ্ডা। ভদ্রলোক দেখছি মোটা গীত বিতান খুলে বসলেন। গানটান গায় নাকি? মহিলাকে আপাতত নাতিশীতোষ্ণ মনে হচ্ছে। আর আমি বেচারা বিষুব রেখার মতো লাইন টেনে বসে আছি। থাকো তোমরা তোমাদের আপন ভুবনে। আমি আমার ব্যবস্থা করছি। (অ্যাটাচি খোলার শব্দ) আমার ডায়েরিটা কোথায় গেল? ওহ এই তো। (সংগীত ধ্বনি সহ সামান্য বিরতি) কিছু লিখতে লিখতে সময় কাটবে। (সামান্য বিরতির পর স্বগত) অনেক কথাই তো হাজার তারের বীণায় বাজে। অনেক কথাই জল প্রপাতের মতো সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বিশাল শব্দ তুলে ছুটে আসতে চায় বাইরে। কিন্তু কটা কথাই বা লেখা যায় বলা যায়? আজ রাতে এই প্রতিক্ষার ঘরে মুহূর্তগুলো পেরিয়ে যাবার জন্য ওয়েটিং রুমের মানুষগুলোকে নিয়ে একটু স্বপ্ন দেখতে ক্ষতি কি? জীবনের নিঃশব্দ স্বপ্ন, শিশিরের শব্দের মতো। জীবন মানেই তো স্বপ্ন। ধরা যাক ভালোবাসা স্বপ্নের ঘর। সেই ঘরে অফুরন্ত জীবন আর যৌবনের অমৃত পান করে ঘাসের মতো সবুজ হাওয়া, আকাশের মতো নীল হওয়া, বাতাসের মতো অনন্তকাল শুধু হু হু করে বসে যাওয়া-তারপর? সকাল সন্ধ্যায় শিশিরের শব্দাবলি ঝরে পড়ে—টুপ-টাপ-টুপ-টাপ–

(টুপটাপ শব্দের সাথে স্টেশনের দেয়াল ঘড়িতে টিকটিক শব্দ ও সংগীত ধ্বনি। তারপর ঢং ঢং শব্দে রাত দশটা বাজে।)

রোমেনা ঃ সোহেল অনেক রাত হয়েছে। এখনও ঘুমোওনা কেন? এসো।

সোহেল ঃ আমার ঘুম পায়নি তো আম্মু।

রোমেনা ঃ আহ্ সোহেল এদিকে এসো।

(সহসা শহীদ চৌধুরী সোহেলকে বলে ওঠেন।

শহীদ ঃ আম্মুর কথা শুনতে হয়, সোহেল।

সোহেল ঃ (চমকে) আমাকে বলছেন?

শহীদ ঃ হ্যাঁ।

সোহেল ঃ (কাছে এগিয়ে এসে) বারে আপনি বুঝি আমার নাম জানেন?

শহীদ ঃ হু জানি।

সোহেল ঃ কেমন করে বলুন না?

শহীদ ঃ একটু আগেই যে তোমাকে ঐ নামে ডাকতে শুনলাম।

সোহেল ঃ তাই বলুন। আমিতো ভেবেছিলাম আপনি আমাদের চেনেন।

শহীদ ঃ চিনি। হ্যাঁ চিনিই তো। কিন্তু না চিনলে বুঝি পরিচয় করা যায় না? তোমার নামটা কিন্তু বেশ সুন্দর। এমন সুন্দর নাম তোমার কে রেখেছে? তোমার আব্বু বুঝি?

সোহেল ঃ না আমার আম্মু।

শহীদ ঃ তোমরা কোথায় যাবে?

সোহেল ঃ আমরা খুলনায় যাব।

শহীদ ঃ খুলনায়! তোমার আব্বুর কাছে?

সোহেল ঃ যাহ্ তা হবে কেন? আমি আমার আব্বুকে কোনও দিন দেখিইনি। আম্মু বলেন আমি হবার ক'দিন আগেই আব্বু মারা গেছেন।

(দূরে কোনও গাড়ির হুইসেল তীব্র শব্দে বেজে ওঠে)

শহীদ ঃ (চমকে) মারা গেছে! ও-স্যরি।

সোহেল ঃ আপনি কোথায় যাবেন?

শহীদ ঃ আমি? আমি ও খুলনায়।

সোহেল ঃ তাই নাকি। তাহলে তো আপনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, তাই না?

শহীদ ঃ হ্যাঁ।

সোহেল ঃ আাপনার হাতে এত মোটা বই কিসের?

শহীদ ঃ গানের। রবীন্দ্রনাথের গীত বিতান।

সোহেল ঃ বাবা! এত বড়ো বই!

শহীদ ঃ বড়ো হলে তুমিও পড়বে। তাঁর মতো বড়ো মানুষের সুন্দর সুন্দর গানগুলো পড়লে গানগুলো শুনলে তোমার মন ভরে যাবে, জীবন হবে আরও সুন্দর।

রোমেনা ঃ (হঠাৎ জোরে) সোহেল? এখানে এসো, ঘুমুবে।

(কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত অতিক্রান্ত হয়। দূরে চা মিষ্টির ফেরিওয়ালার ডাক শোনা যায়। সহসা শহীদ চৌধুরী উঠে দাঁড়ান)।

শহীদ ঃ (স্বগত) একটু চা টা পাওয়া যায় নাকি দেখি। (বলে মিষ্টিওয়ালার উদ্দেশ্যে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে যান) এই মিষ্টিওয়ালা একটু দাঁড়াও।

সোহেল ঃ আমি ওনাকে চাচু বলবো, হ্যাঁ আম্মু?

রোমেনা ঃ চেনা নেই পরিচয় নেই তার সঙ্গে এত গল্প কেন?

সোহেল ঃ বারে উনিতো কত ভালো লোক। আমাকে কত আদর করলেন।

রোমেনা ঃ ভালো লোক! ও তো মতলববাজ হতে পারে? ওর ভদ্রতাতো ওর মুখোশ হতে পারে? ওতো তোকে ভুলিয়ে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে?

সোহেল ঃ (মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে) ইস বললেই হল! আমি অনেক বড়ো হয়েছি। আমাকে কেউ তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

শহীদ ঃ (ইতস্ততঃ করে) এই যে সোহেল, সামান্য মিষ্টি এনেছি। তুমি খাও আর তোমার আম্মুকে দাও।

রোমেনা ঃ না, সোহেল, এদিকে এসো। তোমায় না নিষেধ করেছি অপরিচিত কারো দেয়া কোনও জিনিস কখনও খাবে না। অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলবেনা। ডোন্ট টক টু দ্য স্ট্রেঞ্জার।

শহীদ ঃ (আহত কণ্ঠে) স্ট্রেঞ্জার! ইয়েস আ অ্যাম এ স্ট্রেঞ্জার, অপরিচিত। তবে ছেলে ধরা নই। সোহেল ছেলে মানুষ, ওকে আমি মিষ্টি কিনে দিলাম কিন্তু আপনি এমনি করে তা ফিরিয়ে দেবেন তা বুঝতে পারিনি।

রোমেনা ঃ মাফ করবেন। আমার ছেলের মিষ্টি খাবার সখ হলে আমিই কিনে দেবো। এ নিয়ে অন্যদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

শহীদ ঃ ও।

রোমেনা ঃ সোহেল, অনেক রাত হয়েছে। এসো আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ো। এসো।

(স্টেশনের মৃদু কোলাহল। কোনও গান পাগলা লোকের গান ভেসে আসে।)

চা ওয়ালা ঃ এই পাগলা গলা খুলে গান গা। শালার ঝিমনি কেটে যাক।

পাগলা ঃ গান গাইলে চা দিবি? চায়ে দুধ দিবি? সরভর্তি দুধ?

চা ওয়ালা ঃ দেব, দেব, গান গা।

পাগলা ঃ (গান ধরে) পরীর সাজন সাইজাছে কন্যা
ত্যাল সিন্দুর দিয়া
আসমানী রঙের শাড়ি পইড়ছে
তিন কুচি দিয়া
বেনী কইরছে সাপের মতোন
মাথায় তিনডা ফুল
মাঝখানেতে হিথি করছে
চেক্কন চেক্কন চুল।
আহা, চেক্কন চেক্কন চুলে রে
রঙিন রঙিন ফুল।
(গানের মধ্যেই ট্রেন আসার সংকেত ধ্বনি বেজে ওঠে। ট্রেন স্টেশনে প্রবেশের শব্দে যাত্রীদের কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে।)

রোমেনা ঃ সোহেল, সোহেল বাবা ওঠোতো। আমাদের ট্রেন এসে গেছে। ওঠো। সবাই চলে যাচ্ছে। এই ছেলে তাড়াতাড়ি ওঠো।

সোহেল ঃ (ঘুম জড়িত কণ্ঠে) উঠিতো। আমার ব্যাগ কই? এইতো। ঐ দ্যাখো আম্মু, চাচু এখনও ঘুমিয়ে। চাচু, আপনি যাবেন না? ট্রেন এসে গেছে তো!

রোমেনা ঃ থাক, চল আমরা যাই।

সোহেল ঃ আম্মু চাচু কেমন যেন করছে? দ্যাখো আম্মু!

২য় কুলি ঃ স্যার ট্রেন আইয়া গেছে। উঠেন স্যার, স্যার যাইবেন না?
(চমকে) হায় আল্লা, এইডা কি! হায় আল্লা আমি কি করুম? ও বেগম সাব, একটু দাঁড়ান।

রোমেনা ঃ কেন? কি হয়েছে?

কুলি ঃ সাবের কি হইলো দ্যাহেন দেহি!

রোমেনা ঃ (অস্থিরতার সঙ্গে) আমি কি দেখবো? আমার দ্যাখার কিছু নেই। তুমি দ্যাখো।

কুলি ঃ সাবের মুখ দিয়া ফেনা উঠতাছে। উনিতো অজ্ঞান!

সোহেল ঃ আম্মু চাচুর কি হয়েছে?

কুলি ঃ হায় আল্লা মানুষটা মইরা গেল নাকি! ও বেগম সাব?

রোমেনা ঃ সোহেল, বাবা তুমি ফ্লাস্ক থেকে পানি নিয়ে ওর চোখে মুখে ছিটিয়ে দিতে থাকো। আমি এক্ষুণি আসছি। তুমি ভয় পেয়োনা। আমি আসছি।
(স্টেশনে যাত্রীদের কোলাহল। সোহেল শহীদের মুখে পানির ছিটা না দিয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। তা দেখে কুলি বলে,)

কুলি ঃ আল্লারে, আল্লা মানুষটারে তুমি বাঁচাও। এই খোকা বাবা চুপচাপ দাঁড়ায়া থাকলা ক্যান? তুমার মায়ে না কইল? জোরে পানির ছিটা মারো না? কী কই বুঝছো?

সোহেল ঃ মা বলেছেন ডোন্ট টক টু দ্য স্ট্রেঞ্জার। আমি অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলি না।

(বাইরে থেকে স্টেশন মাস্টার সহ ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করে। ব্যগ্র কণ্ঠে বলে,)

রোমেনা ঃ এই যে স্টেশন মাস্টার সাহেব এখানে। উনি হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

স্টেশন মাস্টার ঃ (শহীদকে পরীক্ষা করে) হু। পথে ঘাটে এ ধরনের বিপদ আপদ মেয়েদের পক্ষে সত্যিই ভয়ের কথা। তবে কাছাকাছি কোনও ডাক্তার নেই। দূরে একজন ডাক্তার আছেন তাকে ডেকে পাঠাতে হবে। তা তুমি চিন্তা করোনা মা। আমি সব ব্যবস্থা করছি। যদি অসুবিধা না হয় তবে তুমি ওকে নিয়ে এই গরীবের বাসায় থাকতে পারো। কোনও অসুবিধা হবে না তোমাদের।

(ট্রেনের বাঁশি শোনা যায়।)

রোমেনা ঃ কিন্তু আমি তো মানে ..... আমাদের যাওয়া?

স্টেশন মাস্টার ঃ আমার মতে এ অবস্থায় ওকে নিয়ে চলাফেরা না করাই ভালো। ও একটু সুস্থ হয়ে উঠুক তারপর যেও। আমি ব্যবস্থা করে দেব।

রোমেনা ঃ কিন্তু আপনার কোনও অসুবিধে .....

স্টেশন মাস্টার ঃ আমার কোনও অসুবিধে নেই, মা। বাসায় এক মেয়ে ছাড়া এ বুড়ো মানুষটার আর কেউ নেই। চলো চলো আর দেরি কোরো না মা। আমি ডাক্তারকে এক্ষুণি খবর পাঠাচ্ছি। (কুলিকে ডাকলেন) এই তোদের আরও দু'তিনজন লোক নিয়ে আয় সায়েবকে আমার কোয়াটারে নিয়ে যা। চলো মা। চলো তো দাদু।

দৃশ্যান্তর

স্টেশন মাস্টার ঃ (বাইরে থেকে) রাজু, রাজু। (দরজায় খট খট শব্দ)।

রাজু ঃ যাই আব্বা। (দরজা খোলার শব্দ)

স্টেশন মাস্টার ঃ এই দ্যাখ মা কাদের নিয়ে এসেছি। এ হল রোমেনা। আর এই হল ওর ছেলে সোহেল। ওর বাবা হঠাৎ করে ওয়েটিং রুমের মধ্যে ফিট হয়ে গেছে। এখন বলতো ওরা কোথায় যাবে কি করবে।

রোমেনা ঃ (চমকে) না। আমি মানে .....।

স্টেশন মাস্টার ঃ (বাধা দিয়ে) তুমি চিন্তা করো না মা। রাজু মা তুই ওদের দ্যাখ। আমি যাই, এক্ষুণি ডাক্তার ডেকে পাঠাই। (চলে যায়।)

রাজু ঃ এসো বুবু। আমি তোমার ছোট বোন রাজু। সোহেল এস বাবু। (কুলিদের উদ্দেশ্যে) এই তোমরা যাও। আর শোনো আব্বাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো।

রোমেনা ঃ তোমাদের খুব অসুবিধে হবে রাজু।

রাজু ঃ কি যে বল বুবু। অসুবিধে আবার কিসের। তুমি বিশ্রাম করো। কোনও চিন্তা কোরো না। দুলাভাই নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবেন।

দৃশ্যান্তর

(স্টেশনের ঘড়িতে দূর থেকে রাত এগারোটা বাজার শব্দ। নিস্তব্ধ পরিবেশে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক।)

রোমেনা ঃ বুকের ব্যথাটা কি কমেছে?

শহীদ ঃ হ্যাঁ।

(গ্লাসে পানি ঢালার শব্দ)

রোমেনা ঃ এই ওষুধটুকু খেয়ে নিন।

(পানি ও ওষুধ খাবার মৃদু শব্দ)

শহীদ ঃ সোহেল কি ঘুমিয়েছে?

রোমেনা ঃ হ্যাঁ।

শহীদ ঃ আপনি যে এখনও জেগে, ঘুমোবেন না?

রোমেনা ঃ আপনার ওষুধ খাওয়া হলে এক্ষুণি ঘুমুতে যাব।

শহীদ ঃ আপনি শুধু আমার জন্য কষ্ট করছেন।

রোমেনা ঃ আপনার এরকম ব্যথা কি প্রায়ই হয়?

শহীদ ঃ হ্যাঁ, প্রায়ই হয়। যখন ব্যথা উঠে, অসহ্য ব্যথায় ছটফট করি। জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। কিন্তু জানিনা আবার কেমন করে বেঁচে উঠি। এবার কিন্তু আমি চেয়েছিলাম আমার মৃত্যু হোক। কিন্তু কেন যে আপনি অন্যান্য যাত্রীদের মতো আমায় ফেলে চলে গেলেন না কেনই বা নিজের ক্ষতি করে আমার সেবার জন্যে এই স্টেশনে রয়ে গেলেন তা বুঝতে পারলাম না।

রোমেনা ঃ লাভ লোকসানের যাচাই করে আমি কারো সেবা করি না। একজন মরণাপন্ন লোককে একাকী ওয়েটিং রুমে ফেলে যেতে বিবেকে বাধা দিয়েছে। তাই রয়ে গেছি।

শহীদ ঃ এখন তো আমি ভালো হয়ে গেছি।

রোমেনা ঃ সকালেই চলে যাব।

শহীদ ঃ আমি ছাড়া অন্য কেউ হলে কি এমনি করেই সেবা করতেন?

রোমেনা ঃ জানি না।

শহীদ ঃ আমার পরিচয়তো জানতে চাইলেন না?

রোমেনা ঃ পথের পরিচয়তো দীর্ঘস্থায়ী করে লাভ কি? আমি সামান্য স্কুল টিচার। সোহেল আমার একমাত্র ছেলে। তাকে নিয়ে সুখে-দুঃখে আমার দিন কেটে যায়।

শহীদ ঃ শুধু এই? আর কিছুই কি নেই?

রোমেনা ঃ না।

শহীদ ঃ কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো আপনাকে?

রোমেনা ঃ বলুন।

শহীদ ঃ আপনার স্বামী কি সত্যিই মারা গেছেন?

(অতি দূর থেকে বাঁশির বিষণ্ন সুর ভেসে আসে)

রোমেনা ঃ এসব কথা থাক শহীদ সাহেব। অনেক রাত হয়েছে। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।

শহীদ ঃ ঘুমুতে পারছি কই? শুনছেন, দূরে কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে। মনে হয় কাঁদছে। আহ্ কেউ যদি ওর বাঁশিটা কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলতো।

রোমেনা ঃ বাঁশিটা ভেঙে ফেললেই কি আপনার বুকের কষ্ট কমতো?

শহীদ ঃ কমতো যদি ঐ বাঁশির বদলে কেউ আমার ভয়ংকর কষ্টের কথা-দুঃখের কথা শুনতো।

রোমেনা ঃ দুঃখিত। আমি কারো কোনও ব্যক্তিগত কথা শুনতে আগ্রহী নই। আমি যাচ্ছি।

শহীদ ঃ না, না দোহাই আপনার, আপনি যাবেন না অন্ততঃ আজকের রাতটুকু আপনার কাছে আমার প্রার্থনা। আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই। নইলে এ কষ্ট, এ যন্ত্রণার দাহ থেকে আমার নিষ্কৃতি নেই।

রোমেনা ঃ না আমি শুনতে চাই না, আমাকে ক্ষমা করুন।

শহীদ ঃ রেশমা?

রোমেনা ঃ (চমকে) কে রেশমা?

শহীদ ঃ তুমি।

রোমেনা ঃ না।

শহীদ ঃ না, প্লিজ আমাকে আর একবার কিছু বলার সুযোগ দাও। এতকাল পর হাজারও মানুষের ভিড়ে আজ এই হঠাৎ করে দেখা, এইটুকু আমাকে আজ দু'হাত ভরে পেতে দাও।

রোমেনা ঃ আমি রেশমা নই।

শহীদ ঃ তুমি রেশমা।

রোমেনা ঃ আপনি বার বার ভুল করছেন মিঃ শহীদ। আমি রোমেনা। রোমেনা।

শহীদ ঃ না তোমার চুল, তোমার চোখ, তোমার স্পর্শ গন্ধ আজও আমার সব অস্তিত্বকে গ্রাস করে আছে। আমি ভুল করতে পারিনা তুমিই রেশমা।

রোমেনা ঃ না আপনার সব ধারণা ভুল। আমি রেশমা নই, আমি রোমেনা বেগম। আমার স্বামী সাত বছর আগে মারা গেছেন। আপনি ঘুমোন। আমি আসি।

রাজু ঃ (প্রবেশ করতে করতে) দুলাভাই, একি বুবু অমন করে চলে গেল কেন?

শহীদ ঃ আমি ভুল করেছিলাম রাজু। অন্যের স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী ভেবে বসেছিলাম।

রাজু ঃ একি বলছেন আপনি?

শহীদ ঃ রোমেনা বেগম রেশমা নয়। রেশমা সাত বছর আগে হারিয়ে গেছে .... না না মারা গেছে। আর আমিও মরে গেছি সাত বছর আগে। (স্মৃতিচারণায় সাত বছর আগে শিশিরের শব্দের মতো, ঘড়ির টিকটিক শব্দের মতো সংগীতধ্বনি)

দৃশ্যান্তর

(একটি ক্ষুদ্র ঘরে ক্র্যাচধারী যুবক রাজা মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে 'এ্যায় আপনা দিল তো আওয়ারা'। হঠাৎ করে বাজনা থেমে যায়।)

রাজা ঃ আবার তুমি!

রেশমা ঃ তোমার বাজনায় কি ব্যাঘাত ঘটালাম?

রাজা ঃ না, তা নয়। তবে এখানে আসা তোমার উচিত নয়।

রেশমা ঃ কেন?

রাজা ঃ আমার এই ছোট্টো ঘর যেখানে আমারই দম বন্ধ হয়ে আসে সেখানে বারবার তুমি কেন আসবে?

রেশমা ঃ আসি মরতে।

রাজা ঃ মরার আর কোনও উপায় জানা নেই বুঝি?

রেশমা ঃ এর চাইতে অন্য মরণ আমার আর জানা নেই।

রাজা ঃ কেন এই মরণ?

রেশমা ঃ জানি না।

রাজা ঃ স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নের আর এক ঘর, সেই ঘরে সুখের আশায় তিলে তিলে মরে যাওয়া এই বুঝি তোমার ভালোবাসা?

রেশমা ঃ তোমার কাছে কিছু নয় বুঝি?

রাজা ঃ না। রাজা নাম নিয়ে রাজা হবার স্বপ্ন নিয়ে সব যোগ্যতা সত্ত্বেও যে পা খুইয়ে চাকরি থেকে ছাটাই হয়ে যায় সে পৃথিবীর সব রমনীর ভালোবাসা থেকেও ছাটাই হয়ে যায়।

রেশমা ঃ মিথ্যে কথা। অর্থ, চাকরি, প্রতিপত্তির হিসেব করে কোনও মেয়ে কোনও পুরুষকে ভালোবাসতে পারে না।

রাজা ঃ কিন্তু যারা হিসেব করে ভালোবাসে তারা জিতে যায়।

রেশমা ঃ লাভ লোকসান আমি বুঝি না। আমি যতটুকু চেয়েছি ততটুকু পেতে চাই।

রাজা ঃ তাহলে রেশমা বেগমের এই চুল শনের মতো বিবর্ণ হয়ে যাবে, এই টলটল চোখের নিচে জলপাই রং সতেজ সবুজ চামড়া কুঁকড়ে যাবে। আমার এই চিলেকোঠার ঘরের নোনা ধরা দেয়ালের পলেস্তারার মত খসে পড়বে তোমার উনিশ বসন্তের সব পাপড়িগুলো।

রেশমা ঃ (অস্থির কণ্ঠে) আহ্ তুমি থামবে!

রাজা ঃ (হাসে) ভয় পাচ্ছ তোমার ভবিষ্যত চিত্র দেখে?

রেশমা ঃ অসুস্থ মনোবিকার আমার কাছে অসহ্য।

রাজা ঃ যে মেয়ের আর দশ দিন পর বিয়ে, এক সুখের ঘর থেকে অন্য সুখের ঘরে যাবে কেন সে আসে অন্ধকার যন্ত্রণার ঘরে? কেন আসে একটা বাতিল পঙ্গু অকর্মন্য লোকের কাছে?

রেশমা ঃ আসি শেষ কথাটা জানতে। আমার উপর যার অধিকার সে কি নিরব দর্শকের মতো বসে থাকবে নাকি ছিনিয়ে আনবে?

রাজা ঃ (তিক্ত হাসতে) ছিনিয়ে আনবে একটা পঙ্গু লোক, যাকে পা হারিয়ে চাকরি থেকে ছাটাই হয়ে যেতে হয়! দুটো টিউশনির টাকায় শুকনো রুটি গিলতে হয়, কবিতার পাণ্ডুলিপি নিয়ে সম্পাদকের দুয়ারে দুয়ারে ধর্না দিয়ে বেড়াতে হয় সে তোমাকে ছিনিয়ে আনবে এই চিলেকোঠার ঘরে?

রেশমা ঃ তুমি না পুরুষ মানুষ! পুরুষ হয়ে কেন আগুন দেখে, অন্ধকার দেখে, ঝড় দেখে ভয় পাবে?

রাজা ঃ আগুনে হাত পোড়ে, অন্ধকারে মরণ ওৎ পেতে বসে থাকে আর ঝড় সব ছিঁড়ে খুঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় এ সত্যটা কেন ভুলে যাও রেশমা?

রেশমা ঃ ও।

রাজা ঃ আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। বাস্তব বড়ো নিষ্ঠুর সত্য। তাকে চোখ রাঙিয়ে পার হয়ে যাওয়া যায় না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তোমাকে কি পৌঁছে দেব?

রেশমা ঃ আমার জন্য কারো সাহায্যের দরকার নেই। প্রয়োজন হলে সারা জীবনে আমি একাই চলতে পারবো। আসি।

(রেশমার অভিমানে চলে যাওয়া দেখে রাজার মৃদু হাসি। ক্র্যাচের শব্দ, প্লেটের ঢাকনা তোলার শব্দ হয়। রুটি দু'টো তুলে ধরে হাসে, বলে,)

রাজা ঃ আমার জীবন, আমার ভবিষ্যত এই ঝলসানো পোড়া রুটির মতো। এত বলি তবু রেশমা বড়ো অবুঝ। ওকি সুকান্ত পড়েনি? ওকি জানেনা,

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

না, না ক্ষুধার রাজ্যে ভালোবাসাটাই যেন এই ঝলসানো রুটি। এই পোড়া অংগার গিলে কী লাভ? তাতে তো শুধু যন্ত্রণাই বাড়বে তার চেয়ে এখন ঘুমিয়ে পড়া যাক। (সংগীত ধ্বনিতে সামান্য বিরতি) আহ্ কী প্রশান্তি। শহরের এই সর্বোচ্চ চিলে কোঠার ঘরে সব মানুষের মাথার উপরে আমি সত্যিই রাজা। এখন পাশের খোলা জানালা দিয়ে দেখবো একান্ত আমার আকাশকে। হাত বাড়িয়ে ঐ আকাশ থেকে ছিঁড়ে আনব গুচ্ছ গুছ আঙুর, সোনালি আপেল। নিষিদ্ধ ফলের নির্যাস পান করে নেশায় নেশায় রাত পোহাবে। তারপর? তারপর প্রতিদিনের মতো এই শহরের চিলেকোঠার রাজা মৃগয়ায় যাবে চাকরি নামক এক সোনার হরিণ শিকার করতে।

(কলকারখানার শব্দের সাথে 'নো ভ্যাকান্সি' ..... নো ..... নো..... নো..... শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে যায়।)

দৃশ্যান্তর

(ক্র্যাচের শব্দ, ক্লান্ত রাজা ক্র্যাচে ভর দিয়ে একটা অফিসের লম্বা করিডোর দিয়ে হাঁটছে। তার মনের কথাগুলো উচ্চারিত হতে থাকে।)

রাজা ঃ (হাঁটতে হাঁটতে স্বগত) ওয়াটার ওয়াটার এভরি হয়ার নট এ ড্রপ টু ড্রিংক। চারিদিকে কত রাশি রাশি চাকরি, রাশি রাশি টাকা অথচ একটা চাকরির জন্যে আমার বুক তেষ্টায় ফেটে যাচ্ছে। নট ড্রপ টু ড্রিংক! আমার জন্যে সব দরজা বন্ধ। এটা কোন অফিস? চৌধুরী এন্টারপ্রাইজ। মনে হয় চিনি ভদ্রলোককে। শহীদ চৌধুরী। (ক্রাচের শব্দে এগিয়ে যায়।)

বেয়ারা ঃ দাঁড়ান, স্যারের লগে আগে থেইকা কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

রাজা ঃ না।

বেয়ারা ঃ তাহলে সায়েব দেখা করবেন না।

রাজা ঃ এই স্লিপটা নিয়ে যাও। চৌধুরী সাহেবকে বলো সাংবাদিক রাজা হোসেন দেখা করবেন।

বেয়ারা ঃ আপনে একটু দাঁড়ান। আমি সাহেবেরে জিগাইয়া আসি। (চলে যায়)

রাজা ঃ (স্বগত) একটা চাকরি আমাকে পেতেই হবে। ভালোবাসার জন্যে নয় রুটির জন্যে .....

বেয়ারা ঃ (পুনরায় আসে) আপনার পারমিশন হইছে। আসেন স্যার। (দরজাটা খোলার পর ক্রাচের শব্দে এগিয়ে যায় রাজা।)

শহীদ ঃ হাউ ডু ইউ ডু মিঃ জার্নালিস্ট? বসুন, বসুন। মনে হয় অনেকদিন পর আমাদের দেখা হল। আপনি এখন কোন পেপারে?

রাজা ঃ জ্বি স্যার .... মানে!

শহীদ ঃ কী খাবেন? হট অর কোল্ড?

রাজা ঃ (বিব্রতভাবে) না না আমি কিছু খাব না। আমি এসেছিলাম .....

শহীদ ঃ নো হারি। বেয়ারা? (কলিং বেলের শব্দ) কপি দু'কাপ। কফিই ভালো। ইট উইল মেক ইউ অ্যাফ্রেশ। একটা পা হারিয়েছেন দেখছি! অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল বুঝি? ভেরি স্যাড। কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হল? নিশ্চয় আনমাইন্ডফুল ছিলেন। পোয়েটরা খুব আনমাইন্ডফুল হয়। ভেরি স্যাড। অল জার্নালিস্টস আর পোয়েট। আপনাদের টেস্ট এবং নেচারের সাথে অন্য কোনও জব স্যুট করে না। হাউ এভার এখন কোন পেপারে আছেন? আপনারা সাহেব আছেন আরামে। গোটা দুই নিউজ লিখলেন। আর্টিকেল লিখলেন, আর মাঝে মাঝে কলকারখানা অফিস আদালতের নিয়ম অনিয়মের উপর ঠুকে দিলেন গভর্নমেন্টকে।

রাজা ঃ দেখুন আমি বলতে চাচ্ছি .....। (বেয়ারা কফি এনে দু'জনের সামনে দেয়। কাপ রাখার মৃদু শব্দ হয়।)

শহীদ ঃ আমি জানি আপনি কি বলবেন। নিন কফি নিন। হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম ..... এই আমাদের অবস্থা দেখুন না। ছোটো ফার্ম আমাদের। বিদেশে চিংড়ি মাছ, ফ্রগ লেগ আর মাঝে মধ্যে বানর এক্সপোর্ট করি। উই আর আর্নিং ফরেন কারেন্সি ফর দ্য গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্টকে দিয়ে থুয়ে কিইবা ইনকাম আমাদের। বাট উই আর হেভিলি ট্যাক্সড। মাছ ধরার প্রয়োজনীয় ট্রলার নেই, স্পেয়ার পার্টসের অভাবে আমার ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা। চড়া দামে ফুয়েল কিনতে হচ্ছে। লেবার আনরেস্ট তো আছেই। ভাই হাজারো রকমের ঝামেলা ..... আপনি জার্নালিস্ট মানুষ আমাদের প্রবলেম সম্পর্কে আপনাদের পেপারে কিছু লিখুন। আই উইল সাপ্লাই ইউ অল দ্য ব্যাক গ্রাউন্ড ম্যাটেরিয়ালস।

রাজা ঃ আমি দুঃখিত স্যার আমি এসব নিয়ে কিছু লিখতে পারবো না।

শহীদ ঃ কেন?

রাজা ঃ কেন না আমি এখন সত্যি সত্যিই সাংবাদিক নই।

শহীদ ঃ (বিস্ময়) হোয়াট ডু ইউ মিন?

রাজা ঃ আমি একজন চাকরি প্রার্থী। আমাকে একটা চাকরি দিতে পারেন স্যার?

শহীদ ঃ (গম্ভীরভাবে) সাংবাদিক পরিচয় দিয়েছিলেন কেন?

রাজা ঃ বাধ্য হয়ে। তা না হলে কোথাও সহজে প্রবেশের অনুমতি মেলে না।

শহীদ ঃ ভেরি ক্লেভার। (পর্যবেক্ষণ করে রাজাকে) চাকরি পাবার কী যোগ্যতা আছে আপনার?

রাজা ঃ আমি বাংলা সাহিত্যে এম. এ পাশ। পত্র পত্রিকায় অনেক কবিতা বেরিয়েছে আমার। মাঝে মধ্যে সাংবাদিকতাও করেছি সেটাও আপনি জানেন।

শহীদ ঃ এসব অবান্তর। কোনও ফার্মে কাজ করবার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে?

রাজা ঃ জ্বি, একটা অ্যাডভারটাইজিং ফার্মে বিজ্ঞাপন লেখার চাকরি করতাম। একদিন রোড অ্যাক্সিডেন্টে পা হারালাম। ছ'মাস কাটালাম হাসপাতালে। তারপর চাকরিটাও চলে গেল।

শহীদ ঃ মিঃ রাজা আই হ্যাভ এভরি সিমপ্যাথি ফর ইউ। আমি আপনাকে একটা চাকরি বোধ হয় দিতে পারি।

রাজা ঃ (উৎসাহে উত্তেজনায়) দেবেন স্যার? দেবেন?

শহীদ ঃ হ্যাঁ। কিন্তু আপনি পারবেন কি?

রাজা ঃ বলুন স্যার কি চাকরি। আমি পারবো.....নিশ্চয় পারবো।

শহীদ ঃ আপনি আমার ফার্মকে ব্যাঙ আর বানর সাপ্লাই করবেন। পার হান্ড্রেডে ফিক্সড প্রাইসের উপর আরও টেন পার্সেন্ট কমিশন। কিন্তু ব্যাঙ আর বানর ধরা রিয়েলি টাফ্ জবা দে আর ভেরি নটি। পারবেন কি ব্যাঙ আর বানরের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে ..... আই মিন ক্যান ইউ ক্যাচ দেম?

রাজা ঃ মিঃ চৌধুরী আপনি .....

শহীদ ঃ মিঃ রাজা, চয়েজ ইজ ইয়োরস। বাট দিস ইজ মাই বিজনেস।

রাজা ঃ ধন্যবাদ স্যার। আই অ্যাম নট এ মাংকি ক্যাচার লাইক ইউ।
(ক্র্যাচে হেঁটে চলে যাবার শব্দ হয়।)

দৃশ্যান্তর

(আতশবাজির শব্দ, সানাইয়ের শব্দ দূর থেকে ভেসে আসে। রাজা তার চিলেকোঠার ঘরে শুয়ে)

রাজা ঃ আমি আমার চিলেকোঠার অন্ধকার ঘর থেকে আতশবাজির শব্দ শুনছি, আলোর ফুলঝুরি দেখিছি। আজ রাতে রেশমার বিয়ে। শুধু একটা চাকরির অভাবে রেশমাকে অধিকারের দাবি নিয়ে ছিনিয়ে আনতে পারলাম না। অসম্ভব সাধ ছিল আমার। পাখি হয়ে আকাশকে ছুঁয়ে দিতে চেয়েছিলাম। আমি আকাশকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আকাশ অনেক দূর। নীল পাখি হয়ে মেঘ পেরিয়ে নিজেরে খুঁজেই আমি হারিয়ে গেলাম ..... হারিয়ে গেলাম।

(বাজি ফোটার শব্দ, সানাইয়ের শব্দ উচ্চকিত হয়ে মিলিয়ে যায়।)

দৃশ্যান্তর

(শহীদ চৌধুরীর বাড়ি)
রেকর্ড প্লেয়ারে রবীন্দ্র সংগীত বাজছে
"তুই ফেলে এসেছিস কারে মন মনরে আমার"
(সহসা গান বন্ধ হয়ে যায়)

রেশমা ঃ গানটা বন্ধ করে দিলে কেন?

শহীদ ঃ এসব প্রলাপ বিলাপ শোনার চেয়ে স্বামীর টাইয়ের নট বাধা আরও রোমান্টিক। কাম অন, ডু ইট মাই লাভ। ওকে, গান শুনবে তো এসব গান শোন (রেকর্ড প্লেয়ারে বিদেশি গান বাজতে থাকে)।

রেশমা ঃ ব্যাঙের ডাক আর বানরের কিচির মিচির আমার তো ভালো নাও লাগতে পারে। (বিদেশি গান বন্ধ হয়ে যায়)

শহীদ ঃ তুমি আমার প্রফেশন সম্পর্কে ইঙ্গিত করছো?

রেশমা ঃ তাই কি? তাহলে দুঃখিত।

শহীদ ঃ না, দুঃখ প্রকাশের কিছু নেই। তবে আমি মনে করি ওয়াইফ হিসেবে তুমি যেমন আমার লাইফ পার্টনার তেমনি বিজনেস পার্টনারও বটে। সুতরাং এ প্রফেশনের মান অপমান দুজনেরই সমান।

রেশমা ঃ কারো বিজনেস পার্টনার হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।

শহীদ ঃ (হাসতে হাসতে) মাই ডিয়ার ফিফটি পার্সেন্ট শেয়ার হোল্ডার, ইউ শুড নট টক লাইক দ্যাট।

রেশমা ঃ কারো ব্যবসায়ের অংশীদার হওয়া কোনওদিন আমার আকাঙ্খা ছিল না। আজও নেই। ইচ্ছে করলেই যার শেয়ার সে ফিরিয়ে নিতে পারে।

শহীদ ঃ ফিরিয়ে দিতে চাইলেই কি নেয়া যায়? তাহলে যে একটা প্রোডাকটিভ মেশিনারিকে অকেজো করে রাখা হয়।

রেশমা ঃ (রেগে) মানে? আমি একটি প্রোডাকটিভ মেশিনারি?

শহীদ ঃ মানুষ মাত্রেই প্রোডাকটিভ মেশিনারি। যে প্রোডাকটিভ নয় সে সংসারের কাছে, সমাজের কাছে অকেজো, বাতিল। পৃথিবীর কাছে তার কোনও মূল্য নেই।

রেশমা ঃ তাহলে আমাকে এ সংসার থেকে বাতিল করে দিলেই হয়।

শহীদ ঃ (মৃদু হেসে) ভুলে যাচ্ছ কেন আমি একজন ব্যবসায়ী। বাতিল জিনিস আমি কখনো কিনি না।

রেশমা ঃ (ক্রুদ্ধ স্বরে) আমাকে অপমান করার এতখানি দুঃসাহস তোমার হয় কি করে? ভেবেছো আমি তোমার আর দশটা পাঁচটা যন্ত্রের মতো?

শহীদ ঃ আমার নিরেট সত্য কথা শুনতে খারাপ লাগলেও এতে মান অপমানের প্রশ্ন নেই। আমি সূর্যকে সূর্য, চাঁদকে চাঁদ, পাথরকে পাথরই বলবো। তাই আমি আবার বলবো তুমি একটি উৎপাদনশীল যন্ত্র। স্ত্রী হিসেবে তুমি আমার সন্তান উৎপাদন করবে, সন্তান প্রতিপালন করবে, সংসারে সুখ শান্তির বিধান করবে।

রেশমা ঃ (রাগে কাঁপতে কাঁপতে) আর? আর কী চাও এই যন্ত্রের কাছে?

শহীদ ঃ (মৃদু হাসতে থাকে) একজন ব্যবসায়ী কি চায়? ঝকঝকে বাড়ি, ঝকঝকে গাড়ি, আর একটা ঝকঝকে সুন্দরী স্ত্রী। আমিও পেয়েছি। আরও পেতে চাই আরও বড় হতে চাই। অনেক উপরে উঠতে চাই আমি। সুন্দরী স্ত্রী হিসেবে তুমি আমার সেই উপরে ওঠার সিঁড়ি।

রেশমা ঃ আমি তোমাকে ঘেন্না করি, ঘেন্না করি। (রেশমা অপমানে, রাগে কেঁদে ফেলে)

শহীদ ঃ (হাসতে হাসতে) রিয়েলি গার্লস আর টু-ও সেন্টিমেন্টাল।

দৃশ্যান্তর

(শহীদ চৌধুরীর অফিস কক্ষ)

বেয়ারা ঃ (টেলিফোন বেজে উঠে ক্রিং ক্রিং। রিসিভার উঠায়) হ্যালো শহীদ চৌধুরী নো স্পিকিং। নো নো। একটা চিংড়ি ফিসও এক্সপোর্ট হইবো না। ইয়েস ইয়েস, ব্যাঙের ডাকের জ্বালায় রাইতে ঘুমানো যায় না তয় কি হইছে? সোনা ব্যাঙ হউক, কোনা ব্যাঙ হউক বেবাকডী খাইলে আমরাই খামু। আপনারে দিমু না। হোয়াট? আমি মাংকি! মাংকি মানে বান্দর? ইয়েস ইয়েস বান্দরও খুব বাদরামী করে। আপনের মতোন বান্দর। আমার কলা গাছের বেবাক কলা খাইয়া ফেলছে। সব গুলান ধইরা এক্সপোর্ট কইরা দিমু। ও কে। (তাড়াতাড়ি রিসিভার রাখে। শহীদ প্রবেশ করে) সেলাম আলেকুম স্যার।

শহীদ ঃ কে টেলিফোন করেছিল?

বেয়ারা ঃ জ্বি স্যার কেউ না এমনি এমনি বাইরের এক বেহুদা লোক স্যার। বেহুদা কথাবার্তা।

শহীদ ঃ ঠিক আছে যাও। ম্যানেজার সাহেবকে সালাম দাও। ঐতো ম্যানেজার সাহেব এসেই গেছেন দেখছি। আসুন কালাম সাহেব। একি! আপনাকে এরকম লাগছে কেন? হোয়াট্স রঙ্?

ম্যানেজার ঃ স্যার একটা ট্যালেক্স এসেছে।

শহীদ ঃ ট্যালেক্স! দেখি (কাগজের শব্দ, (আর্তস্বরে) হোয়াট ডু ইউ মিন! আমার দশ লক্ষ ডলারের ফ্রগ লেগ.....

ম্যানেজার ঃ আই অ্যাম সরি স্যার, কনসাইনমেন্ট টোটালি রিজেকটেড বাই আওয়ার ফরেন এজেন্ট। কিছু ফ্রগ লেগে নাকি জার্ম পাওয়া গেছে।

শহীদ ঃ ম্যানেজার, হোয়াট দ্য হেল ইউ ডিড দেন? ফ্যাক্টরিতে লেগ ফ্রোজেন প্যাকিং এর আগে কেন প্রোপারলি এক্জামিন না করেই এক্সপোর্ট করা হল? কেন? (সামান্য বিরতি) নাউ লিভ মি অ্যালোন। আমাকে ভাবতে দিন। (শহীদ আবার বলে) শুনুন, কোয়ালিটি কন্ট্রোলারকে বলবেন ফ্রম টুমরো ট্রাই হিজ লাক সাম হয়ার এল্স। গুড বাই।

দৃশ্যান্তর

(শহীদ চৌধুরীর বাড়ি)

(ঘড়িতে রাত ১ টা বাজার শব্দ। দরজা খোলার শব্দ)

শহীদ ঃ ওহ্ অসহ্য ক্লান্তি। (মৃদু স্বরে ডাকে) রেশমা, রেশমা? রেশমা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। পাশে রবীন্দ্রনাথের গীত বিতান। বই নাতো ঘুম পাড়ানি গান। অথচ শুধু আমারই ঘুম বিশ্রামের এতটুকু অবকাশ নেই। রেশমা কবে আমার দুঃখ যন্ত্রণার অংশীদার হবে? ওর বালিশের কাছে একটা ডায়েরিও দেখছি। (হাসে) সাহিত্যের ছাত্রী তো। ভীষণ কল্পনা বিলাসী মেয়ে। সারাক্ষণ নিজেকে নিয়ে মগ্ন। কি লিখছিল ও? (পাতা উল্টানোর শব্দ হয়।)

রেশমার কণ্ঠ ঃ আমার স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নের ঘর সেই চিলেকোঠার ঘর যেখানে যাবার আর কোনও অধিকার নেই। সেই ঘরকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। মনে হয় ভুলতে গেলে জীবনটাকেই ভুলে যাবো।

শহীদ ঃ (স্বগতঃ) স্বপ্নের ঘর! চিলেকোঠার ঘর! সেই ঘর কোথায়? এ কী! ডায়েরির মধ্যে ফটো!..... রেশমা আর সেই রাজা! কখনো লেক বা নদীর ধারে মুখোমুখি বসে থাকা, কখনো শস্য ক্ষেতে লুকোচুরি খেলা, কখনো সেই চিলেকোঠার ঘরে পাশাপাশি বসে জানালা দিয়ে দু'চোখ ভরে শুধু আকাশকে দেখা। শুধু ওরা দু'জনে নিভৃত ভালোবাসার ঘরে-যেখানে আমি নেই-আমি নেই।

রেশমার কণ্ঠ ঃ একদিন এই যন্ত্রের প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে। দেখলাম পরিত্যক্ত সেই শূন্য ঘরে খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। আমি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে গিয়েছিলাম। অমন পাগল করা বাতাসের মধ্যেও অসীম শূন্যতা, আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল। আমি ছুটে পালিয়ে এলাম। পৃথিবীর আনন্দ আলো আর রঙ এর মেলা থেকে যে নির্বাসিত তার জন্যে চার দেয়াল ঘেরা এই কয়েদ খানায় ফিরে আসা ছাড়া উপায় কি? এখানে যে শত্রুর বীজ আমার দেহে অংকুরিত হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি নিভৃত প্রাণের প্রতিধ্বনি। শুনতে শুনতে আর শুনতে শুনতে নিঃশব্দ কান্নায় ভরে উঠছে শিশিরের শব্দের মতো নির্জন মুহূর্তগুলো।

শহীদ ঃ (আর্তস্বরে) ওহ্! রেশমা এমনি করেই কি তুমি আমার বিশ্বাসের ভিত্তিগুলোয় ফাটল ধরাবে? আমার ইচ্ছা আনন্দের চন্দ্রগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ করে আমাকে আবার টেনে আনবে পথের ধুলোয়?

দৃশ্যান্তর

(রেকর্ড প্লেয়ারে রবীন্দ্র সংগীত বাজছে, 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না'। সহসা রেকর্ড প্লেয়ার বন্ধ হয়ে যায়।)

শহীদ ঃ চোখের জলে পথের ধুলো ভিজিয়ে দেবার অনেক সময় আছে। কিন্তু আজকের সন্ধ্যায় এ সময়টকু আমাকে দিতে হবে। রেডি হয়ে নাও। আধঘন্টা পরেই আমরা বেরিয়ে যাবো।

রেশমা ঃ কোথায় যেতে হবে?

শহীদ ঃ আমরা একটা পার্টিতে যাচ্ছি।

রেশমা ঃ হঠাৎ করে পার্টি? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!

শহীদ ঃ আজ রাতে তুমি আমার এক সম্মানিত অতিথির সম্মানে হোটেলে পার্টি দিচ্ছ।

রেশমা ঃ (বিস্ময়) আমি পার্টি দিচ্ছি!

শহীদ ঃ হ্যাঁ, তুমি। ভেবে দেখলাম আমার ফরেন ক্লায়েন্ট জনসন সায়েবের সাথে তোমার পরিচয় হওয়া দরকার। হি ইজ এ নাইস ম্যান।

রেশমা ঃ তুমি কি বলতে চাইছো?

শহীদ ঃ সাপ আর সাপুড়ের খেলা তো দেখেছো? আজ তুমি সাপধরা বেদেনীর ভূমিকায় অভিনয় করবে।

রেশমা ঃ (ক্রুদ্ধভাবে) মানে?

শহীদ ঃ ইডিয়ট ম্যানেজারের সামান্য ভুলে আমার দশ লক্ষ ডলারের ফ্রগ লেগের কনসাইনমেন্ট বাতিল হতে চলছে। আমার শেষ আশা জনসন সাহেব। সেই একমাত্র ব্যক্তি যে তাদের হেড কোয়াটারকে কনভিন্‌স করে আমার কনসাইনমেন্ট পার্শিয়ালি একসেপ্ট করাতে পারবে।

রেশমা ঃ এসবের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি কী করতে পারি?

শহীদ ঃ লাইক এ স্নেক চার্মার ইউ উইল হ্যাভ টু কনভিন্‌স হিম ভেরি ট্যাকটফুলি ভেরি কেয়ারফুলি।

রেশমা ঃ এ আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

শহীদ ঃ অবশ্যই সম্ভব। কারণ সুন্দরী, শিক্ষিতা এবং বাঙালি মহিলার প্রতি জনসন সায়েবের ভীষণ রকম দুর্বলতা।

রেশমা ঃ (ক্রোধ ও যন্ত্রণায়) ছিঃ ছিঃ এ আমি ভাবতে পারিনে টাকার জন্যে মানুষ এত নীচে নামতে পারে!

শহীদ ঃ প্রতিটি টাকা যে আমার রক্তকণা।

রেশমা ঃ কিন্তু আমার নয়।

শহীদ ঃ রেশমা বেগম, তুমি হয়তো জানো না আমার মা একটা টাকাওয়ালা লোকের সাথে পালিয়ে গিয়েছিল। আমার বাবা বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছিল। কারণ আমার বাবার টাকা ছিল না।

রেশমা ঃ তাই টাকার জন্য এত লালসা, এত ক্ষুধা?

শহীদ ঃ যার দিন কাটে কবিতা পড়ে আর গান শুনে সে কি করে বুঝবে টাকার মূল্য? কি করে বুঝবে এক একটা টাকার জন্যে অন্ধ উন্মাদনায়, তৃষ্ণার্ত চিৎকারে আমি জীবনের বিশটি বছর কেমন করে কাটিয়েছি।

রেশমা ঃ কিন্তু এই উন্মাদনা, তৃষ্ণার্ত চিৎকার কবে শেষ হবে? বলতে পারো আরও কত টাকা চাই তোমার?

শহীদ ঃ সাহারা মরুভূমিতে যত বালুকণা আছে তত। সমুদ্রে যত ঢেউ আছে তত। পৃথিবীর সব টাকা আমার চাই। আমার যে সন্তান আসছে তাকেও আমি আমার থিয়োরি, আমার আদর্শে মানুষ করবো।

রেশমা ঃ (চিৎকার করে) না।

(শহীদ কিছু বলতে গেলে সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে ওঠে। শহীদ টেলিফোন ধরে)

শহীদ ঃ হ্যালো, অল অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিট? ও কে, আমি দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি। (টেলিফোন রাখার শব্দ) আমার সন্তান কবি হবে না ওনাসিস হবে তা নিয়ে পরে তর্ক করলে চলবে। পার্টির সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। প্লিজ গেট রেডি।

রেশমা ঃ না।

শহীদ ঃ তোমার ঐ সামান্য সেন্টিমেন্টের জন্য সম্মানিত অতিথিদের অসম্মান হবে, তাদের অপমান করা হবে এটা কেন বুঝতে পারো না?

রেশমা ঃ আমি তাদের নিমন্ত্রণ করিনি।

শহীদ ঃ আমি তো করেছি। আমার জন্য তোমার এতটুকু সহানুভূতি এতটুকু ভদ্রতাবোধ কেন থাকবে না?

রেশমা ঃ ভদ্রতা বোধ! সহানুভূতি! কার জন্যে? যে টাকার জন্যে আমাকে বিক্রি করে? টাকার জন্যে স্ত্রীর সম্ভ্রমকে বিক্রি করে?

শহীদ ঃ রেশমা!

রেশমা ঃ তোমার জন্যে শুধু আমার পৃথিবীর সব ঘৃণা জমা হয়ে আছে।

শহীদ ঃ আমার জন্যে ঘৃণা! তাহলে ভালোবাসা কার জন্যে? ভালোবাসা কি সেই চিলেকোঠা ঘরের জন্যে? কোথায় সেই ডায়েরি, ফটো? (জিনিস পত্র ছুঁড়ে ফেলার শব্দ) এই যে..... এই জন্যেই কি তুমি

আমার সাথে যেতে চাও না? এই জন্যেই কি আমাকে ঘৃণা কর? তাই যদি হয় ঘৃণা আর ভালোবাসা একই ছাদের নিচে বসবাস করতে পারে না। যতদিন আমার টাকা থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমার মতো সুন্দরী স্ত্রী কেনবার, ভালোবাসা কেনবার অভাব আমার হবে না। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। ইউ আর ফ্রি (প্রতিধ্বনিত শব্দ) মুক্তি..... মুক্তি।

দৃশ্যান্তর

(শহীদ চৌধুরীর ম্যানেজারের অফিস কক্ষে টেলিফোন বেজে ওঠে)

ম্যানেজার ঃ হ্যালো, কে বলেছেন?

ব্যাংক ম্যানেজার ঃ (টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে) ব্যাংক থেকে ম্যানেজার মিজান বলছি।

ম্যানেজার ঃ স্যারতো নেই। কদিন ধরে উনি অফিসে আসছেন না, বাসাতেও উনি নেই।

ব্যাংক ম্যানেজার ঃ আশ্চর্য। কী হয়েছে তাঁর?

ম্যানেজার ঃ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এমন তো কখনো হয় না।

ব্যাংক ম্যানেজার ঃ এমন কখনো হয় না বলেই আমি বারবার নিজের রিস্কেই এতদিন ব্যাংক থেকে মোটা টাকার ওডি দিয়ে এসেছি। টাকা শোধ দেবার লাস্টডেট এক সপ্তাহ আগেই পার হয়ে গেছে।

ম্যানেজার ঃ দেখুন মিজান সাহেব আপনি আমাদের ফার্মের গুড উইল সম্পর্কে ভালো ভাবেই জানেন। ফ্রগ লেগের কনসাইনমেন্টটা যদি অ্যাক্সিডেন্টালি রিজেক্ট না হয়ে যেতো....

ব্যাংক ম্যানেজার ঃ আমি জানি। কিন্তু আমাদের ব্যাংক থেকে দেয়া লোনটাও কম নয়। শোধ না করতে পারলে যে আপনাদের ফ্যাক্টরি, গোডাউন সব কিছু সিজ হয়ে যাবে সে কথাটা আশা করি মনে রাখবেন।

ম্যাজোর ঃ জ্বি আমি জানি। স্যারের সঙ্গে দেখা হলে সে কথা বলবো।

দৃশ্যান্তর

শহীদ ঃ (মত্ত ও জড়িত গলায় হাসে) যন্ত্রের প্রাসাদ, যন্ত্রের মানুষের কাছ থেকে রেশমাও চলে গেল। কোথায় গেল? হয়তো তার স্বপ্নের

চিলেকোঠার ঘরে। যাক। আমি আবার বিয়ে করবো। কিন্তু কোন মেয়েকে বিয়ে করবো? সব কুমারী মেয়েদেরই তো এক একজন করে ভালোবাসার রাজা থাকে। স্বামীরা তো কোনও দিন রাজা হয় না। রাজা হতে পারে না। তাইতো পৃথিবীর সব ঘৃণা স্বামীদের জন্য জমা হয়ে থাকে। যাক। আমার এতটুকু দুঃখ নেই। রেশমা দেখো, আমার লক্ষ লক্ষ টাকা গেছে। ব্যাংকের লোন শোধ করতে পারিনি। ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে। তবু আমি হেরে যাইনি, ভেঙে পড়িনি। আমি হারতে চাইনা। (রেকর্ড প্লেয়ারে উচ্ছল বিদেশি গান। কয়েক মুহূর্ত বাজার পরই থেমে যায়) না অসহ্য! রেশমা বেগম, তুমি আমার শত্রু। তুমি আমাকে নিঃস্ব করে দিয়েছো। তুমি আমার সর্বনাশ। আমি কোনও দিন তোমাকে ক্ষমা করবো না। –না।

(সংগীত ধ্বনির সাথে তার কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে যায়)

দৃশ্যান্তর

(স্মৃতিচারণ শেষে স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারে বর্তমান সময়ে)

শহীদ ঃ (আত্মমগ্নভাবে) না না কোনওদিন না।

রাজু ঃ শহীদ ভাই ..... শহীদ ভাই?

শহীদ ঃ (সম্বিত ফিরে পায়) কে? ও রাজু (সামান্য চুপ করে থেকে) ঐ রোমেনা বেগম কোথায় গেলেন?

রাজু ঃ উনি তো অনেকক্ষণ আগে চলে গেছেন তার ঘরে। আমিই তো এতক্ষণ আপনার গল্প শুনছিলাম।

শহীদ ঃ ও।

রাজু ঃ আচ্ছা রেশমা বুবুর দেখা আপনি আর কোনওদিন পাননি?

শহীদ ঃ (দীর্ঘশ্বাসের শব্দ) রাজু আমি বড়ো ক্লান্ত।

রাজু ঃ ঠিক আছে। আপনি ঘুমোন। আমি যাই। (চলে যায়)

শহীদ ঃ (স্বগত) সময় মানুষকে কী ভীষণ বদলে দেয় যার জন্য রেশমারা কত সহজেই রোমেনা হয়ে যায়। এখন আর বোধ হয় ওর চোখের জলে শুকনো ধুলো ভিজে যায় না। কাউকে ফেলে আসার জন্য মনও কাঁদে না। তবে আমারই বা কেন আর এই বিলাপ বিলাস? আমি সব কিছু ভুলতে চাই। ঘুমুতে চাই। এখন ঘুম নেমে আসুক। জড়িয়ে দিক আমার দুচোখ। ঘুম..... আ..... ঘুম।

(সংগীত ধ্বনি বাজতে থাকে)

রাজু ঃ একি বুবু! তুমি এত রাতে বাইরে দাঁড়িয়ে?

রোমেনা ঃ এমনি।

রাজু ঃ এমনি.... ! রাত তো অনেক!

রোমেনা ঃ ঘুম আসছে না।

রাজু ঃ শহীদ ভাই তার অতীত দিনের কথা বললেন, তুমি কি শুনেছো?

রোমেনা ঃ না।

রাজু ঃ ওর স্ত্রী সাত বছর আগে ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সামান্য ব্যাপারে ওদের এত ভুল বুঝাবুঝি.... এত কষ্ট! বিশ্বাস কর, শুনতে শুনতে আমার খুব কান্না পাচ্ছিলো।

রোমেনা ঃ এর চাইতেও পৃথিবীতে অনেক বেশি কষ্টের গল্প, কান্না পাওয়ার গল্প আছে।

রাজু ঃ বুবু আমি তোমার মতো লেখাপড়া জানা মেয়ে নই। ভালো করে কথা বলতে পারিনে। তবু বুবু বলে যখন ডেকেছি একটা প্রশ্নের উত্তর আমাকে দেবে? শহীদ ভাই এর ধারণা তুমি তার সেই হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী.....

রোমেনা ঃ (চাপা চিৎকারে) ভুল সব ভুল। আমি ওর কেউ না। ওর স্ত্রী রেশমা না। আমি একজন সামান্য মানুষ..... স্কুল টিচার..... রোমেনা.... সোহেলের মা।

রাজু ঃ বুবু নিজের হাতে নিজের বুকের কলিজা কি কেউ উপড়ে ফেলতে পারে? শহীদ ভাই যদি শুধু পথের পরিচিত হয় তবে কোন অধিকারে তাকে এখানে নিয়ে এলে? শুধু পথের পরিচয়ে? তা হলে উত্তর দাও অন্য যাত্রীদের মতো তুমি তাকে ফেলে চলে যাওনি কেন? উত্তর দাও যার পরিচয় সোহেলের মুখে আঁকা সে কে? সোহেল কার ছেলে? শুধু তোমার?

রোমেনা ঃ (রুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়ে) আমার.... আমার, শুধু আমার। এর বেশি আমি আর কিছু জানি না..... তুমি আমাকে একলা থাকতে দাও। রাজু.... দয়া করে একলা থাকতে দাও।

(রোমেনার চাপা আর্তকান্নার সঙ্গে বিষণ্ন সংগীত ধ্বনি।)

দৃশ্যান্তর

<u>সময় সকাল</u>

(পাখির কিচিরমিচির শব্দ শোনা যায়)

রাজু ঃ শহীদ ভাই, শহীদ ভাই?

শহীদ ঃ (ঘুম ভাঙে) আঃ। কে রাজু। তুমি এত সকালে!

রাজু ঃ শেষ রাতের ট্রেনে বুবু সোহেলকে নিয়ে চলে গেছে। তোমাকে কিছুতেই জানতে দিতে চাইলো না।

শহীদ ঃ (আকস্মিক আঘাতে প্রথমে স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর বিড়বিড় করতে থাকে) চলে গেল! চলে গেল! আমার ক্ষমা চাইবার শেষ সুযোগটুকু না দিয়ে চলে গেল!

রাজু ঃ যাবার আগে এই চিঠিটা তোমাকে দিয়ে গেছে।

শহীদ ঃ চিঠি!

(দ্রুতগামী ট্রেনের শব্দের সাথে সংগীত ধ্বনি ও রোমেনার কণ্ঠ)

রোমেনার কণ্ঠঃ "শেষ রাতের ট্রেনে আমি সোহেলকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। আমার এ চলে যাওয়াটা তোমার কাছে নিষ্ঠুর মনে হলেও আমার সারাটা জীবনই তো নিষ্ঠুরতার শিকার। তাই আমার পথ নিঃসঙ্গ যাত্রার পথ যা একদিন তুমিই তৈরি করে দিয়েছিলে। একদিন তুমি টাকা দিয়ে ভালোবাসা কিনতে চেয়েছিলে, সুখ কিনতে চেয়েছিলে। কিন্তু স্টেশনের ওয়েটিং রুমে অচেতন অবস্থায় অসহায় শিশুর মতো যখন কুঁকড়ে পড়ে রইলে তখন বুঝতে পারলাম তুমি টাকার বিনিময়ে জীবনের অসংখ্য শূন্যতাকেই শুধু কিনেছ। কিনতে পারনি সুখের সোনার হরিণ। একদিন তোমাকে আমি ঘৃণা করতাম। কিন্তু সে দিন ঘৃণার বদলে করুণা হল। তোমার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। আজ তুমি অনুতপ্ত। তুমি এখন গীতবিতান পড়। সুন্দর মন, সুন্দর জীবনের কথা বল। আইনের বাঁধন যখন ছিন্ন হয়নি তখন আবার হয়তো তোমার সাথে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখা চলে। কিন্তু সোহেল যে আমার একমাত্র সন্তান। অভাব, অনটন, দুঃখ, হতাশার চড়াই উৎরাই পার হতে হতে সে হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলো অনুভব করবার, জীবনকে যন্ত্রে পরিণত না করে মানুষ হবার শিক্ষা নেবে, এই আশা নিয়ে আমি তাকে একটা গোপন সত্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। একদিন তো তুমি আমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছ, অপমান করেছ। প্রতিদানে আজ আমি শুধু এই কথাই বলতে পারি যদি চাও, যদি আবার আমাকে খুঁজে পাও তাহলে সেদিন দুঃখের বদলে দুঃখ নয়..... ফিরিয়ে দেব তোমার সন্তানকে..... হয়তো বা আমাকেও।

(চিঠি পড়া শেষ হতেই চমকে ওঠার মতো ট্রেন আসার ঘণ্টা ধ্বনি বাজে। দ্রুত ট্রেন এসে স্টেশনে প্রবেশ করার শব্দ এবং আস্তে আস্তে নেমে যাবার শব্দ। যাত্রীদের কোলাহলে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। কুলিরা দ্রুত এসে ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করে।)

প্রথম কুলি ঃ স্যার, স্যার উঠেন স্যার ট্রেন আইয়া পড়ছে।

শহীদ ঃ (ঘুম ভেঙে উঠে) ট্রেন এসে গেছে? তাড়াতাড়ি আমার স্যুটকেস তুলে নাও।

দ্বিতীয় কুলি ঃ বেগম সাহেব উঠেন। সারারাত পর অহন শেষ রাতের ট্রেন আইছে।

রোমেনা ঃ এই সোহেল, সোহেল বাবা ওঠো।

সোহেল ঃ (ঘুম জড়িত কণ্ঠে) উঃ।

রোমেনা ঃ ওঠো বাবা দ্যাখো আমাদের ট্রেন এসে গেছে।

সোহেল ঃ (ঘুম ভেঙে হাই তোলে) ট্রেন এসেছে আম্মু?

দ্বিতীয় কুলি ঃ হ আইছে। তাড়াতাড়ি উঠেন। যা ভিড় জায়গা পাওয়া যাইবো না।

শহীদ ঃ আমার চশমাটা যে কোথায় ফেললাম? আমার গীত বিতান?

প্রথম কুলি ঃ কই রাখছিলেন স্যার?

শহীদ ঃ যা ঘুম পেয়েছিল..... কোথায় যে রাখলাম?

রোমেনা ঃ ইজি চেয়ারের নিচে পড়ে আছে আপনার গীত বিতান, আর ঐ যে চেয়ারের পায়ার কাছে ঐটিই বোধ হয় আপনার চশমা। কাচ ভাঙেনি তো?

শহীদ ঃ জ্বি তাইতো! না কাচ ভাঙেনি। ধন্যবাদ আপনাকে। সোহেল, বাই। এই কুলি, চলো ভাই। (শহীদ চৌধুরী কুলিসহ চলে যায়।)

রোমেনা ঃ সোহেল, এস বাবু। তাড়াতাড়ি চলো। ট্রেন চেড়ে দেবে তো।

সোহেল ঃ এইতো আম্মু জুতোটা পরে নিচ্ছি। চলো। (রোমেনা ও সোহেল চলে যায়।)

আশরাফ ঃ রাজা সাহেব, আপনি যে বসে আছেন? যাবেন না?

রাজা ঃ হ্যাঁ যাব। আমার কুলিটা যে গেল কোথায়? ঐ তো আসছে। মনে কিছু নেবেন না আশরাফ সাহেব। আমার ব্যবহারের জন্য দুঃখিত। আমার জীবনটা আসলে– (থেমে যায়) থাক ওসব কথা। আসি।

(ক্র্যাচে চলার শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। কোলাহল ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসে।)

আশরাফ ঃ ওরা সবাই এক এক করে অপেক্ষার রেল গাড়িতে চলে যাচ্ছে। আমিও। শহীদ চৌধুরী, রোমেনা বেগম, রাজা একই রেল গাড়িতে অথচ আলাদা ঠিকানায়। আমার ডায়েরিতে শেষটুকু কী লিখবো? কত যাত্রীই তো স্টেশনে ওয়েটিং রুমে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে থাকে। কিন্তু কাউকে নিয়ে কোনও দিন তো এমন ভাবিনি।

এই ওয়েটিং রুমের তিনজন অচেনা যাত্রীকে নিয়ে কেন এমন ভাবলাম? সত্যিই কী ওদের অতীত আমার ভাবনার মতো? ভালোবাসার সংসার থেকে স্বপ্নের ঘর থেকে ওদের জীবন কী সত্যিই বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ?

(দ্রুতগামী ট্রেনের শব্দের সাথে সংগীত ধ্বনি ভেসে আসে।)

জীবন চলার স্রোতে আবার হয়তো হবে দেখা
ভরবে আবার প্রাণ।
এই নয়নে তোমার দেখা নেইতো অবসান।
কুড়িয়ে চলি ছিন্ন মালার শুকিয়ে যাওয়া ফুল
কণ্ঠে তুলি তাইতো আবার শেষ বিকেলের গান।

(গানের রেশ চলতি ট্রেনের শব্দের সাথে বিলীন হয়ে যায়।)

[রচনা কাল, ১৯৬৭ সাল। নাটকটি কাজী জাকির হাসান সম্পাদিত 'বেতার নাটক ঃ বিবর্তনের ধারা' বেতার নাট্যগ্রন্থে সংকলিত এবং ঢাকা,' চট্টগ্রাম, খুলনা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত।]